মুজিববর্ষে

বঙ্গবন্ধু

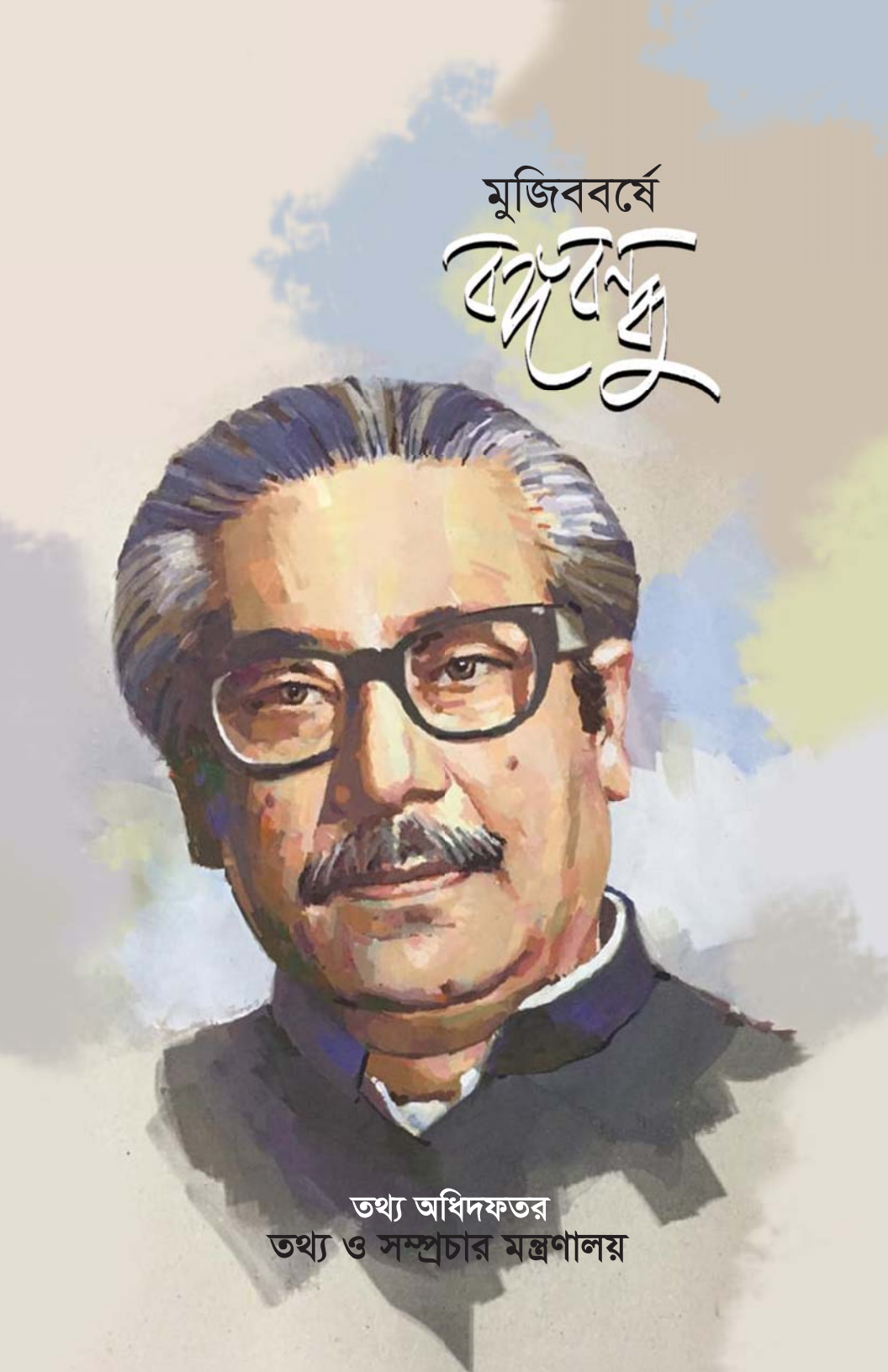

তথ্য অধিদফতর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু

মুজিববর্ষে

বঙ্গবন্ধু

তথ্য অধিদফতর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু

প্রকাশকাল
মে ২০২২

স্বত্ব © তথ্য অধিদফতর

প্রধান সম্পাদক
মো. শাহেনুর মিয়া, প্রধান তথ্য অফিসার

সম্পাদক
ইয়াকুব আলী, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার

সম্পাদনা পরিষদ
রিফাত জাফরীন, উপপ্রধান তথ্য অফিসার
পরীক্ষিৎ চৌধুরী, সিনিয়র তথ্য অফিসার
মোস্তফা কামাল পাশা, সিনিয়র তথ্য অফিসার
এ এম ইমদাদুল ইসলাম, সিনিয়র তথ্য অফিসার

সম্পাদনা সহকারী
মো. শাহীন শিকদার, সেলিনা আক্তার ও মো. জামিন মিয়া

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত বঙ্গবন্ধুর পোর্ট্রেট
শিল্পী অধ্যাপক শাহ্জাহান আহমেদ বিকাশ

আলোকচিত্র
● তথ্য অধিদফতর ● জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিববুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ● সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ● রেলপথ মন্ত্রণালয় ● বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

গ্রাফিক্স
মো. শাহীন হোসাইন

মুদ্রণ
মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

Mujibbarshe Bangabandhu
Published by Press Information Department (PID), Ministry of Information and Broadcasting, Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Phone : 55100811, 55100138, email : piddhaka@gmail.com

Price : Tk. 400.00

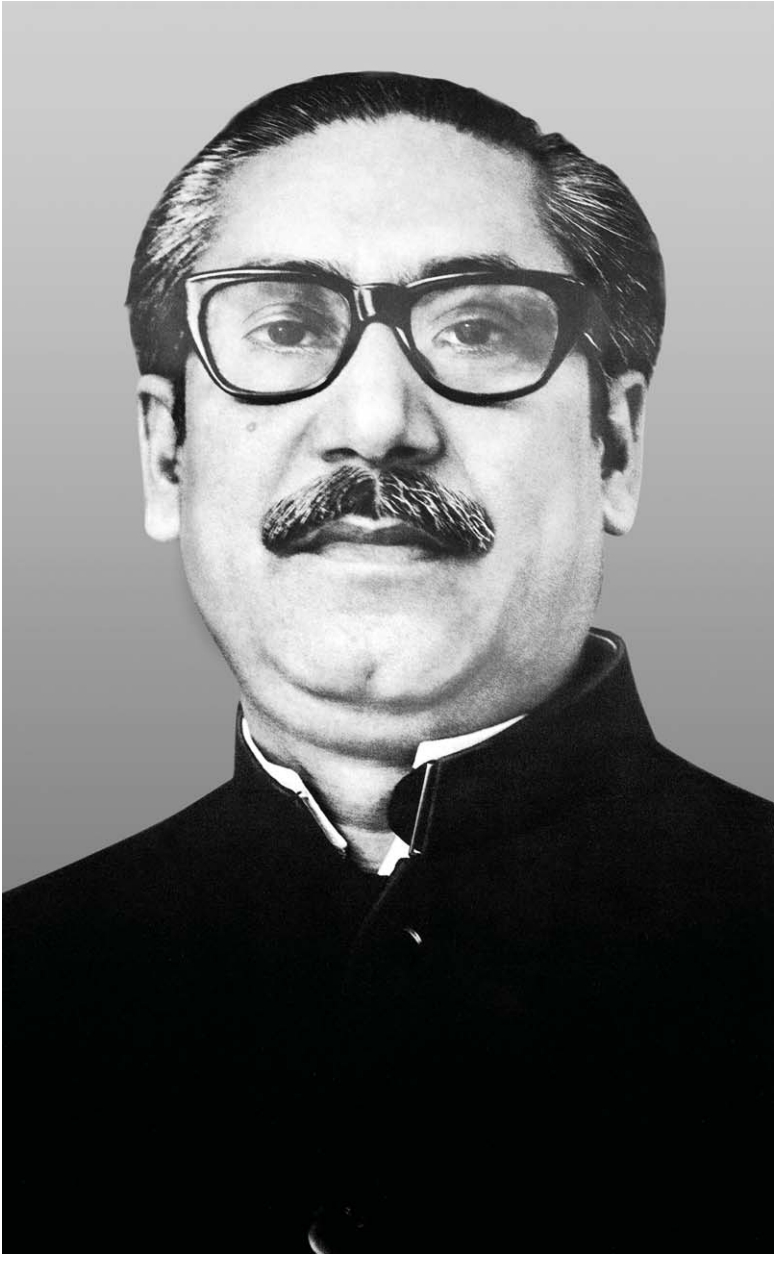

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহিমান্বিত জীবন ও কর্মের ওপর মুজিববর্ষে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সংবাদপত্রের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত নিবন্ধের সংকলন 'মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু'।

২৬ মার্চ, ২০২১ থেকে ২৬ মার্চ, ২০২২ সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে সরকারি ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের লেখা ছাড়াও তথ্য অধিদফতর কর্তৃক সংগৃহীত ও পিআইডি ফিচার হিসেবে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত কিছু নিবন্ধও এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া মুজিববর্ষের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুকে নিবেদন করে লেখা কবিতা, মেগা প্রকল্পসমূহের গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার বেশ কিছু মূল্যবান ছবিও এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু' সংকলন দূর-ভবিষ্যতে অনুসন্ধিৎসুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমরা আশা করি। এর আগে ২০২১ সালে বিভিন্ন ক্রোড়পত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অধিদফতর প্রেরিত নিবন্ধসমূহ নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল 'অনশ্বর বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থটি। মুজিববর্ষের বিশেষ প্রকাশনা হিসেবে সংকলনটি প্রকাশ করতে পেরে তথ্য অধিদফতর গর্বিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান বাঙালি জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ এ জাতিকে পথ দেখাবে অনন্তকাল। সেই মহামানবের জীবন ও কীর্তিগাথার ওপর রচিত নিবন্ধগুলো পাঠককে নতুন চিন্তার খোরাক জোগাবে। ভবিষ্যতে এই গ্রন্থ দুটি গবেষণাকাজে খুব সহায়ক হবে বলে আশা করি। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. মকবুল হোসেন পিএএ মহোদয়ের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার ফলে আমাদের এ প্রয়াস আলোর মুখ দেখেছে। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সম্পাদনা পরিষদসহ সংকলনটি প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

সূচিপত্র

ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত নিবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই বাংলাদেশ ॥ ১৫
আমির হোসেন আমু

'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়' ॥ ১৮
তোফায়েল আহমেদ

রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন ॥ ২৪
মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, বীর-উত্তম

একুশের অবদান : ঘরে-বাইরে ॥ ৩৪
আহমদ রফিক

১৫ই আগস্ট : শোক সাগরে সোনার বাংলার পথসন্ধান ॥ ৩৯
মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বাংলাদেশ : দৃপ্তপদে উন্নয়ন অভিযাত্রায় ॥ ৪৪
কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ॥ ৪৯
এ এস এম সামছুল আরেফিন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ ও প্রেক্ষাপট ॥ ৫৫
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (বীরপ্রতীক)

বাংলাদেশের বিস্ময়কর উত্থান : ২০০৯-২০২০ ॥ ৬১
ড. শামসুল আলম

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব : গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ ৬৬
প্রফেসর মাহ্‌ফুজা খানম

তুমিই চিনাবে সবে ॥ ৭৩
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বঙ্গবন্ধু : আমাদের অনন্ত প্রেরণার উৎস ॥ ৭৯
ড. আতিউর রহমান

ভালোবাসার বাংলাদেশ ॥ ৮৩
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর ॥ ৮৮
অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

বিজয়ের স্বপ্ন সিঁড়ি ॥ ৯৬
পান্না কায়সার

আমাদের ছোট্ট শেখ রাসেল ॥ ১০০
অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ

বাঙালির মহাকাব্য ॥ দাবায়ে রাখতে পারবা না ॥ ১০৩
মুহম্মদ শফিকুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্বঘোষণা ও অভিযাত্রা ॥ ১০৮
অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

আর দাবায়ে রাখতে পারবা না ॥ ১১৩
জাফর ওয়াজেদ

মুজিববর্ষের ফিচার

আইনের শাসন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ॥ ১১৯
এ বি এম খায়রুল হক

বিলেতে মুক্তিযুদ্ধ ॥ ১২৩
শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও উন্নয়নের পথপরিক্রমা ॥ ১৩০
গোলাম রহমান

মানবাধিকার, বঙ্গবন্ধু এবং মানবিক মূল্যবোধ ॥ ১৪০
নাছিমা বেগম, এনডিসি

বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন ॥ ১৪৫
অজয় দাশগুপ্ত

সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো ॥ ১৫১
মনজুরুল আহসান বুলবুল

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী তুলনামূলক পাঠ ॥ ১৫৫
ড. মোহাম্মদ হাননান

বঙ্গবন্ধু : শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধু ॥ ১৬১
অনুপম হায়াৎ

ফাঁসির রায়েও সংকল্পে অটল ছিলেন বঙ্গবন্ধু ॥ ১৬৫
মুহাম্মদ শামসুল হক

কেন তিনি রাজনীতির কবি ॥ ১৬৯
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

পাঁচ দশকে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ॥ ১৭৪
মো. মিজানুর রহমান

ভাষাসৈনিক বঙ্গবন্ধু ॥ ১৭৮
নাসরীন জাহান লিপি

শতবর্ষে শত আশা ॥ ১৮২
মেহবুব সাত্তার

বঙ্গবন্ধু এক সম্মোহনী নেতা ॥ ১৮৫
পাশা মোস্তফা কামাল

বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন ॥ ১৮৯
ইমদাদ ইসলাম

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও আমাদের প্রস্তুতি ॥ ১৯৩
জাহেরুল ইসলাম

উন্নয়নের সূর্যোদয় ॥ ১৯৬
মাসুদুর রহমান

ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত কবিতা

বিজয়ের গান ॥ ২০১
নির্মলেন্দু গুণ

শিয়রে বাংলাদেশ ॥ ২০২
নির্মলেন্দু গুণ

একুশের জন্য এই অশ্রু, একুশের জন্য এই কবিতা ॥ ২০৩
মহাদেব সাহা

মুজিব আমার ভোরের পাখি, প্রথম ফোটা ফুল ॥ ২০৪
মহাদেব সাহা

সোনায় মোড়া রুপায় মোড়া ॥ ২০৫
মুহম্মদ নূরুল হুদা

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ॥ ২০৬
মুহম্মদ নূরুল হুদা

বিজয়ের জারি ॥ ২০৭
মুহম্মদ নূরুল হুদা

স্বাধীনতার সূর্য ওঠে ॥ ২০৮
মুহাম্মদ সামাদ

মার্চ ॥ ২১০
কামাল চৌধুরী

তোমার ছবিটা ॥ ২১২
কামাল চৌধুরী

আবার দেখা হবে ॥ ২১৩
কামাল চৌধুরী

পিতা ও পতাকা ॥ ২১৫
আসাদ মান্নান

তুমি জেগে আছো তাই ॥ ২১৬
মিনার মনসুর

তুমিই তো বয়ে যাও, পিতা ॥ ২১৭
মিনার মনসুর

৭ই মার্চ ॥ ২১৯
তারিক সুজাত

ছোট্ট রাসেল সোনা–তার কথা ভুলব না ॥ ২২০
আসলাম সানী

শুভ জন্মদিন আজ সতেরোই মার্চ ॥ ২২১
আসলাম সানী

আলোকচিত্রে স্বপ্নের সোনার বাংলা ॥ ২২৩

মুজিববর্ষে তথ্য অধিদফতরের বিশেষ প্রকাশনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই বাংলাদেশ

আমির হোসেন আমু

চার অক্ষরের একটি শব্দ 'স্বাধীনতা'। রাষ্ট্র তার জনগোষ্ঠীর সব সম্প্রদায় কিংবা সব অংশের জনগণের প্রতি ন্যায়ভিত্তিক সমান আচরণ ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে জনমনে ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম নেয়। শাসকগোষ্ঠী এই ক্ষোভ ও হতাশার কারণ অনুসন্ধান ও সমাধানে ব্যর্থ হলে মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার পরিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক নানা আন্দোলনে নামে। সরকারের আচরণে, বিশেষ করে জাতি ও সম্প্রদায়গত বৈষম্যের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠলে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে এর সমাধান দুঃসাধ্য হয়ে উঠলে সংশ্লিষ্ট জাতি তথা জনগোষ্ঠী অনিয়মতান্ত্রিক পথে সরকার পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয়। আর এ পথে একবার অগ্রসর হলে প্রায় ক্ষেত্রে শেষ সমাধান হয় পৃথক রাষ্ট্র তথা স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে।

আজ ২৬ শে মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে। যিনি তাঁর অসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার ১৩ বছরের অসহনীয় কারা নির্যাতন ভোগ করে দু-দুবার ফাঁসির আসামি হয়ে অপরিসীম সাহসিকতা ও দৃঢ়চেতা আপসহীন নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে নিয়ে এসেছেন বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা আন্দোলনে, যার মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালির স্বাধীনতা। ৬১-তেই তিনি ছাত্রলীগ নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতিটি বক্তব্যে, আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা সামনে আনতে এবং পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ তুলে ধরতে। ওই সময় আমাদের বিএলএফের লিফলেট দেওয়া হয়েছিল (বাংলাদেশ লিভারেশন ফ্রন্ট)। তাই ৬ দফা অতি অল্প সময়ের ভেতরই মানুষ গ্রহণ করেছিল এবং এর বিরুদ্ধে আইয়ুব খানসহ শাসকগোষ্ঠীরা অস্ত্রের ভাষায় মোকাবেলার কথা বলা, আগরতলা মামলার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা বানচাল হয়েছিল জনগণের বিস্ফোরণে; বাধ্য হয়ে মুক্তি দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জন আসামিকে। তার পরই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র; নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার। ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণ রাস্তায় আন্দোলনে বেরিয়ে পড়ে; পাকবাহিনী দমন-পীড়ন, গোলাগুলি চালায়। এই প্রেক্ষাপটে ৭ই মার্চ, ১৯৭১ সালে তৎকালীন রেসকোর্স

ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর সারা জীবনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাঙালির স্বাধীনতার কথা ঘোষণা দেন তাঁর কালজয়ী ভাষণে। বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তিনি জনগণকে ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি করে যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার আহ্বান জানান–'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ।'

এই আহ্বান সমগ্র জাতির চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছে পরবর্তী ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত সরকারের নেতৃত্বে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় লাভ করে। বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, পোর্ট, বিমানবন্দর, রেললাইন, ওয়াগন বগিসহ সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত। অন্যদিকে সাড়ে তিন কোটি লোক গৃহহারা, এক কেটি লোক শরণার্থী, চার লক্ষ বীরাঙ্গনা, খাদ্যের গুদামে খাদ্য নেই, ব্যাংকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা নেই, ৩০ লক্ষ শহিদ পরিবার নিয়ে তার যাত্রা শুরু। মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশকে পুনর্গঠন, পুনর্নির্মাণ এবং ২৭টি আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ ১২৬টি দেশের স্বীকৃতি আদায় এবং ১০ মাসের মধ্যে জাতীয় সংবিধান প্রণয়ন করেন। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন, পুনর্নির্মাণ করে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যখন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন, তখনই ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের কালরাতে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে। পিছিয়ে দেওয়া হয় অসাম্প্রদায়িক শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার অগ্রযাত্রাকে। ১৫ই আগস্ট দেশে না থাকার কারণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগ সভাপতি করে দেশে আনার পর পিতার মতো অকুতোভয়, সাহসিকতার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি সম্পন্ন করেছেন বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজ।

১৯৯৬ সালে প্রথম এবং ২০০৯ সাল থেকে টানা তিনবার ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা ল্যান্ড বাউন্ডারি চুক্তি বাস্তবায়ন, সমুদ্র সীমানা জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রের পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর শেখ হাসিনার একক উদ্যোগে ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত ফারাক্কা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৭ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধন করেন। ১৯৯৭ সালের ২২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে এই অঞ্চলে দীর্ঘ ২৫ বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘাত নিরসনের জন্য শেখ হাসিনা UNESCO শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি UNESCO কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃত হয়। যার মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। ২০০০ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাতা ও উন্নয়নের কাণ্ডারি, উন্নত-সমৃদ্ধ, মর্যাদাশীল বাংলাদেশ নির্মাণের রূপকার। শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে এবং দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকার মেট্রোরেল প্রকল্প, দোহাজারী-রামু-ঘুনধুম রেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, পায়রা বন্দর, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দরসহ মেগাপ্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। তার সফল রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্য দিয়ে তিনি খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র মোচন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র, শান্তি, জঙ্গি দমন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে তিনি বহু মর্যাদাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বে মর্যাদার নতুন মাত্রা দিয়েছেন। শেখ হাসিনা আজ বিশ্বে একজন নন্দিত সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি সৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিশ্বে তৃতীয় স্থানের অধিকারী হয়েছেন। বর্তমানে অত্যন্ত সফলতার সাথে করোনা পরিস্থিতি এবং পাশাপাশি উপর্যুপরি বন্যার মোকাবিলা করে যাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক, শোষণমুক্ত, আত্মমর্যাদাশীল বাঙালি জাতি পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে। আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

লেখক : সংসদ সদস্য ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ।

‘ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়’

তোফায়েল আহমেদ

বাঙালি জাতির জীবনে ১০ই জানুয়ারি অনন্য ঐতিহাসিক দিন। ১৯৭২-এর এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোটি কোটি মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বীরের মর্যাদায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হলেও দেশের মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি; কারণ যাঁর নেতৃত্বে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ, তিনি তখনো কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি। যতক্ষণ মহান নেতা ফিরে না এসেছেন, ততক্ষণ বাংলাদেশের বিজয় পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। মহান বিজয় পূর্ণ অবয়ব পায় ১০ই জানুয়ারি, যেদিন জাতির পিতা স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন সোনার বাংলায় ফিরে এসেছিলেন। এ বছর জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৫০ বছর পূর্ণ হলো।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অক্টোবর মাসে জাতির পিতার ফাঁসির আদেশ হয়, কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয়ী হলে ইয়াহিয়া খান সেই আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারেনি। পাকিস্তানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর ইয়াহিয়া খানকে অপসারণ করে ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়। ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর কাছে আবেদন করেছিল, ‘আমার একটি স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেছে, সেটি হলো শেখ মুজিবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানো, আমাকে সেই সুযোগ দেওয়া হোক।’ যে কারণে ভুট্টো মিয়ানওয়ালি কারাগারের জেল সুপার হাবিব আলীর কাছে বার্তা পাঠায় এবং বঙ্গবন্ধুকে মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে চশমা ব্যারাজের হাবিব আলীর বাসভবনে নিয়ে রাখা হয়। এরপর ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তানের সাথে একটি সম্পর্ক রাখার জন্য বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করে। বঙ্গবন্ধু ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ভুট্টো ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় এবং পিআইএর একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছান। পরদিন, অর্থাৎ ৯ জানুয়ারি লন্ডনে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ‘জয় বাংলা’ রণধ্বনি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি বলেন, ‘বাংলার মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীনতার অপরিসীম ও অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। এই মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল, স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। আমার জনগণ যখন আমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেছে তখন আমি রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে একটি নির্জন ও পরিত্যক্ত

সেলে বন্দিজীবন কাটাচ্ছি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতা দানের জন্য ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে আমি ধন্যবাদ জানাই। স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব সত্য। এ দেশকে বিশ্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। বাংলাদেশ অবিলম্বে জাতিসংঘের সদস্য পদের জন্য অনুরোধ জানাবে।' পরিশেষে তিনি বলেন, 'আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই।' বিবৃতির শেষে সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি যে আপনার বাংলাদেশে ফিরে যাবেন সেই দেশ তো এখন ধ্বংসস্তূপ?' তখন জাতির পিতা উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার বাংলার মানুষ যদি থাকে, বাংলার মাটি যদি থাকে, একদিন এই ধ্বংসস্তূপ থেকেই আমি আমার বাংলাদেশকে ক্ষুধামুক্ত-দারিদ্র্যমুক্ত, শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করব।'

১৬ই ডিসেম্বর প্রিয় দেশ শত্রুমুক্ত হলেও তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন, আমরা তা জানতাম না। যেদিন ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সংবাদ জানলাম সেদিন আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল সারা দেশে। সেদিনের আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। যেদিন তিনি ফিরে এলেন সেদিন ছিল সোমবার। সকাল থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে দশদিক মুখরিত করে মিছিল নিয়ে বিমানবন্দর অভিমুখে। রণক্লান্তযুদ্ধজয়ী মুক্তিযোদ্ধা, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সংগ্রামী জনতা, অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে সন্তানহারা জননী, স্বামীহারা পত্নী, পিতৃহারা পুত্র-কন্যা সব দুঃখকে জয় করে স্বজন হারানোর বিয়োগ ব্যথা ভুলে গর্বোদ্ধত মস্তকে সকলেই অধীর আগ্রহে সেদিন অপেক্ষমাণ দু'হাত বাড়িয়ে জাতির পিতাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করার জন্য।

ঢাকায় যখন সাজ সাজ রব, তখন সকাল হতেই দিল্লির রাজপথ ধরে হাজার হাজার মানুষের মিছিল পালাম বিমানবন্দর ও প্যারেড গ্রাউন্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দিল্লির জনসাধারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে এক অভূতপূর্ব রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর কমেট জেটটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অবতরণ করলে তাঁর সম্মানে ২১ বার তোপধ্বনি করা হয়। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পর পূর্বেই উপস্থিত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, 'আপনার জন্য আমি গর্বিত। ভারত ও বাংলাদেশের মানুষ আপনার জন্য গর্ব অনুভব করে। শেখ মুজিবকে আমাদের মাঝে পেয়ে ভারতের জনগণ আজ আনন্দে আত্মহারা। শেখ মুজিব তাঁর জনগণকে নূতন জীবন দান করেছেন। তাঁর স্বাধীনতার স্বপ্ন আজ সার্থক।' দিল্লিতে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতিকালে লক্ষ মানুষের সমাবেশে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ভারতবাসীর উদ্দেশে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায় বলেন, 'আমার জন্য এটা পরম সন্তোষের মুহূর্ত।

বাংলাদেশে যাওয়ার পথে আমি আপনাদের মহতী দেশের ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রাবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ কারণে যে, আমাদের জনগণের সবচেয়ে বড় বন্ধু ভারতের জনগণ এবং আপনাদের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী–যিনি কেবল মানুষের নন, মানবতারও নেতা। তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের কাছে এর মাধ্যমে আমি আমার ন্যূনতম ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব। এ অভিযাত্রা সমাপ্ত করতে আপনারা সবাই নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং বীরোচিত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এ অভিযাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দিদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশায়। অবশেষে আমি ৯ মাস পর আমার স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি।' অভ্যর্থনার আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিমানবন্দরের লাউঞ্জে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় বঙ্গবন্ধু একান্তে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করেছিলেন, 'ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী, আপনার কাছে আমি ঋণী। আপনি আমার বাংলার মানুষকে অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছেন; আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কঠিন দিনগুলিতে আপনি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আপনার কাছে আমরা চিরঋণী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার নিকট আমার একটি অনুরোধ। আপনি কবে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করবেন।' শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মহানুভবতার স্বরে বলেছিলেন, 'আপনি যেদিন চাইবেন।' বঙ্গবন্ধু এমন বিচক্ষণ নেতা ছিলেন যে এ রকম একটি অবস্থার মধ্যেও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞায় ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যার্পণের বিষয়টি আলাপ করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি আদায় করে নেন।

এরপর অবসান ঘটে আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার। দিল্লি থেকে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি ঢাকার আকাশসীমায় দেখা দিতেই জনসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে ঢাকা বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণ করে। বিমানে সিঁড়ি স্থাপনের সাথে সাথে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্য নেতৃবৃন্দ, আমরা মুজিব বাহিনীর চার প্রধান, কেন্দ্রীয় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ছুটে যাই নেতাকে অভ্যর্থনা জানাতে। আমার হাতে ছিল পুষ্পমাল্য। জাতির পিতাকে মাল্যভূষিত করার সাথে সাথেই তাঁর সংযমের সকল বাঁধ ভেঙে যায়, তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। সে এক অবিস্মরণীয় ক্ষণ, অভূতপূর্ব মুহূর্ত, যা আমার মানসপটে এখনো জ্বলজ্বল করে। বিমানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু জনতার মহাসমুদ্রের উদ্দেশে হাত নাড়েন। তাঁর চোখে তখন স্বজন হারানোর বেদনা-ভারাক্রান্ত অশ্রুর নদী, আর জ্যোতির্ময় দ্যুতি ছড়ানো মুখাবয়বজুড়ে বিজয়ী বীরের পরিতৃপ্তির হাসি। বিমানের সিঁড়ি বেয়ে জাতির পিতা তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পদার্পণের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি করে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি সম্মান জানানো হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুকে মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। চারদিক থেকে তাঁর ওপর পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। বাংলাদেশ সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী রাষ্ট্রপ্রধানকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধু সালাম গ্রহণ করেন। এ সময় বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল আতাউল

গনী ওসমানী, লে. কর্নেল সফিউল্লাহ এবং বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র লেফটেন্যান্ট শেখ কামাল জাতির পিতার পাশে ছিলেন। গার্ড অব অনার পরিদর্শনের পর বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দরে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিদেশি মিশনের সদস্যবৃন্দ, মিত্র বাহিনীর পদস্থ সামরিক অফিসার, বাংলাদেশ সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে করমর্দন করেন।

এরপর রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যাওয়ার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অপেক্ষমাণ ট্রাকে উঠে রওনা দিই। সুদৃশ্য তোরণ, বাংলাদেশের পতাকা ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি দিয়ে সজ্জিত রাজপথের দুই পাশে দাঁড়ানো জনসমুদ্র পেরিয়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যখন রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছলাম ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল সাড়ে ৪টা। চারদিকে লক্ষ লক্ষ অপেক্ষমাণ জনতা, কোনো দিকে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুহুর্মুহু করতালিতে চারদিক মুখরিত। 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' রণধ্বনিতে সব কিছু যেন ডুবে গেল। বঙ্গবন্ধু মঞ্চে উঠে চতুর্দিকে তাকালেন এবং রুমালে মুখ মুছলেন। বঙ্গবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেবলই মনে হয়েছে, জাতির পিতা জীবনভর এমন একটি দিনের অপেক্ষায়ই ছিলেন। দীর্ঘ কারাবাসের ক্লান্তিতে মলিন মুখটি তবু সমুজ্জ্বল। উন্নত ললাট, প্রশান্ত বদন, দু'চোখ তখনো অশ্রুসিক্ত, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। সে অবস্থায়ই চিরাচরিত ভঙ্গিতে 'ভায়েরা আমার' বলে উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশে নিবেদন করলেন তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা। হৃদয়ের সবটুকু অর্ঘ্য ঢেলে আবেগঘন ভাষায় বললেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।' দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন নির্জন কারাগারে মৃত্যুর প্রহর গোনা একজন মানুষ কী করে এ রকম উদ্বেলিত পরিস্থিতিতেও স্থির-প্রতিজ্ঞ থেকে বলছেন, 'ভায়েরা, তোমাদেরকে একদিন বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। আজকে আমি বলি, আজকে আমাদের উন্নয়নের জন্য আমাদের ঘরে ঘরে কাজ করে যেতে হবে।' আরো বললেন, 'সকলে জেনে রাখুন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ।' বক্তৃতায় তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন, 'আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে বাংলাদেশ একটি আদর্শ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।' ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মদান স্মরণ করে বেদনা-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, 'আমার বাংলায় আজ বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। আপনারাই জীবন দিয়েছেন, কষ্ট করেছেন। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে, এটাই ছিল আমার সাধনা।' যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে বলেন, 'গত ২৫ শে মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাসে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে

হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এসব কুকীর্তির বিচার করতে হবে।' পরিশেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে উদ্ধৃত করে তাঁকে উদ্দেশ করে বলেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি। কবিগুরুর কথা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেছে। আমার বাঙ্গালি আজ মানুষ।' লক্ষ লক্ষ মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছে এবং পরম পরিতৃপ্ত হয়েছে এই ভেবে যে আজ থেকে আমরা প্রকৃতই স্বাধীন। সভামঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধু ধানমণ্ডির ১৮ নম্বর বাড়িতে গেলেন। যেখানে পরিবারের সদস্যবৃন্দ অবস্থান করছিলেন। সেই বাড়ির সামনে আর একটি বাড়ি তখন তাঁর জন্য রাখা হয়েছিল। কেননা ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবনটি শত্রুবাহিনী এমনভাবে তছনছ করে দিয়েছিল, যা বসবাসের অনুপযুক্ত ছিল। প্রিয় সহকর্মীদের সাথে ১১ জানুয়ারি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ১২ জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন এবং আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি করলেন। ১৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আমাকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় তাঁর রাজনৈতিক সচিব করেন। দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র।

প্রতি বছরের মতো এবারও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ পালনের শেষলগ্নে আমাদের জাতীয় জীবনে ১০ই জানুয়ারি ফিরে এসেছে। বারবার মনে পড়ছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা। যে ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। যে ভাষণের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্ভবপর হয়েছে। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বিশ্বসভায় স্বীকৃত। আমার বিবেচনায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। আব্রাহাম লিংকনের 'গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস' তিন মিনিটের লিখিত বক্তৃতা; মার্টিন লুথার কিংয়ের বক্তৃতা ১৭ মিনিটের লিখিত বক্তৃতা, কিন্তু বঙ্গবন্ধু হৃদয়ের গভীরতা থেকে সেদিন 'ভায়েরা আমার' সম্বোধন করে যে অলিখিত বক্তৃতা করেছিলেন, সেটা বিশ্ববিখ্যাত বক্তৃতা। কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের পর বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবার্ষিকীতে, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে আমরা যখন এই ভাষণটি মাইকে প্রচার করতে চাইতাম, স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান আমাদের প্রচার করতে দেয়নি। পরবর্তীকালেও বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই ভাষণ প্রচার করতে দেয়নি। সভামঞ্চ ভেঙে মাইক কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস তার নিজস্ব পথে চলে এবং সত্য কখনো চাপা দেওয়া যায় না ভাবতেই বুক ভরে ওঠে–গৌরবের সেই ভাষণই বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ভাষণের মর্যাদা পেয়েছে।

এবার এক নতুন প্রেক্ষাপটে ১০ই জানুয়ারি আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। কেননা বিগত দিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহীত সকল উন্নয়ন প্রকল্প একে একে দৃশ্যমান হচ্ছে এবং দেশের মানুষ তার সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। জনসাধারণকে বিনা মূল্যে টিকা প্রদান করে করোনা মহামারিকে তিনি সফলভাবে মোকাবেলা করে চলেছেন। তাঁর

ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ আজ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। চতুর্থবারের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছেন। তিনি একেক করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করছেন। জাতির পিতার দুটি স্বপ্ন ছিল–বাংলাদেশ স্বাধীন করা এবং দেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা। আমাদের তিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তাঁর প্রথম স্বপ্ন তিনি পূরণ করেছেন। আরেকটি স্বপ্ন যখন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছিলেন, তখনই বুলেটের আঘাতে সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়। জাতির পিতাকে হারানোর দুঃখের মধ্যে ১৯৮১-এর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যার হাতে আমরা যে পতাকা তুলে দিয়েছিলাম, শহিদের রক্তেভেজা সেই পতাকা হাতে নিয়ে নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে আজ তিনি বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচক আজ অগ্রগতির দিকে ধাবমান। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের যে অনন্য সাধারণ সাহসী উদ্যোগ বঙ্গবন্ধুকন্যা গ্রহণ করেছেন, তা আজ সমাপ্তির পথে এবং অচিরেই পদ্মাবক্ষে সেই সেতু চালু হবে। যে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে জাতির পিতা 'স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আজ তা অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান–এই পাঁচটি মৌলিক অধিকার আজ মানুষের দোরগোড়ায়। একসময়ের অন্ধকার গ্রামবাংলা আজ আলোকিত। পিচঢালা পথ, সেই পথে সশব্দে ছুটে চলছে যাত্রীবাহী বা মালবাহী গাড়ি। ঘরে ঘরে টিভি, ফ্রিজ। পাকা দালানকোঠা। খালি পায়ে লোকজন চোখে পড়ে না। বাজারগুলো সরগরম। গ্রামীণ জনপদের মানুষের হাতে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা। গ্রামগুলো সব শহরে রূপান্তরিত হতে চলেছে। এ সবই সম্ভবপর হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশ হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

লেখক : সংসদ সদস্য ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, ডাকসুর সাবেক ভিপি।

রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন

মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, বীর-উত্তম

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন ঢাকায় শুরু হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিশ্রুতি মতে আওয়ামী লীগ এমন এক সংবিধান রচনা করবে, যার ফলে দীর্ঘকাল পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন ও দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা বাংলার মানুষ সম্ভাবনাময় এক নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারবে। অর্জন করবে স্বাধিকার, নিজেদের ভাগ্য গড়বে নতুন পরিকল্পনায়। প্রতিটি বাঙালির সকল অধিকার সমুন্নত রাখার সব বিধান থাকবে সেই সংবিধানে।

হঠাৎ করে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দিলেন। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বাঙালি জাতি। উত্তাল জনতার ঢেউ আছড়ে পড়ে রাজপথে, শহর-নগর, বন্দরে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দিলেন, ২ মার্চ ঢাকায় এবং পরদিন সারা দেশে হরতাল হবে। ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স মাঠে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) বিশাল জনসভার আন্দোলনের সময়সূচি ঘোষণা করবেন।

লোকে লোকারণ্য রেসকোর্স ময়দানে ১০ লক্ষাধিক মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে গভীর আবেগ, নির্ভুল যুক্তি এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ যে ভাষণ দিয়েছিলেন জাতির ইতিহাসে তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে বজ্রকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করে নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় উদীপ্ত হয়ে ওঠে বিশাল জনতা। সেই উন্মাদনার স্ফুলিঙ্গ নিমেষে ছড়িয়ে গেল জনপদ থেকে জনপদে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বাঙালির হৃদয়ে মুক্তি-চেতনার যে বহ্নিশিখা বঙ্গবন্ধু সেদিন তাঁর উদ্দীপনাময় ভাষণে প্রজ্বলিত করে দিলেন, সেই চেতনায় উজ্জীবিত বাঙালি জাতি দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতার সোনালি সূর্য। পৃথিবীর মানচিত্রে জেগে ওঠে এক নতুন উজ্জ্বল নক্ষত্র–নাম তার বাংলাদেশ।

মার্চের ওই সময়ে চট্টগ্রামে আমি সেনাবাহিনী থেকে ডেপুটেশনে চট্টগ্রাম সেক্টর ইপিআরের অ্যাডজুটেন্টের দায়িত্ব পালন করছি। মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে আমি যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম। উত্তাল বাংলাদেশে এই যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল চরম

উত্তেজনাময়, বিপজ্জনক। কিন্তু বিজয় সুনিশ্চিত এই বিশ্বাস আমার ছিল। সেই প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ নতুন ইতিহাস সৃষ্টির সম্ভাবনার মুখোমুখি হলাম আমি।

শহরের মাঝখানে রেলওয়ের পাহাড়ে একাকী এসে দাঁড়ালাম আমি। রাত তখন ৯টা। পাহাড়ের ওপরে একটি দোতলা কাঠের বাংলো থেকে আমি একটু আগেই টেলিফোনে দুটি 'মেসেজ' পাঠিয়েছি হালিশহরস্থ ইপিআর হেডকোয়ার্টারে।

প্রথম মেসেজটি ছিল 'আমার জন্য কিছু কাঠের ব্যবস্থা করো' এবং সেই সাথে দ্বিতীয় মেসেজটি ছিল 'আমার জন্য কিছু কাঠ নিয়ে আসো।'

দুটি মেসেজেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের সন্দেহ করার মতো কিছুই ছিল না। কিন্তু মেসেজ দুটি পাঠানোর পর যখন একাকী মেঘমুক্ত রাতের আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালাম, তখন এক অজানা আশঙ্কায় চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি।

একটা বেবিট্যাক্সি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে আমার কাছে এসে থামল। নেমে এলেন দুজন বাঙালি সামরিক অফিসার–একজন লে. কর্নেল এবং অন্যজন মেজর। আমরা সেই বাংলোর সামনে একটা বিরাট জামগাছের নিচে গিয়ে বসলাম। তাঁদের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, 'পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার জন্য আমার সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে ফেলেছি।'

'এই মুহূর্তে তোমার এ ধরনের কিছু করা উচিত নয়,' অত্যন্ত নিচুস্বরে লে. কর্নেল আমাকে বললেন!

'কেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওরা আমাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনো ব্যবস্থা নিতে সাহস পাবে না। বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে তারা এমন কিছু করতে পারে না।'

'দেখো,' লে. কর্নেল আবার বললেন, 'এই মুহূর্তে সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক আলোচনা চলছে এবং আমরা শুনতে পাচ্ছি কাল অথবা পরশুর মধ্যেই এ ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি হতে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তুমি এমন কিছু করতে পারো না, যা এই রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। তাই আমরা এখন যুদ্ধ শুরু করতে পারব না।'

তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি টেলিফোনে হালিশহরে ইপিআর সৈন্যদের আমার দ্বিতীয় মেসেজটি বাতিল করার জন্য নির্দেশ দিলাম, কিন্তু প্রথম মেসেজটি অপরিবর্তিত রাখলাম।

নিয়তির কী বিচিত্র বিধান! তার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। সে ছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত। সেই দুজন অফিসারের একজন লে. কর্নেল এম আর চৌধুরীকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বন্দি করল। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের যে বিশ্বাস করেছিলেন যে, ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেই বিশ্বাসের জবাব দিল।

অফিসারদ্বয়ের অন্যজন মেজর জিয়াউর রহমান, রাত সাড়ে ১১টায় যাচ্ছিলেন চট্টগ্রাম পোর্টে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদ নামিয়ে ক্যান্টনমেন্টে আনার জন্য।

২৫ মার্চ, ১৯৭১ সাল। বৃহস্পতিবার : অন্যান্য দিনের মতো সকাল ৭টায় অফিসে গিয়ে ফিরে এলাম দুপুরে একটু পরে।

বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে ডা. জাফর আমার বাসায় এলেন। আমার বাড়ির সামনে 'লনে' বসে সব ধরনের সম্ভাবনা নিয়েই আমরা আলোচনা করলাম, কিন্তু ঢাকায় কী ঘটছে বা আলোচনার কী অবস্থা–এ ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাচ্ছিলাম না। ঢাকা থেকে কোনো খবর পাওয়া গেছে কি না, এটা জানার জন্য ডা. জাফর চলে গেলেন আওয়ামী লীগ অফিসে। আমার এক বন্ধু ক্যাপ্টেন মোসলেমকে নিয়ে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য ঘরে গেলাম।

আমরা মাত্র খাওয়া আরম্ভ করেছি, এমন সময় ডা. জাফর একজন দলীয় নেতাকে নিয়ে ফিরে এলেন। রাত তখন সাড়ে ৮টা। তিনি বললেন, 'আলোচনা মনে হয় ব্যর্থ হয়ে গেছে। জানা গেছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ছেড়ে করাচির পথে চলে গেছেন। আরো খবর পাওয়া গেছে যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরের দিকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।' অজানা আশঙ্কায় তাঁরা দুজনেই এত উৎকণ্ঠিত ও উত্তেজিত ছিলেন যে তাঁদের মুখ থেকে কথা সরছিল না।

'আপনারা কি আমাকে সঠিক খবরটিই দিচ্ছেন?' আমি ডা. জাফরকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। এই সংবাদটাই ঢাকা থেকে পাওয়ার পর আমাদের পার্টির এক গোপন বৈঠক জনাব সিদ্দিকীর বাসায় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে জনাব সিদ্দিকী ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি এই মুহূর্তেই আপনাকে জানানোর জন্য আমাদের বলছেন এবং সেই সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও আপনাকে অনুরোধ করেছেন।'

এখন (২৫ মার্চ) আমি আগের রাতের স্থগিত কার্যক্রমের ওপর পুনরায় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম। ডা. জাফরকে বললাম, আমাদের জনগণকে রক্ষা করা এবং তাদের মুক্তির জন্য ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে আমি পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করছি। ষোলশহরে মেজর জিয়া এবং ক্যান্টনমেন্টে কর্নেল চৌধুরীসহ অন্যান্য বাঙালি অফিসারকে বলুন, তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দেয়। তারপর রেলওয়ে পাহাড়ে আমার যুদ্ধের হেডকোয়ার্টারে আমার সাথে দেখা করুন।
রাত সোয়া ৯টার মধ্যেই হালিশহরে আমার অফিসে পৌঁছে গেলাম।

অস্ত্রাগারগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় আমরা মোটামুটি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলাম। তবুও ঝুঁকি ছিল বিরাট। এখানকার পুরো কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই যদি কেউ পাকিস্তানিদের কাছে খবর পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ করতে ছুটে আসবে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট অথবা 'নেভাল বেইজ' এলাকা থেকে।

আমরা প্রথমে সমস্ত এলাকা ঘেরাও করে ফেললাম, যাতে কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য পালাতে না পারে। এরপর শুরু হলো যথাসম্ভব কম সময়ে তাদের সবাইকে আটক করার কাজ।

রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে সবচেয়ে সিনিয়র বাঙালি জেসিও সুবেদার জয়নাল খবর দিল যে সব কিছু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। চট্টগ্রাম শহরে ইপিআরের সব অবাঙালি 'জেসিও,' 'এনসিও' এবং 'সৈন্য'কে আটক করে হয়েছে ততক্ষণে। সীমান্ত ফাঁড়িগুলো থেকে খবর এসে গেল যে তারা আমার সাংকেতিক বার্তাগুলো পেয়ে গেছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করেছে। সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে অবশ্য ২৪ মার্চ রাতেই সাংকেতিক বার্তা দুটি পাওয়ার পর সব পশ্চিমা সৈন্যকে নিষ্ক্রিয় ও আটক করা হয়েছিল।

রাত ১১টা ৩০ মিনিটে রেলওয়ে হিলে পূর্বনির্ধারিত যুদ্ধের টেকনিক্যাল হেডকোয়ার্টারে অবস্থান নিলাম। এরপর আমি সীমান্ত এলাকাসমূহ থেকে আমার সৈন্যদের আসার অপেক্ষায় রইলাম।

সেই রাতে হালিশহর এবং চট্টগ্রাম শহরের অন্যান্য এলাকায় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমরা ইপিআরের প্রায় ৩০০ অবাঙালি 'জেসিও' এবং 'এনসিও'কে নিষ্ক্রিয় করতে পেরেছিলাম। বিস্তারিত পূর্বপরিকল্পনা ও আমার অধীন ইপিআরের বাঙালি যোদ্ধাদের অত্যন্ত সাহসিকতা এবং ক্ষিপ্রতার সাথে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলেই এত দ্রুততার সাথে পশ্চিমা এসব সৈন্যকে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব হয়েছিল।

শহরে রেডিও স্টেশন এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করার জন্য কিছু সৈন্য পাঠানো হয়েছিল আগেই। রেলওয়ে হিলে আমার এই অবস্থানের সামনে একটু ডান পাশে নৌবাহিনীর ছোট্ট একটা যোগাযোগ স্টেশন এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। সেখানে কিছু পাকিস্তানি সৈন্যদের (নৌবাহিনীর) তৎপরতা আমার অবস্থান থেকে সহজেই দৃষ্টিগোচর হলো। এমন সময় রেলওয়ে হিলের পার্শ্ববর্তী টাইগারপাস রোড ধরে নৌবাহিনীর একটি গাড়ি আগ্রাবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল খুব 'স্লো স্পিডে'। আমার 'জেসিও' সুবেদার আইজুদ্দিন দৌড়ে এসে বলল, 'স্যার, গাড়িতে কতগুলো পশ্চিমা সৈন্য (নৌবাহিনীর) আছে। উড়িয়ে দিই গাড়িটা?'

'না, এখন না,' আমি বললাম। 'এরা বোধ হয় রেকি করছে, যানবাহন চলাচলের জন্য রাস্তা উন্মুক্ত আছে কি না, সেটা দেখছে। মনে হয়, পাকিস্তানি সৈন্যদের বেশ বড় দল এই রাস্তা ধরেই ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাবে। তখন তাদের ওপর আক্রমণ চালাব। তাহলেই আমরা একসঙ্গে অসংখ্য পাকিস্তানি সৈন্যকে ধ্বংস করতে পারব।'

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথম গাড়ির পেছনে পেছনে আরেকটি গাড়ি ছুটে গেল–একটু দ্রুতবেগে। তারপর প্রায় ১০ মিনিট কাটল অস্থির অপেক্ষায়। গাড়ি দুটিই আগ্রাবাদ এলাকা থেকে ফিরে একই রাস্তায় ফিরে গেল ষোলশহর বা ক্যান্টনমেন্টের দিকে। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের আর কোনো দলই এই পথ দিয়ে এল না।

পরে জানতে পারি যে প্রথম গাড়িটি মেজর জিয়াকে নিয়ে বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। তাঁর কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামিয়ে তা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসার জন্য তিনি চট্টগ্রাম পোর্টে যাচ্ছিলেন। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট শাখার ম্যানেজার জনাব কাদের যখন ডা. জাফরের নিকট থেকে আমার মেসেজটি নিয়ে ৮ ইস্ট বেঙ্গল গিয়ে পৌঁছেন, মেজর জিয়া ততক্ষণে কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশ পেয়ে রওনা হয়েছেন চট্টগ্রাম পোর্ট অভিমুখে।

জনাব কাদের তখন মেসেজটি ৮ ইস্ট রেজিমেন্টে বেঙ্গল বাঙালি ডিউটি অফিসারকে দিয়ে চলে আসেন। এই মেসেজ পেয়েই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে সর্বশেষ ঘটনা জানাতে এবং সোয়াত জাহাজে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে একটি গাড়ি নিয়ে ছুটে চলল মেজর জিয়ার সন্ধানে। রাত তখন সাড়ে ১১টার মতো (২৫ মার্চ)।

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে এমনি সময় ইবিআরসিতে বাঙালি সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালাতে এগিয়ে চলছে ২০ বালুচের সৈন্যরা। মেজর জিয়া চলেছেন অবাঙালি লে. কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশমতো সোয়াত জাহাজে ডিউটির জন্য। বাঙালি ক্যাপ্টেন খালেক ছুটে আসছে জিয়াকে থামাতে। আর আমরা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করে শহর দখল করে ফেলেছি। রেলওয়ে হিলের অবস্থানে বসে অপেক্ষায় আছি পরবর্তী পর্যায়ের অ্যাকশনের জন্য।

প্রথম গাড়িটি জিয়াকে নিয়ে আগ্রাবাদ রোডের মুখে ব্যারিকেডে পড়ে থামতে বাধ্য হয়। জিয়া তাঁর সাথের পাকিস্তানি সৈন্যদের দিয়ে ব্যারিকেড পরিষ্কার করিয়ে নিচ্ছিলেন। এতে কিছুটা সময় লেগে যায়। আর এই সময়টুকু ব্যারিকেড সরাতে লেগে যাওয়ায় ক্যাপ্টেন খালেক আগ্রাবাদ এলাকার প্রবেশমুখে ব্যারিকেডের কাছে জিয়ার গাড়ির সন্ধান পায়। খালেক সেখানে মেজর জিয়াকে এক পাশে ডেকে ইপিআরকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ শুরু করার কথা জানায়। মেজর জিয়াকে খালেক এটাও বলে যে এই পরিস্থিতিতে পোর্ট এলাকায় গেলে মেজর জিয়ার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

তখন মেজর জিয়া রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসারদের সাথে আলোচনা করে কী করা যায় সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ফিরে যান। প্রথম যে গাড়িটিকে দেখে সুবেদার আইজুদ্দিন উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল সে গাড়িতে মেজর জিয়াই যাচ্ছিলেন সোয়াত জাহাজে। আমরা গাড়ি দুটিকেই 'রেকি ডিউটি'তে নিয়োজিত মনে করে বড় টার্গেটের আশায় ধৈর্য ধারণ না করে রকেট লঞ্চারের গোলা ছুড়লে মেজর জিয়ার প্রথম গাড়ি এবং কিছু পরে খালেককে নিয়ে যাওয়া দ্বিতীয় গাড়ি দুটি টুকরো টুকরো হয়ে যেত, মারা যেত আরোহীদের সবাই। এমনি করেই দৈবক্রমে বেঁচে গেলেন মেজর জিয়া, খালেক ও গাড়ির আরোহীরা।

ইউনিট লাইনে (৮ বেঙ্গল) ফিরে মেজর জিয়া বাঙালি অফিসারদের সাথে পরামর্শ করে লে. কর্নেল জানজুয়া ও অন্য অবাঙালি অফিসারদের বন্দি করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা অবাঙালি সবাইকে নিষ্ক্রিয় করেছেন মাত্র–এমন সময়ই ইবিআরসিতে বাঙালি সৈন্য ও অফিসারদের ওপর ২০ বালুচের আক্রমণের প্রাথমিক খবর এসে গেল মেজর জিয়ার কাছে।

চট্টগ্রামে ২৫ মার্চের রাত সাড়ে ৯টার দিকে হালিশহরে আমার অফিস থেকে ক্যাপ্টেন হারুনের কাছে একটি টেলিফোন কল বুক করেছিলাম। কাপ্তাই এলাকা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে এনে অবিলম্বে চট্টগ্রামে এসে আমার সাথে যুদ্ধে যোগ দিতে বলার জন্যই এই ফোন।

চট্টগ্রাম, ২৫ মার্চ, রাত ২টা (২৬ মার্চ প্রথম প্রহর)। একজন অপরিচিত ব্যক্তি রেলওয়ে হিলে আমার ট্যাকটিকল হেডকোয়ার্টারে এসে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘ, সুঠামদেহী এই লোকটি আমাকে বললেন, কালুরঘাট এলাকায় একটি রেডিও ট্রান্সমিটার স্টেশন আছে। সেখানে গিয়ে যুদ্ধ শুরুর একটা ঘোষণা দিন।

'এখানে আমি একমাত্র অফিসার, আমার পক্ষে এখন এ স্থান ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে আপনি একটা কাজ করতে পারেন। একটি টেপরেকর্ডার নিয়ে আসুন। আমার বক্তব্য টেপ করে তা রেডিও স্টেশনে নিয়ে প্রচার করতে পারবেন।'

এর পরও অপরিচিত আগন্তুক তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য আমার ওপর এত চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যে আমি খুবই সন্দিহান হয়ে পড়লাম। আমি ভাবলাম 'পুরো বিষয়টি পাকিস্তানিদের একটা চক্রান্ত হতে পারে। আমাকে রাজি করাতে না পেরে তিনি রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি নিয়ে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু তিনি আর কখনো ফিরে আসেননি।'

২৬ মার্চ ভোর ৪টার দিকে টেলিফোনে 'মেসেজ' পেলাম যে প্রায় ১০০ গাড়ির একটা বড় 'কনভয়' কুমিল্লা ছেড়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা দিয়েছে। কুমিল্লা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কর্মরত জনাব শাকুর এই 'মেসেজটি' চট্টগ্রাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপারেটরকে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি সাথে সাথে আমাকে পুরো খবরটি জানিয়ে দেন। এ 'মেসেজটি' কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত বাঙালি মেজর বাহার আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

খবর পেয়ে সাথে সাথেই আমি হালিশহর থেকে একজন জেসিওর নেতৃত্বে এক কোম্পানি সৈন্য পাকিস্তানিদের এই দলটিকে অ্যাম্বুশ করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। হালকা এবং ভারী মেশিনগান ছাড়াও আমাদের এই কোম্পানির সাথে ছিল মর্টার ও রকেট লঞ্চার। অভিযানে রওনা হওয়ার পূর্বে এই কোম্পানির জেসিও ইনচার্জ সুবেদার মুসা টেলিফোনে আমাকে বললেন, 'আমাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করবেন, স্যার।'

আমাদের এই সাহসী সৈনিকরা মাতৃভূমির জন্য ঠিক তা-ই করতে পেরেছিল। পাকিস্তানিদের যে কলামটি কুমিল্লা থেকে আসছিল সেখানে ছিল ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সেস রেজিমেন্ট, ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের একটি দল, ৮৮ মর্টার ব্যাটারি এবং ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সৈন্য। এরা সবাই ২৬ মার্চ বিকেল ৩টার দিকে কুমিল্লা

ক্যান্টনমেন্ট থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। কুমিল্লা থেকে ১০০ মাইল দূরে চট্টগ্রামের পথে এই কলামটিকে অনেক কালভার্ট এবং ব্রিজ অতিক্রম করতে হয়। কুমিল্লায় ৫৩ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি নিজেই এই কলামটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

২৬ মার্চ বিকেলে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি ও তাঁর সৈন্যদল চট্টগ্রাম থেকে ১২ মাইল দূরে কুমিরায় পৌঁছে যায়। আমাদের ইপিআর সৈন্যরা ইতোমধ্যেই সেখানে অ্যাম্বুশে অবস্থান নিয়ে অপেক্ষায় ছিল।

পথের ছোটখাটো সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চট্টগ্রাম শহরের মাত্র ১২ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারায় ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি হয়তো খুব নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে আর আধাঘণ্টার মধ্যে তিনি চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছে সেখানে অবস্থানরত পশ্চিমা সৈন্যদের সাথে যোগ দিয়ে শহর দখল করে ফেলবেন। কিন্তু হঠাৎ করে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে গেলেন। সুশিক্ষিত এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত তাঁর সৈন্যদের অর্ধেকের বেশি নিয়ে আমাদের অ্যাম্বুশের মধ্যে ধরা পড়ে গেলেন ইকবাল শফি। কুমিরায় মহাসড়কটির এই অংশে স্থানীয় জনগণ আগে থেকেই 'ব্যারিকেড' স্থাপন করেছিল। পাকিস্তানিরা এখানে পৌঁছার পর 'ব্যারিকেড' সরানোর জন্য থামে। তখন বিকেল ৫টা। আমাদের সব সৈন্যরা একযোগে পাকিস্তানিদের ওপর ব্যাপক গুলিবর্ষণ শুরু করে। ডান, বাম ও সম্মুখ–তিন দিক থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসতে থাকে। দিশেহারা হয়ে পড়েন ইকবাল শফি ও তাঁর সৈন্যরা।

পরে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে কুমিরায় এই অ্যাম্বুশে পাকিস্তানিদের অনেক যানবাহন ধ্বংস হয় এবং ৭০ জনেরও অধিক হতাহত হয়। অন্য সূত্রের খবরে আরো জানা যায়, পাকিস্তানের ২৪ এফএফ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার এবং ১০ জন সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং আরো অনেকে আহত হয়। পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচালেন ইকবাল শফি। তাঁর পেছনে আতঙ্কিত অন্য পাকিস্তানি সৈন্যরাও পালাতে শুরু করে–কেউ পাহাড়ের দিকে, কেউ সমুদ্রের দিকে।

এদিকে অ্যাম্বুশ সফল হওয়ার পর আমাদের সৈন্যরা চট্টগ্রাম শহরের দিকে সরে এসে থেকে ছয় মাইল দূরে মহাসড়কের ওপরেই ভাটিয়ারী এলাকায় এসে অস্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করে। কুমিরার অ্যাম্বুশ এবং পরবর্তী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আমাদেরও ১৪ জন হতাহত হয় এবং এদের অনেকের অবস্থা ছিল সংকটজনক। কুমিরায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সফল এই অ্যাম্বুশ ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামরিক অভিযান এবং এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

২৬ তারিখ সকাল ৯টার দিকে অনেক উঁচু দিয়ে পাকিস্তানিদের হেলিকপ্টারগুলো উড়তে শুরু করলে কয়েকজন বাঙালি তাদের বাড়িঘর থেকে বন্দুক দিয়েই

হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। বিরাটকায় সি-১৩০ পরিবহন বিমানে করে ঢাকা থেকে সৈন্য নিয়ে আসা হচ্ছিল। আমরা আমাদের অবস্থানসমূহ রক্ষার প্রচেষ্টায় লিপ্ত এবং পাকিস্তানি সৈন্যরা যেন ক্যান্টনমেন্ট অথবা 'নেভাল বেইস' থেকে বেরিয়ে একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে না পারে সে বিষয়টা নিশ্চিত করার জন্য আমরা বেশ সচেষ্ট ছিলাম। কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে বেরিয়ে আসতে পাকিস্তানিদের কোনো বেগ পেতে হলো না। কারণ, আগের রাতেই তারা সেখানে ইবিআরসির ওপরে আক্রমণ চালিয়ে এক হাজারের অধিক বাঙালি সৈন্য হত্যা করেছিল।

এদিকে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট শহর ছেড়ে চলে যায়। এর ফলে ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা কয়েকটি ট্যাংক নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরের দিকে এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

২৬ মার্চ আনুমানিক ২টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম শহরের কয়েক মাইল বাইরে কালুরঘাটে চট্টগ্রাম রেডিওর 'ট্রান্সমিশন সেন্টার' থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জনাব এম এ হান্নান ঘোষণা বাণীটি পাঠ করেন। এই ঘোষণা বাণীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ থেকে নিরীহ বাঙালিদের রক্ষা করার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন ছাড়াও বাঙালিদের যার যা আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান করা হয়। পরবর্তীতে এই সেন্টারের নাম করা হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।' ট্রান্সমিটারটির প্রচারের রেঞ্জ কম থাকায় ২৬ মার্চ জনাব হান্নানের প্রথম ঘোষণা পাঠ এবং পরবর্তীতে ওই স্টেশন থেকে অন্যান্যদের বক্তব্যও স্পষ্টভাবে অনেক স্থানে শোনা যায়নি।

কুমিরা এলাকায় আমাদের অ্যাম্বুশের ফলে মহাসড়ক ধরে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি তাঁর সৈন্যদের একটি দলকে ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সাথে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় মিলিত হওয়ার জন্য পাহাড়ের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে দেন। অন্য একটি দলকে পাঠিয়ে দেন সমুদ্র উপকূল দিয়ে অগ্রসর হতে–ওরা যেন পেছন দিক দিয়ে এসে আমাদের অবস্থানকে ঘিরে ফেলতে পারে। ইতোমধ্যে অবশ্য আমাদের সৈন্যরা কিছুটা পেছনে সরে এসে একটা নতুন 'ডিফেন্স' গড়ে তুলেছিল।

কুমিরার ইপিআর কোম্পানিটির গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে আসছিল এবং হালিশহর হেডকোয়ার্টারে আমার কাছে মজুদ খুব বেশি ছিল না। কোম্পানিটিকে তখন আরো পেছনে সরে এসে শহরের উপকণ্ঠে নতুন প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করার নির্দেশ দিলাম। আমাদের ওই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুন সৈন্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদের; কিন্তু গোলাবারুদ পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। আর শহরের বাইরে যা কিছু সৈন্য ছিল তারা শহরে আসতে গিয়ে আটকা পড়ে বিভিন্ন জায়গায়। রাঙামাটি থেকে ইপিআরের যে সৈন্যরা শহরের দিকে আসছিল তারা আটকা পড়ে গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়। রামগড় এলাকায় ছিল

ইপিআরের দুটি কোম্পানি। কিন্তু তারাও মহাসড়ক ধরে চট্টগ্রামের দিকে আসতে পারছিল না।

আমার সামনে তখন দুটি মাত্র বিকল্প রইল। প্রথমটি ছিল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের অস্ত্র এবং গোলাবারুদের ডাম্পগুলো দখল করা। আর দ্বিতীয় বিকল্পটি ছিল, সাহায্যের জন্য ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ করা–যদিও আমি কোনো ধারণাই করতে পারছিলাম না যে ভারত সরকার আমার আবেদনে কীভাবে সাড়া দেবে। তবে আপাতত প্রথম পন্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্তই নিলাম আমি। রামগড়ের একটি কোম্পানিকে নির্দেশ দিলাম তারা যেন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের পেছনে পাহাড়ি এলাকায় অবস্থান নেয়। সেখানে ইতোমধ্যে রাঙামাটি থেকে আসা কিছু সৈন্য 'রিইনফোর্সমেন্টের' অপেক্ষায় ছিল। রামগড়ের অবশিষ্ট সৈন্যদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে শুভপুর ব্রিজ এলাকায় প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলার নির্দেশ দিলাম–কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বা অন্য কোনো এলাকা থেকে সড়কপথে পাকিস্তানিরা যেন কোনো 'রিইনফোর্সমেন্ট' না পায়।

২৬ মার্চ রাত সাড়ে ৮টার দিকে রেলওয়ে হিলে আমার 'ট্যাকটিকল হেডকোয়ার্টারের সামনে নৌবাহিনীর যোগাযোগ কেন্দ্রে পাকিস্তানিদের অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ করলাম। বেসামরিক পোশাকে ওদের কিছু লোক সামনের পাহাড়ে একটা মসজিদে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর তাদের সাথে আরো কিছু বেসামরিক লোক একই মসজিদে গিয়ে যোগ দেয়। এ সময় আমাদের পাহাড়ের একটু নিচের অবস্থানে এলএমজি নিয়ে 'পজিশনে' থাকা আমার একজন সৈন্য 'ট্রেঞ্চ' থেকে বেরিয়ে আসতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়। গুলি ছোড়া হয়েছিল মসজিদের দিক থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানিরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের অবস্থানের ওপর ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু করে। একই সময় বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজগুলোও গোলাবর্ষণ শুরু করে।

'শেল'গুলো ফাটতে থাকে চারপাশে। চোখের পলকে শেলের টুকরো ছুটে যায় প্রচণ্ড গতিতে। কিছুক্ষণ পর 'টাইগারপাস'-এর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে পাকিস্তানিরা রেলওয়ে হিলে আমাদের অবস্থানে আক্রমণ চালালে আমরা তা প্রতিহত করি। আবার আক্রমণ চালায় পাকিস্তানিরা। দুটি আক্রমণই সরাসরি সামনের দিক থেকে হওয়ায় পাকিস্তানিদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। তারা খুব একটা সুবিধা করতে পারল না। এরপর পাকিস্তানিরা তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে ফিরে যায় এবং আমাদের ওপর গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখে।

পাকিস্তানিরা একই সময়ে হালিশহরেও আমাদের অবস্থানসমূহের ওপর আক্রমণ চালায়। তবে আমাদের সৈন্যরা দৃঢ়তার সাথে সে আক্রমণ প্রতিহত করে। শহরের অন্যান্য প্রায় সব জায়গায়ই পাকিস্তানিদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। শেলের বিস্ফোরণে পুরো শহর যেন কেঁপে উঠছিল। 'ট্রেসার' বুলেট ছুটে আসছিল

ঝাঁকে ঝাঁকে, রাতের আকাশকে রহস্যময় আলোতে আলোকিত করে ফেলল 'ট্রেসার' বুলেটগুলো। মনে হচ্ছিল ২৬ মার্চের রাত যেন শেষ হবে না।

ঘণ্টা দুয়েক পর গোলাবর্ষণ কমে আসে কিছুটা। এ সময় আমার একজন আহত সৈন্যকে নিয়ে আসা হয় কমান্ড পোস্টে। ১৮-১৯ বছর বয়সী তরুণ। ওর পুরনো ময়লা কাপড় ভিজে গেছে রক্তে। একটা বুলেট তার বুক বিদ্ধ করেছে। অতি কষ্টে শ্বাস নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে সে শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি মরে যাব?' তার চোখ দুটি ছিল ভাবলেশহীন। আর সেখানেই যেন ফুটে উঠেছিল জীবনের সব প্রশ্ন, বিপুল জিজ্ঞাসা। এরপর আর কিছুই বলতে পারেনি ওই যোদ্ধা। আরো অনেকের মতো আমাদের মাঝ থেকে সে তরুণ হারিয়ে গেল চিরতরে।

চট্টগ্রামে ইপিআরের বাঙালি সৈন্য ও জনগণের সহায়তায় আমি পাকিস্তানিদের ওপর Pre-emptive (আক্রান্ত হওয়ার আগেই ব্যবস্থা নেওয়া) আক্রমণ চালিয়ে সফল হই। ২৪ মার্চ রাত এবং ২৫ মার্চ ১৯৭১ সীমান্তের সকল ফাঁড়ি ও চট্টগ্রাম শহর দখলে নিয়ে নিই, যা পাকিস্তানিরা কল্পনাও করতে পারেনি। সর্বোপরি ২৬ মার্চ কুমিরায় অ্যাম্বুশ করে পাকিস্তানিদের পুরো একটি ব্রিগেডকে তছনছ করে মুক্তিযুদ্ধের গতিধারা আমরাই নির্ধারণ করে নিয়েছিলাম।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক সাফল্য আমাদের অদম্য আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলে যে যুদ্ধ যত দীর্ঘ এবং রক্তাক্তই হোক না কেন–আমাদের স্বাধীনতা অর্জন অপ্রতিরোধ্য, বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

লেখক : সংসদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধে ১ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার।

একুশের অবদান : ঘরে-বাইরে

আহমদ রফিক

ভাষা আন্দোলনের সূচনা ১৯৪৭ থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে যখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সে সময় মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতাদের মুখে বারবার একই কথা উচ্চারিত হচ্ছিল : হবু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। তখনই দু-চারজন বাঙালি মুসলমান শিক্ষক-সাংবাদিক-লেখক সাহস করে যুক্তিসংগতভাবে বলতে ও লিখতে পেরেছিলেন অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার কথা। যেমন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল হক, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. আবুল কাসেম প্রমুখ।

রাষ্ট্রভাষা দাবির এই আদি বা তাত্ত্বিক পর্যায় পার হয়ে রাষ্ট্রভাষার পক্ষে বাস্তব আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৮ মার্চ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। এর ব্যাপক জাতীয়তাবাদী রূপে প্রকাশ ১৯৫২ ফেব্রুয়ারিতে, যখন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিপূর্ণ ভাষা আন্দোলনে পরিণত হয়। তখন স্লোগান শুধু রাষ্ট্রভাষার নয়, মিছিলে মিছিলে দেশের (পূর্ববঙ্গ প্রদেশের) সর্বত্র স্লোগান ওঠে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', 'সর্বস্তরে বাংলা চালু করো' (জাতীয় জীবনের)।

প্রথম স্লোগানটি যেমন জাতিরাষ্ট্রের ইঙ্গিতবহ, দ্বিতীয় স্লোগানটি গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি প্রতিফলিত করে এবং তৃতীয়টি জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে উচ্চশিক্ষা, উচ্চ আদালত প্রভৃতি ক্ষেত্রে মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটায়। মায়ের মুখের ভাষা তথা মাতৃভাষা যেমন ভাব বিনিময়, সাহিত্য রচনা ইত্যাদির মাধ্যমে একটি ভূখণ্ড ঘিরে একটি জনগোষ্ঠীকে ভাষিক ও জাতীয় আবেগে সংহত করে, তেমনি জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে একটি জাতীয় ভাষার মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা নিশ্চিত করে।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২-এর একুশে পর্বে পৌঁছে এই জাতীয়তাবাদী রূপের ভাষা আন্দোলনে পরিণত ও পরিস্ফুট হয়। ভাষার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক দিকগুলো বিচার করে দেখলে এর পারস্পরিকতা ও স্বাতন্ত্র্যবাদী চরিত্রও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে লক্ষিত হয় এর নেতিবাচক দিক 'জাতভিমান', যা বিশ্বজনীন মানব চেতনার বিরোধী তবু আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সমৃদ্ধির টানে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও জাতিরাষ্ট্র গঠন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে

সময় বিশেষে শ্রেণি চেতনা হার মানে। পিছু হটেছে বিশ্বের একাধিক দেশ তেমন উদাহরণ দৃশ্যমান।

বাস্তবিক একুশে হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ভবিষ্যৎ ভাষিক জাতিরাষ্ট্রের বীজতলা। এ যাত্রাপথ মোটেই মসৃণ ছিল না, ছিল অবাঞ্ছিত জটিলতায় যুক্ত। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিভাজক নীতি ও তাদের বঙ্গীয় কৃষিনীতির কারণে বঙ্গীয় মুসলমান শুধু প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায়ই নয়, উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের তুলনাই নয়, উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের তুলনায়ও শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক পর্যায়ে পিছিয়ে পড়েছিল। ইরফান হাবীব প্রমুখ উত্তর ভারতীয় গবেষকদের রচনা তেমন প্রমাণ দেয়। বিহার, উত্তর প্রদেশ থেকে মুম্বাই, পাঞ্জাব-গুজরাট তার প্রমাণ।

স্বভাবতই হীনম্মন্যতায় ভুগেছে বাঙালি মুসলমান। তাই জিন্নাহর স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির স্বতন্ত্র ভুবন (পাকিস্তান) আত্মউন্নয়ন ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় তাদের কাছে আকর্ষণীয় স্বপ্নের ভুবন বলে মনে হয়েছে। এই অবাঞ্ছিত রাজনীতি থেকে মুক্ত হতে অনেকটা সময় লেগেছে। পঞ্চাশের দশকে পৌঁছে এই যাত্রার মুক্তিস্নান।

বাঙালি মুসলমানের জন্য দেশভাগ পূর্বকালে পাকিস্তান হয়ে ওঠে স্বপ্নের ভুবন। তাদের অসীম উদারতার সুযোগ নিয়েছিল জিন্নাহ-লিয়াকত থেকে পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। বাঙালি মুসলমানের ভোটে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি রচিত হয়েছিল ১৯৪৬-এর প্রাদেশিক নির্বাচন তার প্রমাণ। তারা এক জোটে মুসলিম লীগের বাক্সে ভোট দিয়েছিল। ফজলুল হক সাহেবের দুটি আসন বাদে বাকি সব মুসলিম লীগ দখল করে।

কিন্তু মুসলমানপ্রধান পশ্চিম ভারতে ভোটের ফলাফল ছিল ভিন্ন ও মিশ্র। গুরুত্বপূর্ণ পাঞ্জাব প্রদেশসহ সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগবিরোধী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সিন্ধুতে লীগ অতিকষ্টে ইউরোপিয়ান ব্লকের সমর্থনে মন্ত্রিসভা গঠন করে। এককথায় বাঙালি মুসলমানই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বাস্তব পটভূমি তৈরি করেছিল।

আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালি মুসলমানের অসীম উদারতায় অমৃতের সবটুকু গ্রাস করে উর্দুভাষী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তির কল্যাণে পশ্চিম পাকিস্তান। ঢাকা নয়, করাচি হয় পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী, পরে রাওয়ালপিন্ডি হয়ে বিপুল অর্থ ব্যয়ে স্থায়ী রাজধানী ইসলামাবাদ। ঢাকা বিকল্প রাজধানীর মর্যাদাটুকু পর্যন্ত পায়নি।

ইঙ্গ-মার্কিন বিদেশি ঋণ ও অনুদানের বেশির ভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে নানা ধারার শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে এবং করাচি বন্দরের আধুনিকায়নের মতো উন্নয়নকর্মে, চট্টগ্রাম বন্দর পূর্বাবস্থায়। পূর্ববঙ্গের পাট ও বস্ত্র কলগুলোর মালিকানায় ছিল উর্দুভাষী অবাঙালি শিল্পপতিবৃন্দ। শিল্প, শিক্ষা ও নানা খাতে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে বিপুল আর্থ-সামাজিক বৈষম্য গড়ে ওঠে।

বিস্ময়কর যে শুধু কেন্দ্রীয় শাসনের উচ্চপদগুলোতেই নয়, পূর্ববঙ্গীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদগুলোতেও দেখা গেছে উর্দুভাষী অবাঙালিদের প্রাধান্য। এই বৈষম্য

ধীরে-সুস্থে গড়ে ওঠে। তবে বাঙালি মুসলমানের পাকিস্তানবিষয়ক স্বপ্নে প্রথম আঘাত পড়ে যখন জিন্নাহ-লিয়াকত থেকে শুরু করে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বলতে থাকেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়। বিষয়টি ইতিপূর্বে উল্লিখিত।

তবু অবাক হওয়ার মতো ঘটনা, বাঙালি মুসলমানের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানি প্রভাব এতই ছিল যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শুরুতে লীগ রাজনীতিকগণ তো বটেই, শিক্ষিত শ্রেণির অংশবিশেষের সমর্থন ছিল উর্দু ও উর্দুভাষী নেতৃবৃন্দের প্রতি।

১৯৪৬-এর নির্বাচনে ও পাকিস্তান আন্দোলনে প্রধান চালিকাশক্তি ছিল ছাত্র-যুবারা। তাদের ক্লান্তিহীন শ্রমে ও মুসলিম লীগের প্রচারে পাকিস্তান দাবি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। দাবিটি হয়ে ওঠে সর্বজনীন চরিত্রের।

এই অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক চরিত্রের অবসান ঘটায় যে ভাষা আন্দোলন, তারও চালিকাশক্তি রাজনীতিসচেতন ছাত্র-যুবা, যাদের শ্রমে-আদর্শে এবং আত্মদানে ভাষার নাম মাত্রিক দাবিগুলোকে (স্লোগান স্মর্তব্য) কেন্দ্র করে একুশের আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, চাটমোহর থেকে মেহেরপুর, অর্থাৎ প্রদেশের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়, যদিও মূলত শিক্ষায়তনগুলোকে কেন্দ্র করে। আন্দোলন সর্বজনীন চরিত্র অর্জন করে, তবে ১৯৪৬-এর বিপরীত চরিত্রে। সুস্পষ্টভাবেই অসাম্প্রদায়িক, উদার গণতন্ত্রী, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ধারায়।

বিভাগপূর্ব রাজনীতির চরিত্র বদল ঘটায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-৫২), বিশেষ করে একুশের ভাষিক জাতীয়তাবাদী চেতনানির্ভর আন্দোলন। এই আন্দোলন ছাত্র-যুবা এবং একপর্যায়ে জনতার অসীম সাহস ও বীরত্বের প্রকাশ।

১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারির ছাত্র-যুবাদের ঘোষিত কর্মসূচি বানচাল করতে ঢাকা প্রশাসন ২০ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) বিকেলে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। সামনে নির্বাচনের গাজর ঝোলানো থাকায় রাজনীতিকপ্রধান সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভাঙার বিপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে, যদিও ছাত্র-যুবা নেতৃত্বের প্রধান অংশ সে প্রস্তাব মেনে নেয়নি, সাধারণ ছাত্ররা তো নয়ই। তাদের কথা, যেকোনো মূল্যে তারা ১৪৪ ধারা ভেঙে নির্ধারিত কর্মসূচি পালন করবে।
সে উদ্দেশ্যে একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে আর্টস বিল্ডিং প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক আমতলায় ছাত্রছাত্রীদের অনড় সিদ্ধান্ত ১৪৪ ধারা ভেঙে মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণের দিকে বেরিয়ে যাওয়া ১০ জনের ছোট ছোট মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের সম্মুখীন হয়।

সেদিন দুপুরের অসাধারণ ঘটনা–পুলিশের কঠিন ব্যারিকেড ভাঙায় অপারগ হোস্টেল প্রাঙ্গণে স্লোগানরত ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং রফিক-

জব্বার-বরকত প্রমুখের শাহাদাতবরণ, দিনটি পরবর্তী সময়ে চিহ্নিত হয় শহিদ দিবস হিসেবে। প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা শহরসহ গোটা প্রদেশ প্রতিবাদে উত্তাল। ঢাকা লাল-কালোয় আশ্চর্য এক প্রতিবাদের শহর, পুরান ঢাকার অধিবাসীদেরসহ।

২২ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা মিছিলের শহর। পুরনো স্লোগানগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন স্লোগান–'শহিদ স্মৃতি অমর হোক'। সেই স্লোগান বাস্তবায়নে ২৩ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজের রাজনীতিমনস্ক ছাত্ররা তাদের হোস্টেল প্রাঙ্গণে এক রাত্রির শ্রমে তৈরি করে ১০ ফুট উঁচু, ৬ ফুট চওড়া পাকা একটি শহিদ মিনার। ঢাকাবাসীর প্রিয় সে মিনার ২৬ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনের দিনেই বিকেলে পুলিশ ভেঙে ফেলে, ইটের শেষ টুকরাটি পর্যন্ত তুলে নিয়ে যায়।

কিন্তু শহিদ মিনার মরে না। ভাষিক চেতনার মানুষের মনে সে চিরজীবী হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে রাজশাহী থেকে নড়াইল শহরে ছাত্র-যুবাদের চেষ্টায় গড়ে ওঠে শহিদ মিনার, এমনকি গ্রামের স্কুল প্রাঙ্গণেও। পরবর্তী সময়ে সরকারি উদ্যোগে ঢাকায় যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মাণের চেষ্টা চলে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে, তার অবশেষ পরিণাম মূল নকশা থেকে কাটছাঁট করা বর্তমান শহিদ মিনার। হামিদুর রহমানের মূল নকশা ও নভেরা আহমদের ভাস্কর্য কিছুই এতে ধরা পড়েনি। বর্তমান সরকার আকর্ষণীয় মূল নকশাটির ধারায় শহিদ মিনার পুনর্নির্মাণ করে ভাষাসংগ্রামী ও সংস্কৃতিসচেতন জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। নতুন মিনার বিদেশি পর্যটকদের প্রশংসা কুড়াবে।

ভাষা আন্দোলন একুশে জাতিকে (এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ) রাষ্ট্র ও সরকারকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী প্রতীক উপহার দিয়েছে। প্রথমত, শহিদদের আত্মদানের স্মৃতিনির্ভর শহিদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারির; দ্বিতীয়ত, শহিদ মিনার। শুধু কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারই নয়, দেশব্যাপী নির্মিত ছোট-বড় নানা আকৃতির শহিদ মিনার–জাতি যেখানে প্রতি বছর একবার করে হলেও শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়।

শহিদের আত্মদানের স্মৃতিনির্ভর শহিদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি একদিকে শোক, অন্যদিকে প্রতিবাদ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে স্বীকৃত। দিনটির সঙ্গে জড়িত রয়েছে শহিদ মিনার থেকে সূচিত স্মারক মিছিল এবং অপরাহ্নে জনসভা। শহিদ দিবসের ছুটি উপলক্ষে গোটা দেশ এই রীতি প্রথম পালন করে থাকে।

শহিদ মিনার এদিক থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এর প্রতীকী তাৎপর্যের জন্য ধরা রয়েছে শহিদের জন্য শোক, অনাচারী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণা, প্রতিবাদ–সর্বোপরি জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেরণা। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞের উৎসস্থল।

ভাষা আন্দোলনের আরেক গৌরবময় অবদান বৈশ্বিক পরিসরে এই দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা, যা বাংলাভাষী মানুষমাত্রের জন্যই অহংকারের বিষয়। এর প্রাথমিক কৃতিত্ব রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম নামের দুই প্রবাসী বাংলাদেশি। সেই সঙ্গে কৃতিত্ব তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের এবং

বিশেষভাবে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ও বিশিষ্ট বাংলাদেশি কূটনীতিক সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীর আন্তরিক তৎপরতার। ঘোষণাটি আসে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে ১৭ নভেম্বর।

ভাষা আন্দোলন একুশের (১৯৫২) অবদান এভাবে ঘরে-বাইরে আমাদের জন্য গর্বের বিষয় হয়ে আছে; যদিও এর গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান : 'সর্বস্তরে বাংলা চালু করো' এত কাল পরও চালু হয়নি। উচ্চশিক্ষা, উচ্চ আদালতের মতো একাধিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাজভাষা ইংরেজি সগৌরবে বিরাজমান, মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা বাংলা সে বিবেচনায় অনেক পিছিয়ে এবং সত্যি বলতে কি আমাদের চর্চায় হেলাফেলার পাত্র। একমাত্র ব্যতিক্রম সাহিত্য-সংস্কৃতির ভুবনটি।

এককথার শেষ কথা হচ্ছে, ভাষা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ অবদান একুশের রক্তরঞ্জিত জাতীয়তাবাদী চেতনার পথ ধরে ষাটের দশকে স্বশাসনের জোরালো হাওয়ায় (৬ দফা, ১১ দফা) ঊনসত্তরের গণজাগরণ ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। প্রাপ্তি একটি নতুন পতাকা, একটি নতুন মানচিত্র, একটি অসাধারণ সংবিধান এবং সংবিধানসম্মত একক রাষ্ট্রভাষা বাংলা ('প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা')।

কিন্তু অনভিজ্ঞ থেকে গেছে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রচলন, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা-বিজ্ঞান শিক্ষা ও উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিবর্তে রয়ে গেছে ঔপনিবেশিক রাজভাষা ইংরেজি। ভাষাসংগ্রামী ও আত্মসচেতন বাঙালি সংবিধানসম্মত রাষ্ট্রভাষার সর্বস্তরে প্রচলনের অপেক্ষায় রয়েছে।

লেখক : ভাষাসৈনিক।

১৫ই আগস্ট : শোক সাগরে সোনার বাংলার পথসন্ধান

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের মর্মন্তুদ এবং ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ড একটি শোকগাথার মহাকাব্য। সেদিনের সুবহে সাদিকে দেশীয়-আন্তর্জাতিক পরাজিত শক্তির এ দেশীয় গোলামরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শাহাদাত দান করে যে আশায়, তার মূল লক্ষ্যটি অবশ্য বিফলে যায়। বাঙালি জাতি সাময়িকভাবে আশা, ভাষা ও বেঁচে থাকার প্রেরণা হারিয়ে ফেললেও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে। কিষান-কিষানি শ্রমজীবী স্বল্প এবং সম্পদহীন মানুষকেই শেখ মুজিব তাঁর হৃদয়ে পরম সুহৃদ হিসেবে স্থান দিতেন। তাই তো তিনি রাখালরাজা–সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, গণমানুষের সম্মোহনী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অবিসংবাদিত নেতা।

জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতনের আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই অনুকরণীয় আদর্শের মাঝে বেড়ে ওঠেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান একজন সৎ, স্বচ্ছ, দয়ালু, সাহসী ও ন্যায়ের পক্ষে অবিচল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উক্তি, 'জনগণের জন্য কাজ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য আদর্শিক লড়াই করে আমার ছেলে তো কোনো অন্যায়ই করছে না। এ কারণে তার জেল-জরিমানা হলে আমি দুঃখিত না হয়ে গর্বিত হতে পারব'–এ কথা কিশোর মুজিবের বুকে অনেক বল এনে দিয়েছিল। মাতা সায়েরা খাতুন বিশাল পৈতৃক সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার খাতিরে গ্রামের বাড়ি ছেড়ে যেতে চাননি–এ থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্র মুজিব বিশ্বস্ত ব্যবস্থাপনার ছবক পান। অন্যতম গৃহশিক্ষক কাজী আব্দুল হামিদ ও প্রধান শিক্ষক বাবু রাসরঞ্জন সেনগুপ্তের কাছে শেখ মুজিব নীতিকথা, দরিদ্রের প্রতি মমত্ববোধ ও জনসেবার পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ সফরে এলে শেখ মুজিবের দৃঢ়, তেজস্বী ও দুর্বলের পাশে দাঁড়ানোর কৃতসংকল্পতায় আকৃষ্ট হন। শেরেবাংলার কৃষক প্রজাবান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়ন শেখ মুজিবকে প্রভাবিত করে। এইচ এস সোহরাওয়ার্দী তো তাঁর রাজনীতির দীক্ষা গুরু।
ত্রিশের দশকের শেষাশেষি যুবক মুজিব ব্রতচারী আন্দোলনের মহৎ মর্মবাণীতে মুগ্ধ হন। গুরু সদয় দত্তের বাণী চিরন্তনী
'পরহিংসা পরদ্বেষ কভু না এনো মনে, কভু না করিও লোভ তুমি পরধনে'

শেখ মুজিবের মনোজগতে আজীবন দোলা দিয়েছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্বদেশি আন্দোলনের মাঝে তিনি এ দেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনা দেখেছিলেন–তবে

সুভাষ বসুর সশস্ত্র সংগ্রামে নয়। জনগণের সম্মিলিত সুসংগঠিত শক্তির মাধ্যমেই দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে বলেই শেখ মুজিব আজীবন বিশ্বাস করেছেন। কলিকাতা করপোরেশনের ত্রয়ী নেতৃত্ব মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ডেপুটি মেয়র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মুখ্য নির্বাহী সুভাষচন্দ্র বসুর শতভাগ জনদরদি ও অসাম্প্রদায়িক নীতি, 'করপোরেশনের সকল নিয়োগে শতকরা ৬০ ভাগ পদে মুসলমানদের নেওয়া হবে–এ গ্যারান্টি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে' রাজনীতিক মুজিবের একটি পাথেয় হয়ে থাকে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বুভুক্ষুদের পাশে সর্বাত্মক সাহায্য-সহায়তা নিয়ে দাঁড়ানো এবং ১৯৪৬ সালের ভয়ংকর দাঙ্গার সময় 'লড়াই করে ইংরেজ তাড়ানোর জন্য, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটাবে' বলে তিনি রাজনীতির চলার পথে হাতে-কলমে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

ইসলামিয়া কলেজে বেকার হোস্টেলে দার্শনিক পণ্ডিত প্রফেসর সাইদুর রহমান ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল বিদগ্ধজন সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেমের কাছে শেখ মুজিব অসাম্প্রদায়িক ও দরিদ্রবান্ধব মানবিকতার পাঠ রপ্ত করেন। 'দাওয়াল' প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি কৃষি শ্রমিকদের হৃদয়াসনে স্থান করে নেন। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' স্লোগানে শামিল শেখ মুজিব ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বেনিয়া ইংরেজ শাসন-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানই সমাধান বলে মনে করতেন। তবে লাহোর প্রস্তাব 'ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস'-এর মাঝে একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব বাংলা এবং কেবিনেট মিশন পরিকল্পনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ফেডারেশন বাঙালির আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতির আশা ভিন্ন ভিন্ন কারণে নস্যাৎ হয়ে যায়। ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী-কিরণশংকর-শরৎ বসু বৃহত্তর বাংলার প্ল্যানে ভারত, বাংলা ও পাকিস্তান নামের তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে হতে হলো না; কারণ কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতারা কথা রাখেননি।

পাঞ্জাবি গোষ্ঠী কর্তৃক পাকিস্তানের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রথম প্রমাণেই, অর্থাৎ সাতচল্লিশের ১৪ আগস্টের পর পূর্ব বাংলা (ইস্ট বেঙ্গলকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্ট পাকিস্তান করা হয় ১৯৫৬ সালে সংবিধানের মাধ্যমে) সচিবালয়ের দক্ষ ও চৌকস বাঙালি গোলাম মুরশেদের প্রবীণতাকে ডিঙিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি আজিজ আহমেদকে চিফ সেক্রেটারি নিয়োগ দেওয়া থেকে শেখ মুজিবের বুঝতে বাকি থাকে না, 'মাউরাদের সাথে বেশিদিন থাকা যাবে না (কে জি মুস্তফা)।' আজিজ আহমেদ বাংলাভাষী মন্ত্রীদের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠাতেন কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে। পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ মানুষের সম্পদসমৃদ্ধ পূর্ব বাংলাকে শোষণ-বঞ্চনায় নিঃশেষ করে দেওয়ার নীলনকশা আরো পরিষ্কার হয় রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, সামরিক ও সকল ক্ষেত্রের বরাদ্দে পূর্ব বাংলাকে মাত্র ১৫-২০% হিস্যা দেওয়ার মাধ্যমে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাঙালি দোসর তথা খাজা নাজিমুদ্দিন, ফজলুর রহমান প্রমুখের মাধ্যমে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শুধুই উর্দু হবে' সিদ্ধান্ত ছাড়াও আরবি অথবা রোমান হরফে বাংলা লেখার অপচেষ্টা চালাতে থাকেন।

১৯৪৮ সালের মার্চে ছাত্রলীগ ও ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে শেখ মুজিব স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা আন্দোলন-সংগ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পেয়ে যান। রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রামের দুই পুরোধা অলি আহাদ ও গাজীউল হক দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে গেছেন, '১১ মার্চ ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে দোর্দণ্ডপ্রতার আন্দোলন, প্রসেশন, পিকেটিংয়ে মুজিব ভাই নেতৃত্ব না দিলে আন্দোলন দানা বাঁধত না।' ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের ৩৫ বছর বয়সী টগবগে সাহসী সদস্য স্পিকারের উদ্দেশে বলেন, 'মাননীয় স্পিকার, আমরা লক্ষ করছি আপনার লোকজন আমাদের পূর্ব পাকিস্তানি বলে চিহ্নিত করে। কক্ষনো না। আমরা পূর্ব বাংলা থেকে এসেছি। আমাদের নিজস্ব বাংলা ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। নামসহ এর কোনো পরিবর্তন করতে হলে অবশ্যই বাঙালিদের মতামত আগে নিতে হবে।' (ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় : দ্য কোয়ালিশন ইয়ারস)। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার লড়াই শুরু করার মুজিবীয় বীজ এখানেই প্রোথিত হয়।

স্বাধীনতার অভীষ্ট লক্ষ্যে কৃতসংকল্প থেকেও শেখ মুজিব মাঝে মাঝে পথ এবং কৌশল পাল্টাতেন। ষাটের দশকের শুরুতে আগরতলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্র সিনহার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরুর সাথে মতবিনিময় করেন। একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা ও লন্ডনে প্রবাসী সরকার গঠনের পরিকল্পনা বাদ দেন। তৈরি করেন বাংলার মুক্তি সনদ ছয় দফা; এর উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা দেন পাঞ্জাবিদের হৃৎপিণ্ড লাহোরে ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে। স্বায়ত্তশাসন-স্বাধিকারের আড়ালে ওই ছয় দফা প্রোগ্রামে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতাই নিহিত ছিল বুঝতে পেরে পাকিস্তানিরা ভড়কে যায়। মুজিব দমন তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। রুজু করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। গর্জে ওঠে বাংলার ছাত্র-জনতা। ঊনসত্তরের বিপুল শক্তি গণঅভ্যুত্থানের তোড়ে খান খান হয়ে যায় আইয়ুব খানের তখতে তাউস। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে জেলের তালা ভেঙে মুক্ত করে আনা শেখ মুজিবুর রহমানকে পল্টনে দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় শক্তিমান করে।

স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের খায়েশ তিনি পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হবেন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর আওয়ামী লীগ ছাড়া যে পাকিস্তানের কোনো নির্বাচনই গ্রহণযোগ্য হবে না, তা তিনি বুঝতে পারেন। ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোটের লোভনীয় প্রস্তাবসহ লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (এলএফও) অধীনে সত্তরের নির্বাচন ডাকেন। বঙ্গবন্ধু সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা কালে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁর আজীবনের নিঃস্বার্থ সেবা ও জনদরদে সম্পৃক্ত ছয় দফা বাঙালিরা গ্রহণ করেছে তাই 'ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট'

ফর্মুলায় শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষ তাঁকে জয়ী করবেই। ইয়াহিয়াকে লোভনীয় টোপ দিলেন, 'ভুট্টোর পরিবর্তে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তিনিই হবেন।' কিন্তু সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ১৬২/৩০০ নিয়ে ভূমিধস বিজয় লাভ করলে ইয়াহিয়া খান ভড়কে গিয়ে ভুট্টোর ক্যাম্পে হিজরত করতে বাধ্য হন।

অতঃপর গৌরবে উজ্জ্বল স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ–বঙ্গবন্ধুর নামে, শানে, আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় (যদিও তিনি তখন পাকিস্তানি কারাগারে) এল বহুমূল্যে কেনা বাংলার স্বাধীনতা। দামাল ছেলেমেয়ে, মুক্তিফৌজ ও ডানে-বাঁয়ে পেছনে থাকা আপামর বাঙালি সর্বান্তঃকরণ সমর্থনে দখলদার বাহিনী পরাজিত হলো। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বিজয় দিবসে বাংলাদেশের পরম মিত্র ও মহৎ প্রতিবেশী ভারত কর্তৃক সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতা দানকারী বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি পরাজিত বাহিনী আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করে। সাক্ষী থাকেন বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি বিমানবাহিনী প্রধান এ কে খন্দকার।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বীরের বেশে ফিরে এলেন তাঁর সৃষ্টি করা স্বাধীন বাংলাদেশে। বিমানবন্দর থেকে ৩২ নম্বরে পরিবার-পরিজনদের অপেক্ষমাণ রেখে চলে গেলেন রেসকোর্স ময়দানে, 'ভায়েরা আমার' যেখানে অপেক্ষমাণ। একমুঠো বাংলার মাটি কপালে স্পর্শ করিয়ে নম্রকণ্ঠে বললেন তিনি খুবই খুশি স্বাধীন বাংলায় তথা জনমানুষের কাছে ফিরে এসে। কৃতজ্ঞ জাতি তাদের রাষ্ট্র, পরিচয় ও প্রথমারের মতো বাংলাভাষী বাঙালি দ্বারা স্বাধীনতা এনে দেওয়ার কাণ্ডারি মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে বরণ করে নেয়। তবে জাতির পিতা স্মরণ করিয়ে দেন যে যদি স্বাধীন বাংলাদেশে একটি লোকও না খেয়ে মারা যান অথবা আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাহীন থাকেন তাহলে তাঁর জীবনসাধনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে।

নিন্দুকেরা যা-ই বলুক, তিন বছর সাত মাসের শাসনকালে জাতির পিতা অত্যন্ত সফলভাবে একটি ছিন্নমূল জাতির লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া অর্থনীতির পুনরুত্থান ঘটিয়ে স্বয়ম্ভর অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার মতো কার্যকর শাসনব্যবস্থা চালু ও পরিচালনা করেন। ৯ মাসের মাথায় একটি আধুনিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও সমতা নিশ্চিতকারী সংবিধান প্রণয়ন করেন। চমৎকারভাবে প্রণীত নিম্নবিত্ত মানববান্ধব পাঁচসালা পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) অধীনে দারিদ্র্য নির্মূল, কৃষিতে বৈপ্লবিক উন্নয়ন, শিল্প বিশেষ করে গ্রামীণ শিল্পের উত্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অগ্রগতির মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিকল্পনার মাঝেও নিয়ামক পরিমণ্ডলে বাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটানোর সুদূরপ্রসারী পথ নির্দেশ দেওয়া হয়। শহরে-গ্রামে, নারীতে-পুরুষে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণের অঙ্গীকার করা হয়। প্রয়োজনবোধে বিত্তবানদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করে গরিব কিষান-কিষানি ও শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে সমবায় ও অন্যান্য উদ্ভাবনী উপায়ে

অর্থনীতি সমাজনীতিকে ঘুরে দাঁড়ানোর পথে আনেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৪-৭৫ সালে সমষ্টিক অর্থনীতির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.৮ ভাগে উঠে যায়। অনুন্নত দেশকে জাতির পিতা ১৯৭৫ সালে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত করেন। ৮৫ মার্কিন ডলারের মাথাপিছু আয় ১৭০ ডলারে উন্নীত হয়।

'সবার সাথে সখ্য, কারো সাথে বৈরী নয়' বলিষ্ঠ নীতির ফলে বিশ্বসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে নিয়ে যান। দ্রুতগতিতে আসতে থাকে স্বাধীনতার স্বীকৃতি; ঘটে জাতিসংঘের সদস্যপদ। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বে জুলুমে অত্যাচারিত বৈষম্যের কশাঘাতে রিক্ত মানুষের পক্ষে যে যুগান্তকারী ভাষণ দেন তাতে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়ে ওঠে। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন লিখলেন, 'বর্তমান যুগের ইতিহাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক জন্ম একটি বিরাট ঘটনা।.... সুচিন্তিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব, শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রমাণ সমগ্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালির অধিনায়ক ও বন্ধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও মহান নেতা।'

ব্যক্তিজীবনে সহজ-সরল, সুস্থ চিন্তা ও পূর্ণ সততার অধিকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষকে বুকে টেনে নেওয়ার সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সেই গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলের ছাত্র শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের বড় ছেলে শেখ মুজিব ওরফে খোকা উচ্চারণ করেছিলেন, 'যখনই আমি দুঃখী ভাই-বোনের মুখে হাসি দেখি তখনই মনে হয় আমার জীবন সার্থক'। সেই সোনার বাংলায় কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনা ও উদাহরণ বঙ্গবন্ধু নিজেই। এখন তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁর রক্তের ঋণ শোধ করার যে সর্বব্যাপী বিশাল কর্মযজ্ঞ জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা সৃষ্টি করেছেন তার পূর্ণ বাস্তবায়নই হবে ১৫ই আগস্টের শোক মহাসাগরের উপযুক্ত জবাব।

লেখক : বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

বাংলাদেশ : দৃপ্তপদে উন্নয়ন অভিযাত্রায়

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ছিল সংকটাপন্ন। দেশে কৃষি ছিল অচল, শিল্প বন্ধ, যোগাযোগব্যবস্থাসহ অবকাঠামো বিধ্বস্ত, ব্যাংকগুলো অর্থশূন্য, বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল খালি। রাষ্ট্রযন্ত্র অকেজো এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মাত্র দুটি রাষ্ট্রের (ভারত ও ভুটান) মধ্যে সীমিত ছিল। এ ছাড়া ভারত থেকে ফেরত আসা প্রায় এক কোটি এবং পারিবারিক অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশে থাকা আরো অসংখ্য সহায়-সম্বলহীন মানুষ খাবার জন্য ত্রাণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ দেশে ফিরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হয়ে হাল ধরলেন শক্ত হাতে এই টালমাটাল অবস্থা থেকে দেশকে উদ্ধার করে এগিয়ে নেওয়ার পথ রচনা করতে। তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ে পেয়েছিলেন। এরই মধ্যে তিনি দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে একটি ভিত তৈরি করতে সমর্থ হন। ১৯৭৪ সালে অতিবৃষ্টি ও উপর্যুপরি বন্যা ও উদ্ভূত যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা এবং কিছু মুনাফালোভী মানুষের খাদ্য মজুদদারির কারণে দেশের একাংশে যে দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হয়, তা দ্রুত কাটিয়ে উঠে তিনি দেশের অগ্রযাত্রার পথ রচনায় ১৯৭৪-এর শেষের দিকে আবার মনোযোগ দেন।

তিনি ১৯৭৫-এর প্রথম দিকে সমবায়ভিত্তিক দেশ গড়া ও দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যেই সেই পথ অনুসরণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ সকলকে ন্যায়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এগিয়ে চলার কথা বলেন, যাতে দেশের মানুষ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী শোষণহীন, বৈষম্যহীন সমাজে সকল মানবাধিকার ভোগ করে মানব-মর্যাদায় বসবাস করতে পারে। প্রতিটি গ্রামে একটি সমবায় হবে। কারো জমি বা অন্য কোনো সম্পদ কেড়ে নেওয়া হবে না; তবে গ্রামের সবাই মিলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। জমি বা অন্যান্য সম্পদের মালিকরা উৎপাদনের/আয়ের ন্যায্য অংশ পাবেন। সমবায় একটি অংশ পাবে তা থেকে যাঁরা শ্রম দেন তাঁদের অংশ পাবেন এবং একটি অংশ সরকারি কোষাগারে যাবে। প্রতিটি গ্রাম-সমবায়ের আওতায় একটি গ্রাম উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হবে। এই তহবিলে কিছু অর্থ আসবে সমবায় থেকে আর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে সরকারের বাজেট থেকে। এটা খুবই অগ্রসর চিন্তা ছিল–সেই প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তি সহযাত্রী হতো এবং দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক দেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করার সম্পদ সরকারের কাছে সরাসরি আসত।

বর্তমানে বাজার অর্থনৈতিকব্যবস্থার বৈষম্য বাড়ছে। করের মাধ্যমে, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে অর্থ খুবই কম আসে সরকারের কাছে। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর মিলে কর-জাতীয় উৎপাদন অনুপাত ৯ শতাংশের কম। পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালে তা ১৮ শতাংশের অধিক। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার পর স্বার্থান্বেষীরা দেখে যে যদি বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবিত উন্নয়ন ধারা প্রবর্তিত হয় তাহলে যেন তিন প্রকারে তাদের নিজেদের সম্পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্ভব হবে না। আমার ধারণা, এই ধান্ধাবাজরাও দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে মিলে বঙ্গবন্ধুকে দ্রুত সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করে এবং সফল হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যার পর দেশের অর্থনীতি ভিন্ন পথে ধাবিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদের পথে দেশ হাঁটতে শুর করে। ১৯৮০-এর দশকে অগ্রগতি হয় সামান্যই। ১৯৯০-এর দশকেও উন্নয়ন গতি পায়নি। তবে ওই দশকের দ্বিতীয় ভাগে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা হচ্ছে কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়া। তখনো দেশ উঁচু মাত্রার সহায়তানির্ভর এবং সহায়তা দানকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ ঘোর আপত্তি জানায় এই ভুর্তকির ব্যাপারে, কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে শেখ হাসিনার সরকার কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভুর্তকি দেয়, ফলে ২০০০ সাল নাগাদ দানাদার খাদ্যে বাংলাদেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যায়।

২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি গড়ে বছরে ৫.৮% ছিল, তবে অগ্রগতি ধারাবাহিক ছিল না। অন্যান্য খাতেও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়নি। বরং যথেষ্ট দোলাচল লক্ষণীয়। রাজস্ব বছর ২০১১ (২০১০-১১) থেকে রাজস্ব বছর ২০১৯, অর্থাৎ করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাব পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সূচকে ধারাবাহিক ও ত্বরান্বিত উন্নতি অর্জিত হয়। প্রথম পাঁচ বছর প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের অধিক, পরের তিন বছর ৭ শতাংশের অধিক এবং ২০১৯ সালে ৮.২ শতাংশ ছিল। পৃথিবীর খুব বেশি দেশে উল্লিখিত সময়ে এ রকম ধারাবাহিক অর্জন ঘটেনি। পাশাপাশি রেমিট্যান্সপ্রাপ্তি দ্রুত বাড়তে থাকে। ২০১৮-১৯ সালে ৯.৬ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০১৯-২০ সালে ১৮.২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। ফলে মাথাপিছু আয়ও দ্রুত বাড়ে এবং ২০১৯ সালে ১৯০৯ ডলারের উন্নীত হয়। তা ছাড়া রপ্তানিও বিশেষ করে তৈরি পোশাক উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে। ফলে (অর্থাৎ রেমিট্যান্স ও রপ্তানি দ্রুত বাড়ায়) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও দ্রুত বাড়তে থাকে (ডিসেম্বর ২০১০-এ ছিল ১২ দশমিক ৭ বিলিয়ন, ডিসেম্বর ২০১৯-এ ৪৩.২, এবং নভেম্বর ২০২১-এ ৪১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার)। সামাজিক সূচকের দিকে তাকালে দেখা যায়, জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু ৭৩ বছরে উন্নীত হয়েছে (১৯৭২ সালে ছিল ৪৬ বছর), মাতৃমৃত্যুর হার, শিশুমৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে এগিয়ে আছে। শিক্ষার হার ২০১৯-এ উন্নীত হয় ৭৪ শতাংশে (২০০৭ সালে ছিল ৪৭ শতাংশ)। শিক্ষা অবকাঠামো, বিশেষ করে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (প্রথামিক, মাধ্যমিক,

কলেজ) সারা দেশে ব্যাপকভাবে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির হার প্রায় শতভাগে পৌঁছেছে। ঝরে পড়ার হারও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক–উভয় পর্যায়েই উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে, অর্থাৎ কৃষি ও অকৃষি–উভয় খাতেই দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। উভয় খাতেই সরকারি সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষি খাতে ভর্তুকি ও কৃষিঋণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়। দারিদ্র্যের হার ২০১৯ সালে নেমে আসে ২০.৫ শতাংশে (২০০৫ সালে ছিল ৪০ শতাংশ) এবং অতিদারিদ্র্যের হার প্রায় ১১ শতাংশে। কৃষি উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য, বয়স্ক ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং অন্যান্য দারিদ্র্য নিরসন কর্মকাণ্ড। ২০১৯-২০-এ জাতীয় উৎপাদনের ২ দশমিক ৬ শতাংশ এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে।

একটি প্রশ্ন প্রায়ই স্বাভাবিকভাবে করা হয়ে থাকে, এটা সম্ভব হলো কেমন করে? আমার উত্তর হচ্ছে, এটা সম্ভব হয়েছে মূলত দুটি কারণে। একটি হচ্ছে অনুকূল সরকারি নীতিকাঠামো ও সহযোগিতা, অপরটি হলো সেই পারিপার্শ্বিকতায় সকল পর্যায়ের মানুষের শ্রম। তাদের মধ্যে আছেন কৃষক, কৃষি শ্রমিক, অন্যান্য শ্রমিক, অতি ক্ষুদ্র থেকে বড় উদ্যোক্তা, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গসহ সংশ্লিষ্ট অন্য সকল মানুষ।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সচেতনভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা, করণীয় নির্ধারণ, প্রকল্প ধারণা, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন সম্বন্ধে দিকনির্দেশনা রয়েছে। গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ (যে কারণে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে) দ্রুত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে কমিয়ে আনতে উন্নত বিশ্ব এবং দ্রুত শিল্পায়নরত উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর এবং স্বল্প আয়ের দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নত দেশগুলোর ওপর চাপ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। আবার নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থায়নে এবং ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে অভিযোজন (অভিঘাত মোকাবেলায়) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কাজেই বৈদেশিক সহায়তা জরুরি, কিন্তু তা এখনো পাওয়া গেছে সামান্যই। তবে বাংলাদেশের অভিযোজন কার্যক্রম সর্বত্র প্রশংসিত, কিন্তু শেষ বিচারে উন্নত বিশ্ব যদি প্রয়োজনানুসারে দ্রুত ও পর্যাপ্ত গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ যদি না কমায় অবস্থার দ্রুত এবং ব্যাপক অবনতি হবে, যা সামাল দেওয়া উন্নয়নশীল বা উন্নত কোনো দেশের পক্ষে, এমনকি সব দেশ একসঙ্গে এগিয়ে এলেও কার্যকরভাবে সম্ভব না হতে পারে। আর বাংলাদেশের অবস্থা এমনিতেই খুব নাজুক। এ কথাগুলো বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোরালোভাবে তুলে ধরে আসছেন অনেক দিন ধরে। সর্বশেষ গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কপ-২৬-এও তিনি তা করেছেন।

করোনা মহামারিপূর্ব সময়ে বাংলাদেশের বিশ্বনন্দিত অর্জনের সংক্ষিপ্ত কিছু দিক ওপরে তুলে ধরেছি। জলবায়ু পরিবর্তনের কথাও বলেছি, যা আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত করছে সে কথা এবং সমাধানের প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেছি। এখন আসি অন্যান্য চ্যালেঞ্জের কথায়। এ ক্ষেত্রে প্রথমে করোনা মহামারির কথা বলতে চাই। এই মহামারি ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে সময় সময় বিভিন্ন মাত্রায় বাংলাদেশের ওপর আঘাত হেনে চলেছে। তবে সব দেশের মতো বাংলাদেশ শুরুতে হোঁচট খেলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এই মহামারি জীবন রক্ষা ও জীবিকা নিশ্চিতকরণ–উভয় দিক থেকে মোকাবেলা করছে। জীবন রক্ষা, অর্থাৎ করোনা পরীক্ষা, আক্রান্তদের চিকিৎসাদান, টিকা সংগ্রহ করে টিকা দেওয়ার ব্যাপক ব্যবস্থাকরণ, মানুষকে করোনা আক্রান্ত না হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার দিক এবং যে অসংখ্য মানুষ জীবিকা সংকটে পড়েছে তাদের সেই সংকট উত্তরণে সহায়তা (খাদ্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে) দান এবং উদ্যোক্তাদের উৎপাদন বা সেবাদান অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্রদান উল্লেখযোগ্য সফলতার সঙ্গে করে চলেছে। তাই সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আর্থ-সামাজিকভাবে বিধ্বস্ত সকলকে সহায়তা দানে সরকারের সাথে যুক্ত হয়েছে সমর্থ অনেক মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান। ফলে তেমন কোনো হাহাকার সৃষ্টি হয়নি।

করোনাকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ঈর্ষণীয়। ২০২০ ও ২০২১ রাজস্ব সালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক ছিল। যে স্বল্পসংখ্যক দেশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ সেগুলোর মধ্যে একটি। শুধু তা-ই নয়, যে কয়েকটি দেশ এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো করেছে এবং ৫ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ সেই দেশগুলোর অন্যতম। পাশাপাশি রেমিট্যান্স বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। তাই মাথাপিছু আয় ২০২১ সালের শেষের দিকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৫৫৪ ডলারে। এ বছর প্রবৃদ্ধি আরো বেশি হবে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। কেননা অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। আবার যদি মহামারির মাত্রা খুব বেশি না বাড়ে, বাংলাদেশ দ্রুতই সংকট কাটিয়ে ত্বরান্বিত উন্নয়ন ধারায় ফিরে আসবে। তবে যারা পিছিয়ে পড়েছে, বিশেষ করে অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী এবং দারিদ্র্যের চাপ যাদের ওপর বেড়েছে তাদের দিকে এই পুনরুদ্ধার ও পুনর্জাগরণের প্রক্রিয়ায় অধিকতর জোর দিতে হবে। অন্যথায় দেশে বৈষম্য আরো বেড়ে যাবে, ফলে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা এ পর্যন্ত তেমন কোনো প্রণোদনা পাননি। এ ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

করোনা মহামারি ছাড়াও কয়েকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা চিহ্নিত করা আছে। অনেকটি আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা আছে। এগুলোর সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি, বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন

বাস্তবায়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে হলে। উক্ত ইশতেহারে চিহ্নিত কয়েকটি সমস্যা নিম্নরূপ :

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হবে; প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও সাহায্য-সহযোগিতা লাভের সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা হবে; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা হবে; সর্বজনীন মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার এবং মানবধিকার লঙ্ঘনের যেকোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করার সুব্যবস্থা করা হবে; দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়পরায়ণ, জনগণের সেবায় নিয়োজিত ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিকব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে; স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের (যথা : জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ) মধ্যে দায়িত্ব বিভাজন সুনির্দিষ্ট করা হবে এবং এগুলোকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল ও অর্থায়ন নিশ্চিত করে যথাযথভাবে কার্যকর করে তোলা হবে; একটি জনবান্ধব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে হাতে নেওয়া কাজ অব্যাহত থাকবে; দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা ঘোষণা করা হয়েছে; ঘুষ, অনুপার্জিত আয়, কালো টাকা, চাঁদাবাজি, ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজি, পেশিশক্তি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার ভিত্তিতে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা হবে; এবং বৈষম্য দূরীকরণে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি জোরদার করা হবে এবং অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। এই সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। সমস্যা চিহ্নিতকরণ তা সমাধান করার প্রধান পূর্বশর্ত।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে–এই প্রত্যয় ব্যক্ত করতে চাই। আমি ভরসা করতে চাই যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চিহ্নিত ও নতুনভাবে সৃষ্ট সমস্যাসমূহের সমাধান করে এবং ইতিবাচক দিকগুলোকে সুসংহত ও ত্বরান্বিত করে আমরা দৃপ্তপদে এগিয়ে চলব–২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা, ২০৩১ নাগাদ দেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে।

লেখক : স্বাধীনতা পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এ এস এম সামছুল আরেফিন

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ ঘটেছিল, এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলার মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায় যে এক ও অভিন্ন জাতি, এ কথা পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই বাঙালি মুসলমানরা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বিখ্যাত উক্তি 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি'। এই ঐতিহাসিক উক্তির মধ্যে নিহিত ছিল আমাদের বাঙালি জাতিসত্তার মর্মবাণী। এই জাতিসত্তা ছিল অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ। আন্দোলন-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর নিরলস নেতৃত্ব ও পরিশ্রম বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধান সহায়ক ছিল। দীর্ঘ এই যাত্রাপথে পাকিস্তান সরকারের জেল-জুলুম-অত্যাচার কোনো কিছুই বঙ্গবন্ধুকে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে দূরে সরাতে পারেনি। ২৬ শে মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নামের এক জাতিরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বঙ্গবন্ধুর জন্ম। পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা সায়েরা খাতুন। চার বোন এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন তৃতীয় সন্তান। ডাকনাম ছিল খোকা। স্থানীয় মিশনারি স্কুলে পড়ালেখা শেষে গোপালগঞ্জ হাইস্কুলে পড়াকালীন তিনি অধিকার আদায়ের দাবিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৩৯ সালে স্থানীয় এক ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ ও নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। এই সময় তাঁকে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪২ সালে এন্ট্রান্স পাস করে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় শেখ মুজিব বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সদস্য হন এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। কলেজছাত্রদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের আন্দোলনে সম্মুখভাগে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে তিনি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। ১৯৪৩ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কাউন্সিলর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ

সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কলকাতাস্থ 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক মনোনীত হন। নিজ জেলা ফরিদপুর এবং কলকাতার বিভিন্ন সংগঠনে বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রসংসদের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে বিএ পাস করে তিনি গোপালগঞ্জে ফিরে আসেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭-এ বেগম ফজিলাতুন্নেছা ও শেখ মুজিবের প্রথম কন্যা শেখ হাসিনা (বর্তমানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছর বঙ্গবন্ধুর জন্য কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষটি বরাদ্দ ছিল। (বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ভারত সরকারের সহযোগিতায় এই ২৪ নম্বর কক্ষটির সাথে ২৩ নম্বর কক্ষটি সংযোজন করে বর্তমানে এই কক্ষ দুটি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সংরক্ষিত। তৎকালীন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ২৭ জানুয়ারি কক্ষটি উদ্বোধন করেন)।

১৯৪৭ সালে ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক যুবলীগে যোগদান করেন এবং সংগঠনের অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হলে তিনি এই সংগঠনের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। পাকিস্তান সরকারের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ও মাতৃভাষা বাংলা করার দাবির আন্দোলনে এ বছরের ১১ মার্চ তিনি গ্রেপ্তার এবং জেলে প্রেরিত হন। স্বাধীন দেশে শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন। ফরিদপুরে কর্ডনপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮-এ পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আন্দোলনে তিনি গ্রেপ্তার এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। ইতি হয় বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের।

১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনের এক সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে জেলে থাকা অবস্থায় তিনি দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জেলে থাকার সময় ভাষা আন্দোলনের দাবির পক্ষে তিনি সোচ্চার ছিলেন। জুলাই মাসের শেষের দিকে তিনি জেল থেকে মুক্ত হয়ে দেশব্যাপী খাদ্যসংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অপরাধে ১৪ অক্টোবর ১৯৫১-এ তিনি গ্রেপ্তার হলে ৫ মাস কারাভোগ শেষে ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-এ তিনি ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে তাঁর পিকিংয়ে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৩ সালের ৯ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্মেলনে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এ বছরের ১৪ জুলাই দলের বিশেষ

কাউন্সিলে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে ২১ দফা দাবি গৃহীত হলে এই ২১ দফা দাবি জাতীয় নির্বাচনে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। ১৫ মে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা চক্রান্তে পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রাদেশিক সরকার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ৩০ মে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুটমিলে দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-ক ধারা বলে পূর্ব পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকার বাতিল ঘোষিত হয়।

এই সময় শেখ মুজিব করাচি থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের সময় বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার হন এবং ২৩ ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গণপরিষদের নির্বাচনে ৫ জুন শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান থেকে সদস্য নির্বাচিত হন। ৮০ সদস্যের এই গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ জন সদস্য নির্বাচিত ছিলেন। শেখ মুজিব এই গণপরিষদে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী উপস্থাপন করেন। ১৭ জুন ১৯৫৫-তে ঢাকার পল্টনের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে ২১ দফা দাবি ঘোষিত হয়। শেখ মুজিব স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রে 'পূর্ব বাংলার' নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' করার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টায় সচেষ্ট হন। কিন্তু ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ রচিত পাকিস্তানের এই শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ–এই চারটি প্রদেশকে এক ইউনিটে পরিবর্তন করে 'পশ্চিম পাকিস্তান' নামকরণ করা হয়। এই ২৩ মার্চ পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র দিবস হিসেবে স্বীকৃত। তবে এই সংবিধান বেশিদিন কার্যকরী হয়নি। ১৯৫৬ সালে পুনরায় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে ১৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন এবং ভিলেজ এইড দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৫৬ সালের দলীয় কাগমারী সম্মেলনে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ'-এ পরিবর্তন এবং শেখ মুজিবকে পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। দলকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ৩০ মে দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। একই বছর ৭ আগস্ট থেকে তিনি সরকারিভাবে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন।

১৯৬১ সালে শেখ মুজিব সামরিক শাসন ও আইয়ুব সরকারবিরোধী আন্দোলন গঠনে তৎপরতা শুরু করেন। এই সময় শেখ মুজিবের নির্দেশে দুটি গোপন ছাত্রসংগঠন, যার একটি শেখ মণির নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট' (বিএলএফ) এবং অন্যটি সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠিত হয়। জনাব আব্দুর রাজ্জাক উভয় সংগঠনে শেখ মুজিবের সমন্বয়কারী

ছিলেন। 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট' একটি সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতিতে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় গোপন কার্যক্রম শুরু করে। এই সময় শেখ মুজিব সশস্ত্র বিপ্লবে সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতসহ কয়েকটি দেশে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ এবং নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যোগাযোগ শুরু করেছিলেন। 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট' মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রথমে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' নামে এবং পরবর্তীতে 'মুজিব বাহিনী' নামে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' জনমত গঠনের কার্যক্রমে বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনে বিভক্ত হয় এবং 'নিউক্লিয়াস' নামে পরিচিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই সকল সংগঠন মুজিব বাহিনীর সাংগঠনিক নেতৃত্বে সমন্বিত হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়কালে অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার বিষয়টি জনগণের উপলব্ধিতে আসে। ১৭ দিনের এই যুদ্ধে সকল স্তরের মানুষ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের পরবর্তীতে দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ সকল স্তরের মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার দাবিতে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলে। এই সময় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আপত্তিকর বক্তব্যের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের এবং এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। হাইকোর্টে রিটের মাধ্যমে তিনি ঢাকা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬৬ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিতে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং এই ছয় দফা দাবি পরবর্তীতে 'জাতীয় মুক্তি সনদ' হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলে ২৩ মার্চ এই ছয় দফা দাবি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালের ৯ মে ডিফেন্স রুল অব পাকিস্তান (ডিপিআর) আইনে শেখ মুজিবকে আটক করা হয়। ডিপিআর আইনে গ্রেপ্তারকৃতদের জামিনের কোনো বিধান না থাকায় কোনো আদালত তাঁকে জামিন দেননি। পাকিস্তান সরকার ৩ জুন ১৯৬৮ ইং শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে। 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য অভিযুক্ত' এই মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে আলোচিত বা পরিচিত। ১৯ জুন ১৯৬৮ ইং সকাল ১১টায় কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ঢাকা সেনানিবাসে এক বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই মামলার বিচারকার্য শুরু হয়েছিল। বিচার চলাকালীন অবস্থায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ইং তৃতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ইউনিট লাইনের বন্দিশালার কাছে ফ্লাইট সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক পাকিস্তানি গার্ড কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হন। সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত এবং সার্জেন্ট ফজলুল হক আহত হন। এই হত্যার প্রতিবাদে ১৬ ফেব্রুয়ারি সকল শ্রেণির মানুষ রাজপথে নেমে আসে এবং সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃতদেহ নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা স্পেশাল

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জাস্টিস এস এ রহমানের বাংলা একাডেমি ক্যাম্পাসে অবস্থিত বর্ধমান হাউসের বাসভবনে আক্রমণ চালায়। জাস্টিস এস এ রহমান নাইট ড্রেস পরা অবস্থায় পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে লাহোরগামী বিমানে ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি আর ফিরে আসেননি। দুর্বার গণ-আন্দোলনের চাপে পাকিস্তান সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। রায়বিহীন অবস্থায় এই ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার সমাপ্তি ঘটে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ইং কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আয়োজনে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন।

স্বাধীনতাসংগ্রামের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বঙ্গবন্ধুকে সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, দেশের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দল ও সংগঠন, শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী, স্বাধীনতাকামী জনগণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগীবৃন্দ। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন এবং '৬৬ সালের ছয় দফা আদায়ের আন্দোলনের পথ ধরে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের দাবিতে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় বঙ্গবন্ধুকে সর্বময় ক্ষমতার চূড়ান্তে অধিষ্ঠিত করে। ৭ই মার্চ ১৯৭১ ইং ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু তাঁর চূড়ান্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। এই নির্দেশনায় ছিল–এক, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো; দুই, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি; তিন, আর যদি একটি গুলি চলে...। তাঁর এই নির্দেশনা বাস্তবে রূপ নিয়েছিল। গ্রামে-মহল্লায় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। রাতের আঁধারে শুরু হয় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ।

২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ ইং মধ্যরাতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর এক হীন ষড়যন্ত্রে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের ওপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলার রাজপথ। ২৬ শে মার্চ ১৯৭১-এর প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে। পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি জেলে বন্দি অবস্থায় সামরিক বাহিনীর বিচারে তিনি ফাঁসির আদেশে দণ্ডিত হন।

১০ এপ্রিল ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মুক্তাঞ্চলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শতাধিক আন্তর্জাতিক সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি), তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, মোহাম্মদ মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান ও খন্দকার মোশতাক আহমেদকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নামানুসারে শপথ গ্রহণের এই স্থানের নামকরণ করা হয় 'মুজিবনগর'

(বর্তমানে এটি মুজিবনগর উপজেলা) এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার 'মুজিবনগর সরকার' হিসেবে পরিচিত হয়।

দীর্ঘ ৯ মাসব্যাপী যুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। ২২ ডিসেম্বর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন অপেক্ষা ছিল বঙ্গবন্ধুর। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ ইং বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনে আসেন। ব্রিটিশ সরকার যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাতে কার্পণ্য করেনি। ১০ই জানুয়ারি স্বদেশের পথে ভারতের দিল্লি বিমানবন্দরে ছিল বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক যাত্রাবিরতি। ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভিভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উভয়েই বঙ্গবন্ধুকে বিমানবন্দরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বাগত জানিয়েছিলেন। এটি ছিল ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশের নবযাত্রা। বিধ্বস্ত অর্থব্যবস্থা, প্রশাসনিক ও যোগাযোগব্যবস্থা পুনর্নির্মাণে বঙ্গবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রম বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে পরিচিত করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পৃথিবীতে আজ বাংলাদেশ একটি সফল রাষ্ট্র।

আজ জাতি স্বাধীনতার ৫০ বছর এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে ব্যস্ত। উৎসবমুখর পরিবেশে দেশে-বিদেশে আজ বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারিত। পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর নামে চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে নামকরণ করা হয়েছে অনেক জনপদের। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' আজ একটি সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। সফল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বে এবং রাষ্ট্র দর্শনে বঙ্গবন্ধুর নাম আজ পৃথিবীতে সমুজ্জ্বল।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ ও প্রেক্ষাপট

কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (বীরপ্রতীক)

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দূরদর্শী রাজনীতিক, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি এবং বিশ্বের সর্বহারা, নির্যাতিত-নিপীড়িত, মেহনতি ও অভুক্ত মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। যাঁরা সর্বহারা, নির্যাতিত ও অভুক্ত তাদের ভবিষ্যতের চিন্তাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। মেহনতি মানুষ মাত্রই ছিল তাঁর আপনজন।

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা। আবহমান বাংলার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ যে সকল স্মরণীয় ব্যক্তি বিস্মৃতির উত্তাল তমসাকে বিদীর্ণ করে আপন কীর্তির মহিমায় দ্যুতিমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের অন্যতম। অন্ধকার, পরাধীনতা, শাসন, শোষণ আর বঞ্চনার শৃঙ্খল ছিন্ন করে তিনি বাঙালি জাতিকে মুক্তির পথের সঠিক সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর আপসহীন সংগ্রাম ও সাহস দেশ, মাটি ও মানুষের জন্য নিখাদ ভালোবাসা আর নেতৃত্বের কারণেই আজ আমরা স্বাধীন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকেই বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত ছিল। সেই সময় থেকেই গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি জনসমক্ষে বহু ভাষণ প্রদান করেছেন। সেই ভাষণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণটি। এই ভাষণই ছিল বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের শোষণ, বঞ্চনা আর অবহেলা থেকে মুক্তির ধারাবাহিক আন্দোলনের চূড়ান্ত নির্দেশনা। ইতিপূর্বে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর ও ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের উভয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে শপথ গ্রহণ করার আগে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলের সদস্যরা সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি পাকিস্তানি সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানকে অনতিবিলম্বে পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকার দাবি করে জানান, অধিবেশন হতে হবে ঢাকায়। ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও জনগণের প্রতি অনুগত থাকার শপথ গ্রহণ করেন সংসদ সদস্যরা। তারপর ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানে গমনের প্রাক্কালে

ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের জানান যে শেখ মুজিবুর রহমান শিগগিরই পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। জাতীয় সংসদ অধিবেশনের বিষয়ে তিনি বলেন যে সংসদ অধিবেশনের তারিখ এখনো ঠিক হয়নি, তবে শিগগিরই অধিবেশন আহ্বান করা হবে এবং এ জন্য প্রয়োজনে তিনি আবার ঢাকা আসতে পারেন। এটি ছিল দুরভিসন্ধিমূলক একটি বক্তব্য।

১৬ জানুয়ারি ইয়াহিয়া খান তাঁর সামরিক ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে করাচিতে এক গোপন আলোচনায় মিলিত হন এবং সেদিনই গণমাধ্যমকে জানানো হয় যে পেসিডেন্ট পাখি শিকার করতে পরদিন করাচি ত্যাগ করবেন। ১৭ জানুয়ারি পাখি শিকারের নামে তিনটি হেলিকপ্টারে করে বিশাল দলটি জুলফিকার আলী ভুট্টোর লারকানার প্রাসাদের বাগানে অবতরণ করে। সেই রাতে তারা পাখি শিকার করার পরিকল্পনা করেনি, কিন্তু বাঙালি শিকারের পরিকল্পনা করে। এই আলোচনাই 'লারকানা ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত। এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্যই সামনের দিনগুলোতে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের নিয়োজিত রাখে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা কখনোই বাঙালির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ সৈন্য বাংলায় পাঠাবে। এই সময়টায় তারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখে যেন তাদের আসল পরিকল্পনা জনসমক্ষে প্রকাশ না পায়। এই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান সরকার একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করে। তারা বিমানবাহিনীর বিমান, পিআইএর কিছু বিমান ও হল্যান্ড থেকে ভাড়া করা কিছু বিমান এবং কয়েকটা বিশাল আকারের জাহাজ (যেমন : এমভি সোয়াত, এমভি এনডিওরেন্স) দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত সৈন্য পাঠাতে থাকে। এদিকে তারা নিষ্ফল আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে যেন জনগণের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য প্রচার না হয়। বেলুচিস্তানের কসাই পাঞ্জাবি লে. জেনারেল টিক্কা খানকে ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক হিসেবে লে. জেনারেল ইয়াকুবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিশাল সৈন্য সমাবেশ, ইয়াহিয়ার ১ মার্চে পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত করা ইত্যাদি তথ্য জানতে পারেন বঙ্গবন্ধু। তাই তিনি ১ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন ও হরতালের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি তখন বাঙালি জাতিকে একত্র করে ভবিষ্যতের সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ প্রদান করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ৭ই মার্চ জনসমুদ্রে পরিণত হলো রেসকোর্স ময়দান। বিপদের সময় মানুষ সাহসী ও চরিত্রবান নেতৃত্বের নির্দেশনার আশ্রয় খোঁজে। এ জন্যই গোটা জাতি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল তাঁর ভাষণ শোনার জন্য। বিকেল সাড়ে ৩টায় রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর এই

ভাষণ এক অনন্যসাধারণ ভাষণ হিসেবে বিবেচিত। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল অলিখিত ভাষণ। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করতেন, তা-ই তিনি সেদিন বলেছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে দেশকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলনের ডাক দেন তথা পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, '...আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।...' তিনি তাঁর ভাষণে দেশকে মুক্ত করতে স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বাঙালি জাতির প্রতি আহ্বান জানান এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। এটাই ছিল তাঁর স্বাধীনতার ডাক। তাঁর এই ভাষণ দেশবাসীকে প্রগাঢ় বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধু শুধু তাঁর সামনে উপবিষ্ট ১০ লক্ষ মানুষের মাধ্যমে বাংলাদেশের আরো সাড়ে সাত কোটি অধিকারবঞ্চিত মানুষের উদ্দেশে এই ভাষণ দেননি, বিশ্বের শতকোটি অত্যাচারিত ও শোষিত মানুষকে তিনি এই ভাষণ দ্বারা স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে সেদিন বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। আগুন ঝরে পড়ল তাঁর কণ্ঠ থেকে। কোনো ভাষাবিদ বা ভাষাতাত্ত্বিক না হয়েও বঙ্গবন্ধু তাঁর সেদিনের বক্তব্যের গভীরতা, স্পষ্টতা ও বাচনভঙ্গির জন্য তিনি স্মরণীয়। এই ভাষণের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, ব্যাংকসহ প্রশাসন একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মতো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে লাগল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা ও ডাক। জাতির অস্তিত্বের লড়াইয়ে জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে অসম যুদ্ধে তিনি সেদিন অবতীর্ণ হয়েছিলেন জনগণের একজন হিসেবে। এই ভাষণের দিকনির্দেশনায় জাতি সেদিন থেকেই যুদ্ধপথে চলে গিয়েছিল। তাঁর ভাষণে তিনি বাংলার মানুষের সংগ্রাম ও বঞ্চনার কথা সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসন থেকে বাঙালির মুক্তির একমাত্র পথ হলো স্বাধীনতা, আর এই কথাটি তিনি তাঁর ভাষণের মাধ্যমে অত্যন্ত কৌশলে শ্রোতাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন। তাঁর ভাষণের প্রতিটি কথা মানুষের মনে গভীর দাগ কাটে। এই ভাষণটি বিশ্বের নিপীড়িত ও অধিকারবঞ্চিত মানুষকে যুগে যুগে অধিকার আদায় ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। এই কারণেই তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণটি বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে (Memory of the World International Register) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে অনেকে বিশ্বের মহান নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের 'গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস', মার্টিন লুথার কিংয়ের 'I have a Dream', প্যাট্রিক হেনরির 'Give me liberty or give me death', ইত্যাদি ভাষণের সাথে তুলনা করেন। তবে তাঁদেরকে বঙ্গবন্ধুর মতো সাড়ে সাত কোটি মানুষের আকাশছোঁয়া আশা-আকাঙ্ক্ষার চাপ ও সামরিক সরকারের অস্ত্রের মুখে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে হয়নি। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের মাধ্যমে নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তর করেছিলেন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর ওপর জনগণের প্রত্যাশা ও চাপ ছিল সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করার। জাতি অপেক্ষায় ছিল—তিনি কি আজই স্বাধীনতার ডাক দেবেন! বিশ্ববাসীও সেদিন উৎকণ্ঠিত ছিল। তারা বুঝতে পারছিল বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সাথে আর কোনো আপস করবেন না, তিনি বাঙালি জাতিকে এত দিন স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, এবার সেই লক্ষ্য পূরণের দিকেই তিনি অগ্রসর হবেন। কিন্তু অত্যন্ত কৌশলী বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা না করে কৌশলে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ডাক দিলেও পাশাপাশি তিনি পাকিস্তানি সামরিক সরকারের সাথে আলোচনার পথও খোলা রাখলেন। তিনি জানতেন, ঢাকায় অদূরবর্তী সেনানিবাসে পাকিস্তানিদের এক ব্রিগেড সৈন্য (১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ২২ বালুচ রেজিমেন্ট, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, চারটি সাঁজোয়া ট্যাংক), ১৬টি যুদ্ধবিমান ও ১৮টি সশস্ত্র হেলিকপ্টার সেদিন প্রস্তুত ছিল আক্রমণের জন্য। সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে এই বিশাল বাহিনী লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর আক্রমণ রচনা করত। তা ছাড়া পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দ্বারা সভাস্থলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কাও ছিল। তিনি বুঝতেন যে জনশক্তি যেকোনো মারণাস্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী। পাকিস্তানিদের নির্মমতা, ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর অনিবার্য অভিযানের তথ্য ও বাঙালির অভ্যুদয় ঠেকাতে পাকিস্তানিদের অসীম তৎপরতার মাঝেও তিনি আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। অত্যাচারী জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ প্রদান করেন। কী অসাধারণ দেশপ্রেম থাকলে জীবনের পরোয়া না করে শত্রু পরিবেষ্টিত পরিবেশে নির্ভয়ে এমন বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়! অস্তিত্বের লড়াইয়ে তিনি জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এই ভাষণ প্রদান করেন। মহান নেতা জনগণের হৃদয়ে নিজেকে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠা করেন। অধিকারবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন স্বাধীনতার এই সিংহপুরুষ এবং এর মাধ্যমেই নতুন আশা সঞ্চারিত হলো। তাঁর ছিল কল্পনাশক্তি, প্রেরণাশক্তি আর অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা না করেও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। সেদিন তাঁর সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। হয় সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা অথবা পাকিস্তান ভাঙার দায়িত্ব কাঁধে না নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত না হয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য প্রদান করা। পাকিস্তানি সামরিক সরকার তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী

হিসেবে আখ্যায়িত করার পথ খুঁজছিল, কিন্তু এই বিষয়ে তিনি সতর্ক ছিলেন বলে তাদের এমন কোনো সুযোগই দেননি। তিনি যে একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ নেতা ছিলেন তাঁর ভাষণের মাধ্যমে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। ১,১০৮ শব্দসংবলিত ১৮ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের এই ভাষণের সাথে সাথেই কালজয়ী চেতনার মাধ্যমে ৭ই মার্চ বাঙালি জাতি যুদ্ধের পথে চলে যায়। ৭ই মার্চ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য অন্তিম মুহূর্ত, বঙ্গবন্ধুর জীবনের নতুন দিগন্ত ও শ্রেষ্ঠ সময় আর বাঙালি জাতির জন্য স্বাধীনতার সিদ্ধান্তের মুহূর্ত। জাতি তাঁর নির্দেশে পথ চলা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে দীর্ঘ ২৩ বছরের অত্যাচার, অবিচার ও নিপীড়নের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সেদিন তিনি ছিলেন দুরন্ত সময়ের এক জীবন্ত চলচ্চিত্র। ৭ই মার্চের ভাষণের পর বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাঙালিরা যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। এই প্রস্তুতির পেছনে ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালির আন্দোলন এবং নির্বাচনে বিজয়ের পরও ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসির বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইতিহাসবিদ ও গবেষকরা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি বিষয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে সবাই অভিন্ন মত প্রকাশ করবেন ও স্বীকার করবেন যে, এটাই ছিল স্বাধীনতার ডাক এবং এই ভাষণই প্রমাণ করেছিল বঙ্গবন্ধু একজন কুশলী রাষ্ট্রনায়ক। ঐতিহাসিক রমনা রেসকোর্স ময়দান সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের রায়ে উল্লেখ আছে যে, "প্রতীয়মান হয় ৭ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু 'স্বাধীনতার ডাক' দিয়াছিলেন এবং ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি 'স্বাধীনতার ঘোষণা' প্রদান করিয়াছিলেন।" মূলত ৭ই মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হয়। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৫ শে মার্চ আক্রমণের সাথে সাথেই বাংলার মাটিতে জনযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

ইতিহাসের ঝোড়ো হাওয়া যখন একটি জাতির ভাগ্য অনিবার্যভাবে ভেঙে চুরমার করে দিতে থাকে তখন বাংলার মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বঙ্গবন্ধু সবাইকে আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ নেতা জানতেন যে ভবিষ্যতে বাংলার মানুষের কল্যাণ, সংসারের শান্তি ও জীবনের সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে। তিনি জানতেন, এই মাটিতে নতুন জীবন জন্ম নিচ্ছে, যার জন্য বেদনা হবে প্রচুর, কিন্তু সম্ভাবনা অজস্র। বাংলার মানুষ বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে বিশাল সোনালি ধানক্ষেত সৃষ্টি করেছে এবং এত দূর এগিয়ে আসার পর তারা আর পিছপা হবে না। হাজার বছরের বাঙালি জাতির অসম্পূর্ণ স্বাধীনতার গান সম্পন্ন করলেন তিনি। এই ভাষণে তিনি ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান পার্লামেন্টে প্রদত্ত ভাষণে যে কথা বলেছিলেন 'জুলুম মাত করো ভাই'

সেই কথাই তিনি আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। যতই দিন যাবে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বের নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এই ভাষণ শুনে তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বিশ্বদরবারে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। লন্ডন অবজারভারের সাংবাদিক Cyril Dunn তাই বলেছিলেন : 'Mujib is a full blooded Bengali–his courage and charm that flowed from him made him a unique superman in these times.'

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক।

বাংলাদেশের বিস্ময়কর উত্থান : ২০০৯-২০২০

ড. শামসুল আলম

বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য উত্থান হচ্ছে। সে জাগৃতি অভূতপূর্ব, বিস্ময়কর। বিগত দশকে বাংলাদেশের সাফল্য নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, বোধ হয় কোনো স্বল্পোন্নত দেশ বা উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে এত হয়নি। সম্প্রতি এ বিষয়টি আবার আলোচনায় এসেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ সালে বাংলাদেশ মাথাপিছু জিডিপিতে ভারতকে ছাড়িয়ে যাবে। করোনার কারণে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ভারতের মাথাপিছু জিডিপি ১০.৫ শতাংশ কমে হবে ১৮৭৭ ডলার আর বাংলাদেশের ৪ শতাংশ বেড়ে হবে ১৮৮৮ ডলার। অথচ কয়েক বছর আগেও ভারতের মাথাপিছু আয় ছিল বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি। জিডিপি ২০০৯ সাল হতে এক দশকে অদ্যাবধি বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় তিন গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। হংকং সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশনের প্রক্ষেপণ বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে ২৬ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। আর সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের (সিইবিআর) প্রক্ষেপণ মতে, ২০৩৫ সালেই বাংলাদেশ ২৫ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে। এর আগে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সকল শর্ত পূরণ করায় বৈশ্বিক উন্নয়ন পর্যবেক্ষকদের প্রশংসা লাভ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতে, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। দেশের শক্তিমত্তা ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন সূচক যেমন–শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুমৃত্যুর হার, প্রত্যাশিত গড় আয়ু এবং প্রাথমিকে নিট ভর্তির হারে বাংলাদেশ প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশ এক নতুন আকাশ প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের এই সাফল্যের স্বরূপ ও রূপান্তরের মূল উপাদানগুলোর ওপর আলোকপাত করা যাক।

রূপান্তরের সনদ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব

দিনবদলের সনদ নামক নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে দেশ শাসনের ভার হাতে নেয়। সেই নির্বাচনী ইশতেহারটি পরবর্তীতে রূপকল্প-২০২১ বা ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ২০০৯ সালে যখন সরকার দায়িত্ব নেয়, তখন আর্থ-

সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুব প্রতিকূলে। সন্ত্রাসবাদ, দুর্নীতি, অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা সর্বত্র বিরাজমান ছিল। তদুপরি বিদ্যুতের চরম ঘাটতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও কৃষি খাতে স্থবিরতা ছিল। সেই অবস্থা থেকে দেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা দূর করার জন্য রূপকল্প-২০২১ এবং প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করা হয়। সে সময়ে সরকারের কাছে পাঁচটি প্রাধিকার বিষয় ছিল–অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ওপর নিয়ন্ত্রণ; দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ; তেল, গ্যাস, কয়লা, জ্বালানির অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য; অসমতা দূরীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা। ডিজিটাল বাংলাদেশ চারটি স্তম্ভের ওপর গঠিত–ডিজিটাল দেশ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ, শিল্পের প্রসার ও নাগরিকের সংযুক্তি। ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল দর্শন হলো গণতন্ত্র, জনগণের অধিকার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় ও সাহসী নেতৃত্বের কারণে ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, অতি বাস্তবতা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় সাফল্য

বিগত দশকটা ছিল বাংলাদেশের জন্য স্মরণীয়। অর্জনের ঝুলি অনেক। তবে সব কিছু ছাপিয়ে গেছে এমডিজিতে সাফল্য। ব্যক্তি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেমন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন, তেমনি দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। এমডিজিতে অর্জনের (শিশু মৃত্যুহার কমানো) জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ হতে প্রথম পুরস্কৃত হয় ২০১০ সালে। ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক কমিশন, সাউথ সাউথ নিউজ একত্রে স্বাস্থ্য খাতে অসাধারণ অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে সাউথ সাউথ পুরস্কারে ভূষিত করে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ২০১৩ সালে দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূরীকরণের স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ডিপ্লোমা পুরস্কার প্রদান করে। একই বছর খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দক্ষিণ দক্ষিণ পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৫ সালে তিনি পান আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার। একই বছর জাতিসংঘ পরিবেশ পুরস্কারে ভূষিত হন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ছিল ইউএন উইমেন কর্তৃক প্রদত্ত ২০১৬ সালে প্লানেট ৫০:৫০ চ্যাম্পিয়ন ও পরিবর্তনের এজেন্ট পুরস্কার। তা ছাড়া নারী নেতৃত্বের সাফল্যের কারণে ২০১৮ সালে গোবাল সামিট অব উইমেন প্রদত্ত গোবাল উইমেন লিডারশিপ পুরস্কার ২০১৮ গ্রহণ করেন। ওই বছরেই আইপিএস ইন্টারন্যাশনালের 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ও স্পেশাল ডিস্টিংশন অ্যাওয়ার্ড ফর লিডারশিপ-২০১৮' পান। ২০১৯ সালে গোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশনের 'ভ্যাকসিন হিরো' ও জাতিসংঘের

শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ কর্তৃক চ্যাম্পিয়ন ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ ২০১৯ খেতাবে ভূষিত হন। ২০২০ সালে 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' বিভাগে বাংলাদেশ মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০' লাভ করে। বিগত দশকে পুরস্কারের ঝুড়ি দীর্ঘ। বাংলাদেশের এই অর্জন ২০১৫ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে প্রেরণা জোগাবে।

মধ্যম আয়ের দেশ ও স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হবে। সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের মাইলফলক সামনে রেখে রূপকল্প-২০২১ প্রণীত হয়। এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। বিশ্বব্যাংকের মানদণ্ড অনুযায়ী আয়ভেদে সকল দেশকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–নিম্ন আয়, নিম্ন মধ্যম আয়, উচ্চ মধ্যম আয় ও উচ্চ আয়ের দেশ। বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন আয়ের গণ্ডি পেরিয়ে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের মুকুটে আরো একটি সাফল্যের পালক যুক্ত হয়। অনেকে মধ্যম আয়ের সাথে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ধারণা গুলিয়ে ফেলেন। দুটি দুই ধরনের প্রক্রিয়া ও সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে, একটি বিশ্বব্যাংক শ্রেণীকরণ আরেকটি জাতিসংঘের। বাংলাদেশ ২০১৮ সালে জাতিসংঘের মানদণ্ডে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার সকল প্রাথমিক শর্ত পূরণ করে। শর্তসমূহ হলো–মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকের নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করা বা এর নিচে থাকা। জাতিসংঘের সর্বশেষ যে আপডেট তাতে বাংলাদেশ ২০২১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে উক্ত শর্তসমূহ পূরণ করবে। ফলে ২০২৪ সাল হতে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। মূলত এই দুই সাফল্যের সূত্র ধরেই বাংলাদেশ রূপকল্প-২০৪১ প্রণয়নে আরো আত্মবিশ্বাস পেয়েছে। যার মূল লক্ষ্যই হলো, ২০৩১ সালের মধ্যে দেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া।

আর্থ-সামাজিক সূচকে অগ্রগতি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা যেমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে, তেমনি সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পেরেছে। বিগত দশকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির দিক থেকে চীনের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। নিচের চিত্রে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির দিক থেকে বাংলাদেশ এমনকি ভারতকে পেছনে ফেলেছে।

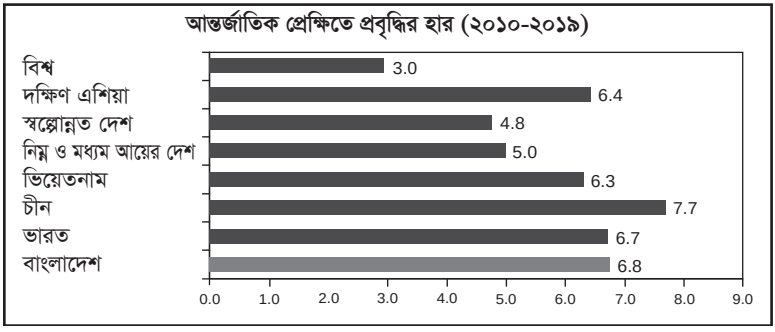

সূত্র : বিশ্বব্যাংক

বাংলাদেশের অর্থনীতির যে অন্যতম মূল নিয়ামক প্রবাসী আয় বিগত দশকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে বৈদেশিক রিজার্ভ প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ভোগ ও বিনিয়োগকে চাঙ্গা রাখছে।

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ২০০৯ সাল হতে পাঁচ গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই বিনিয়োগ সামনে আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। কারণ সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের পরিকল্পনা করেছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আসছে। ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর হতে উদ্যোক্তারা আগ্রহ দেখিয়েছেন। তা ছাড়া মেগাপ্রকল্পগুলো সম্পন্ন হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম শক্তি অভ্যন্তরীণ ভোগ। ১৬ কোটির জনগোষ্ঠীর জন্য বিশাল বাজার রয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ অনুযায়ী, বৈদেশিক বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে জিডিপির ৩ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। রূপকল্প-২০২১-এর একটি লক্ষ্য ছিল, ২০১২ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বাভাবিক বছরে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের বড় একটি অর্জন স্বাধীনতার পর হতে ধানের উৎপাদন সাড়ে তিন গুণের বেশি হওয়া।

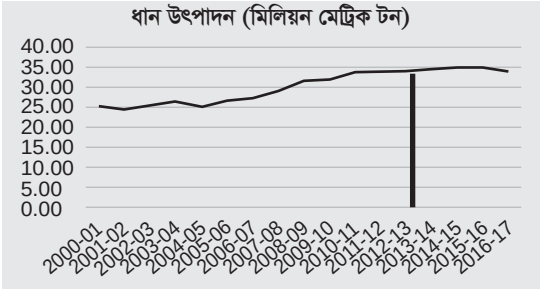

সূত্র : বিবিএস

গত এক দশকে বাংলাদেশের অন্যতম সাফল্য ছিল দারিদ্র্য বিমোচন। বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী, বিগত এক দশকে গড়ে বার্ষিক ১ শতাংশের বেশি দারিদ্র্য কমাতে সক্ষম হয়েছে। অতিদারিদ্র্য ১ শতাংশ হারের কাছাকাছি কমেছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের হিসাবে গড়ে ১.৯ ডলারে পিপিপিতে দরিদ্র জনসংখ্যা ২০১৬ সালে ১৪.৮ শতাংশ হতে ২০১৯ সালে ৯.২ শতাংশে নেমে এসেছে। পুষ্টির দিক দিয়েও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছে। অপুষ্টির হার ২০০৮-২০১০ (৩ বছর গড়ে) সালে ১৬.৬ শতাংশ হতে ২০১৭-১৯-এ ১৩ শতাংশে নেমে এসেছে। ঠিক তেমনি মাধ্যমিকেও মোট ভর্তির হার ২০০৯ সালে ৪৮.৪ শতাংশ হতে ২০১৯ সালে ৭২.৬ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে যে অর্জন তার মধ্যে অন্যতম হলো মাতৃমৃত্যুর হার, নবজাতকের মৃত্যুর হার, শিশুমৃত্যুর হার, ৫ বছর নিচের শিশুদের মৃত্যুর হার কমানো। নিচে বিগত দশকে উপরোক্ত সূচকগুলোর বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হলো।

বছর	মাতৃমৃত্যুর হার	নবজাতকের মৃত্যুর হার	শিশুমৃত্যুর হার	৫ বছর নিচের শিশুদের মৃত্যুর হার
২০০৯	২৫৯	২৮	৩৯	৫০
২০১৯	১৬৫	১৫	২১	২৮

সূত্র : বিবিএস

নবজাতকের মৃত্যুর হার, শিশুমৃত্যুর হার, ৫ বছর নিচের শিশুদের মৃত্যুর হার বিগত দশকে প্রায় অর্ধেক কমানো সম্ভব হয়েছে। অবশ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, অবকাঠামো, গবেষণায় ব্যাপক বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবসা সহজ করার পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা অব্যাহত থাকবে। রূপকল্প-২০৪১-এর বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়তে হলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুর্নীতি কমানো, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের দিকে সরকার এখন অধিক নজর দিচ্ছে।

লেখক : পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব : গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রফেসর মাহ্‌ফুজা খানম

স্বর্গদপী গরিয়সী জননী জন্মভূমি বাংলাদেশকে ভালোবেসে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার গভীর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা। আজ ৮ আগস্ট, ২০২১, তাঁর ৯১তম জন্মজয়ন্তী। ১৯৩০ সালের এই দিনে জন্মেছিলেন গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। মা হোসনে আরা বেগম, বাবা শেখ জহুরুল হক। এক ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। মাত্র তিন বছর বয়সে হারান বাবাকে আর পাঁচ বছর বয়সে হারান মাকে। দাদা শেখ কাশেমের কাছেই তিনি বড় হন। তাঁর ডাকনাম রেণু।

বঙ্গমাতার লেখাপড়ার হাতেখড়ি প্রথম গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে, কিন্তু সেটি বেশিদিন চলেনি, তিনি গৃহশিক্ষকের কাছেই পড়াশোনা করেন। ঘরেই চলে লেখাপড়ার চর্চা। অত্যন্ত মেধাবী, প্রখর ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর ছিল প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অসীম ধৈর্য ও সাহস, যা পরিলক্ষিত হয়েছে তাঁর ৪৫ বছরের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে। যে শিশু তিন বছরে বাবাকে হারান, পাঁচ বছরে মাকে ও সাত বছরে হারান দাদাকে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা যে কতটা শক্ত ভীতের ওপর তৈরি হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, 'রেণুর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার মা মারা যান। একমাত্র রইলেন তার দাদা; দাদাও রেণুর সাত বছর বয়সে মারা যান। তারপর সে আমার মার কাছে চলে আসে। আমার ভাই-বোনদের সাথেই রেণু বড় হয়।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ১৩ বছর বয়সে বঙ্গমাতার সঙ্গে বিয়ে হয়। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বারো-তের বছর হতে পারে। বঙ্গমাতার বাবা মারা যাওয়ার পর ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনির বিবাহ দিতে হবে। কারণ আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দু'বোনকে লিখে দিয়ে যাব। রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। মুরব্বির হুকুম মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হলো। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না, রেণুর বয়স তখন বোধ হয় তিন বছর হবে।' বিয়ে হলেও বঙ্গবন্ধু এনট্রান্স পাস করার পরই মূলত তাঁদের সংসারজীবন শুরু হয়। তাঁদের ফুলশয্যা হয়েছিল ১৯৪২ সালে। এখানে বলা প্রয়োজন, বাবা-মাকে হারিয়ে বঙ্গমাতা সাত বছরে দাদাকেও হারান। তার পরই তিনি (বঙ্গমাতা) চলে আসেন বঙ্গবন্ধুর

বাড়িতে, বঙ্গবন্ধুর মা সায়েরা বেগমের কাছেই বড় হন, বঙ্গবন্ধুর ভাই-বোনদের সাথে। তাঁদের (বঙ্গমাতার) ঘর ও বঙ্গবন্ধুর ঘর ছিল পাশাপাশি, মধ্যে মাত্র দুই হাত ব্যবধান। বঙ্গমাতার শিশু ও বাল্যকাল কেটেছে বঙ্গবন্ধুর মায়ের আদরে, যত্নে, পরিচর্যায়। রেণুর শিক্ষাদীক্ষা-গৃহকর্ম–সবই সুসম্পন্ন হয়েছিল সায়েরা বেগমের হাত ধরেই। বলা যায়, তাঁর বেড়ে ওঠা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর খেলার সাথি হয়েই।

বঙ্গমাতার শৈশব-কৈশোর কেটেছে টুঙ্গিপাড়ায় বড় বেশি প্রকৃতির কোলে, পাখি ডাকা, গাছগাছালি, মধুমতী নদীর ধারে। বঙ্গমাতা সেই ছোট্টবেলা থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন বঙ্গবন্ধুর–গ্রামের মানুষের জন্য ভালোবাসা, গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য কেমন করে মন কাঁদে বঙ্গবন্ধুর। বঙ্গবন্ধুর অসহায়, বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নানা ঘটনা বঙ্গমাতা প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ছোট্টবেলা থেকেই, খুব কাছে থেকে। ছোটবেলা থেকেই রেণু বঙ্গবন্ধুর চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা, মানসিকতা, জীবন সম্পর্কে ধ্যানধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে ছিলেন ও প্রভাবিত হয়েছিলেন। যা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি তাঁর (বঙ্গমাতার) পরবর্তী জীবনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ভাবনায়, কর্মে। বঙ্গমাতার মনোজগৎও ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধুর চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, যার প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর পরবর্তী জীবনযাপনে। তিনি দেখেছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন, ধারণ করেছেন বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি, রাজনৈতিক জীবন, বঙ্গবন্ধুর যাপিত জীবনকে। তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলেন একজন লড়াকু আদর্শ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতির একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে, নিজেকে প্রতিনিয়ত শিক্ষিত করেছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে, সমর্পণ করেছেন নিজেকে সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে। বঙ্গমাতা তাঁর পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া একসঙ্গেই ধারণ করতে পেরেছিলেন। রেণুর স্বল্পদৈর্ঘ্য ৪৫ বছরের জীবনে পদে পদে তাঁর প্রমাণ তিনি রেখেছেন। বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে কাছের, পাশের, বুদ্ধি-পরামর্শক তো ছিলেন বঙ্গমাতা। বঙ্গমাতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিবেচনা, পরামর্শ অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধু সঠিক পথটি খুঁজে পেয়েছেন বারবার। যার প্রমাণ পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু, এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন, এ দেশের জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে বারে বারে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে দেশের জন্য যে নারীরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদেরই সমকক্ষ হিসেবে বঙ্গমাতার দেশপ্রেম পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৯৪২ সালে বঙ্গবন্ধু কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখানেই বলা যায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের শুভসূচনা। সেই সময় বঙ্গমাতা তাঁর শ্বশুর–শাশুড়ির সঙ্গেই ছিলেন টুঙ্গিপাড়ায়। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সেভাবে না হলেও তিনি স্বামীর লেখাপড়ার চালিকাশক্তিও ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

"কলকাতা যাব, পরীক্ষাও নিকটবর্তী, লেখাপড়া তো মোটেই করি না। ভাবলাম, কিছুদিন লেখাপড়া করব। মাহিনা বাকি পড়েছিল, টাকা-পয়সার অভাব।

রেণুর কাছে আমার অবস্থা প্রথম জানালাম। আব্বাকে বললে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন মনে হলো। কিছুই বললেন না। টাকা দিয়ে আব্বা বললেন, 'কোনো কিছুই শুনতে চাই না। বিএ পাস ভালোভাবে করতে হবে। অনেক সময় নষ্ট করেছ' পাকিস্তানের আন্দোলন বলে কিছুই বলি নাই। এখন কিছু লেখাপড়া করো। আব্বা, মা, ভাই-বোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেণুর ঘরে এলাম বিদায় নিতে। দেখি কিছু টাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। 'অমঙ্গল অশ্রুজল' বোধ হয় অনেক কষ্টে বন্ধ করে রেখেছে। রেণু প্রয়োজনে নিজের জমির ধান বিক্রির টাকা দিয়ে নিয়মিত স্বামীকে সহযোগিত করেছেন বহুবার।"

১৯৫৪ সালে বঙ্গমাতা ঢাকায় এলেন একক সংসার জীবনে। বসবাস শুরু করলেন পরিবার নিয়ে ঢাকার গেণ্ডারিয়া এলাকায় রজনী চৌধুরী লেনে। ১৯৫৪ সালে শেখ মুজিব মন্ত্রী হলে পরিবার নিয়ে সরকারি বাসভবন ৩ নং মিন্টো রোডের বাড়িতে এলেন। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলে ১৪ দিনের নোটিশে ৩ নং মিন্টো রোডের বাসা ছেড়ে দেন, ওঠেন ভাড়া বাড়িতে। তারপর বহুবার বাড়ি বদল করতে হয়েছে নানা কারণে। সর্বশেষে ১৯৬১-তে ৩২ নং ধানমণ্ডিতে ১ অক্টোবর নিজ বাড়িতে ওঠেন। এই বাড়ি নির্মাণেও বঙ্গমাতার কষ্ট ও শ্রম জড়িয়ে আছে। যে বাড়িটি পরবর্তী সময়ে হয়ে উঠেছিল এ দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আস্থার, ভালোবাসার, আগ্রহের, নির্ভরতার আশ্রয়স্থল। নানা সংগ্রাম-আন্দোলনের ডাক এসেছে এ বাড়ি থেকেই। আদেশ-নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু বারে বারে এ বাড়ি থেকেই।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আমলে বহুবার জেলে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর ৫৫ বছরের জীবনে প্রায় ৯ বছরের বেশি সময় জেলেই কাটিয়েছেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত একনাগাড়ে দুই বছরের বেশি জেলের বাইরে বঙ্গবন্ধু থাকতে পারেননি। বঙ্গমাতা একা সংসার সামলিয়েছেন, পাঁচটি সন্তান মানুষ করার সংগ্রামে ব্রতী ছিলেন। টাকা-পয়সা অপ্রতুল, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ, আওয়ামী লীগ কর্মীদের নানা রকম প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়ানো, আর্থিক সাহায্য করা, আওয়ামী লীগের পথচলায় বিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতার মতো দিকনির্দেশনাও তিনি দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার সারাংশ তিনি নিয়ে পৌঁছে দিতেন জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে। বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা, পরামর্শ নিয়ে ফিরে এসে তা যথাস্থানে নেতাকর্মীদের পৌঁছে দিতেন। তিনি ছিলেন সেতুবন্ধ বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাঝে, যখন বঙ্গবন্ধু জেলে থাকতেন এভাবেই বঙ্গমাতা হয়ে ওঠেন একজন প্রাজ্ঞ, অবিচল, নিবেদিত রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা লোকচক্ষুর অন্তরালে। বঙ্গমাতাকে সংসার সামলাতে হচ্ছে, জেলখানার খোঁজখবর আনা-নেওয়া করতে হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর নানা মামলার নথিপত্র মামলার আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, মামলার খরচ জোগান দেওয়া, তাতে তাঁর নিজের অলংকার বিক্রি করতে দ্বিধা করেননি। এ একমাত্র সম্ভব হয়েছিল–কী প্রগাঢ়

বিশ্বাস ছিল বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ওপর, তাঁর কর্মের ওপর। এ দেশের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়েই কেবল এ কাজগুলো করা সম্ভব।

আমরা এ-ও জানি, বঙ্গমাতার অনুপ্রেরণায়, তাগাদায় ও তাঁর প্রদেয় খাতায় বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' লিখেছেন, যা সমগ্র বাঙালি জাতির সংগ্রাম-আন্দোলন কাহিনির অসামান্য দলিল হয়ে রয়েছে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "আমার স্ত্রী আমাকে কয়েকটা খাতাও কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কয়টা আমাকে দিয়েছেন। রেণু আরো একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। 'বসেই তো আছ, লেখো তোমার জীবনকাহিনী।' বললাম, লিখতে যে পারি না; আর এমন কী করেছি, যা লেখা যায়। আমার জীবনের ঘটনাগুলো জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।"

১৯৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলনে বঙ্গমাতার ভূমিকা ছিল অনন্য। ৬ দফা দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেপ্তার হন। ৬ দফার আন্দোলনে বঙ্গমাতা ৬ দফার গুরুত্ব বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি এড়িয়ে ছদ্মবেশে বোরকা পরে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করতেন। এ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নানা পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতেন। ৬ দফার আন্দোলনকে সফল করার জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি। বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা। একে বাস্তবায়িত করার জন্য একাধারে আন্দোলন-সংগ্রাম চলছিল, অন্যদিকে একে নস্যাৎ করতে ৮ দফা উপস্থাপিত হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা ঢাকায় এলেন, তাঁরা শাহবাগ হোটেলে থাকলেন। বঙ্গমাতার যোগাযোগ ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল জেলার নেতাকর্মীদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতেই ও বঙ্গবন্ধুর আকাঙ্ক্ষা ৬ দফা থেকে এক চুলও নড়া যাবে না, এই উপলব্ধি থেকে বঙ্গমাতা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গেছেন।

১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু জেলগেটেই সেনাবাহিনীর লোক আবার গ্রেপ্তার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। পাঁচ মাস বঙ্গবন্ধুর কোনো খোঁজ ছিল না। বঙ্গমাতা, জনগণ পর্যন্ত জানতে পারেনি তিনি কোথায় আছেন। ১৯৬৮-তে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জন উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। এই মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। গণ-আন্দোলন দিনে দিনে জোরালো হচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার কথা হয় লাহোরে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য। বঙ্গমাতা আন্দোলনে এতটাই সম্পৃক্ত ছিলেন ও প্রাজ্ঞ ছিলেন, এই মামলা টিকবে না, বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতেই হবে পাকিস্তান সরকারকে। তাই তিনি বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্ত হয়ে

লাহোরের গোলটেবিল বৈঠকে যেতে বারণ করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর এই প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তে আস্থা রেখে লাহোর বৈঠক বয়কট করলেন। ৬ দফার আন্দোলন দিনে দিনে গতি লাভ করে। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান দাবানলের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের মুখে পাকিস্তান জান্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয় ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯। পরের দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি আমরা ছাত্রসমাজ, আপামর জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে নিজেরা ধন্য হয়েছিলাম। সেই থেকে তিনি আমাদের বঙ্গবন্ধু। এই আন্দোলনে বঙ্গমাতার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অনেক অবদান রয়েছে।

চলে এলো ১৯৭০-এর নির্বাচন। নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও আওয়ামী লীগ তথা বাঙালির কাছে রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করে পাকিস্তানি জান্তারা। শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। ধর্মঘট-প্রতিবাদ, মিটিং-মিছিল, টিয়ার গ্যাস-গুলি, আহত-নিহত, গায়েবানা জানাজা-লাশ নিয়ে পাল্টা মিছিল হলো নিত্যদিনের ঘটনা।

এই মধ্যে এলো ৭ই মার্চ ১৯৭১। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেবেন। সমগ্র বাঙালি জাতি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কী নির্দেশ দেবেন বঙ্গবন্ধু। ছাত্রসমাজ, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, কর্মীবৃন্দ নানাভাবে বঙ্গবন্ধুকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। ওই দিনের স্মৃতিচারণা করে বঙ্গমাতার জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, '৭ই মার্চ ভাষণের আগে কতজনের কত পরামর্শ, আমার আব্বাকে পাগল বানিয়ে ফেলছে। সবাই এসেছে–এটা বলতে হবে, ওটা বলতে হবে। আমার মা আব্বাকে খাবার দিলেন, ঘরে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আব্বাকে সোজা বললেন, তুমি ১৫ মিনিট শুয়ে বিশ্রাম নিবা, অনেকেই অনেক কথা বলবে। তুমি সারা জীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছ, তুমি জেল খেটেছ। তুমি জানো কী বলতে হবে। তোমার মনে যে কথা আসবে, সেই কথাই বলবা।' বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর কথাকে মনেপ্রাণে ধারণ করে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে উত্তাল জনসমুদ্রের সামনে আঙুল উঁচিয়ে বললেন বাঙালির বঞ্চনার কথা, তাদের অধিকারের কথা, তাদের আগামী স্বপ্নের কথা। ১০ লক্ষ বাঙালি সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বক্তব্য শুনলেন ও ধারণ করলেন অন্তরে। ওপরে হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছিল, সেনাবাহিনী প্রস্তুত ক্যান্টনমেন্টে, যেকোনো সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে। অত্যন্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু তাঁর ১৯ মিনিটের ভাষণের শেষে লাইনটি বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম; জয় বাংলা।' ১৯ মিনিটের এই ঐতিহাসিক ভাষণে সমগ্র জাতি পায় দিকনির্দেশনা। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ করে ৩০ লক্ষ বাঙালির আত্মদানের ফলে ও চার লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ লাভ করি আমরা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে দীর্ঘ ৯ মাস সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে ৩২ নং ধানমণ্ডিতে অন্তরীণ ছিলেন তিনি দুই কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও কনিষ্ঠ পুত্র শেখ

রাসেলকে নিয়ে। প্রথম পুত্র শেখ কামাল ও দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে। স্বামী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে আটক, বেঁচে আছেন কি না, তা-ও অজানা; ফিরবেন কি না, তা-ও অনিশ্চিত। এই ৯ মাস নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদের পাশেই ছিলেন নিজের মনোবল অটুট রেখে। এ তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। সেই প্রত্যাশায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি তিনি। একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হয়ে তিনি ৯ মাস ঢাকায় থেকেই স্বাধীনতার আন্দোলনে নানা মাত্রা যুক্ত করেছিলেন।

১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন যান। সেখান থেকেই প্রথম কথা হয় বঙ্গবন্ধুর প্রাণপ্রিয় সহধর্মিণী রেণুর সঙ্গে। ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন তাঁর অনেক স্বপ্নের, ভালোবাসার, ত্যাগের, আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশে।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ার কাজে হাত দিলেন। তিনি পাশেই পেলেন তাঁর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে। লক্ষ মা-বোন নির্যাতিত হয়েছিল ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বললেন, 'আমি তোমাদের মা। এই বীরাঙ্গনা নারীদের জন্য জাতি গর্বিত। তাদের লজ্জা কিংবা গ্লানিবোধের কারণ নেই। কেননা তাঁরাই প্রথম প্রমাণ করেছেন যে কেবল বাংলাদেশের ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও আত্মমর্যাদাবোধে কী অসম্ভব বলীয়ান।' (দৈনিক বাংলার বাণী, ১৭ ফাল্গুন ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ)। নির্যাতিত মেয়েদের সন্তান প্রসবের সহায়তা, নবজাতক শিশুদের দত্তক দেওয়ার ব্যবস্থাপনায়ও যুক্ত হন তিনি। কত নির্যাতিত, অসহায় মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন বঙ্গমাতা নিজ উদ্যোগে।

বঙ্গমাতা সারা জীবনই অতি সাধারণ জীবন যাপন করেছেন। তাঁর পরিবারের বাড়ির আসবাবপত্র, খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই অতি সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মতোই রেখেছিলেন তিনি আজন্ম। বঙ্গবন্ধু এমএনএ, এমপি-মন্ত্রী থাকাকালীন অনেকবার করাচি-পশ্চিম পাকিস্তান গেছেন, বঙ্গমাতা একবারের জন্যও তাঁর সঙ্গী হননি, কখনো যেতেও চাইতেন না। সম্ভবত তিনিই বুঝেছিলেন এ দেশ স্বাধীন হবে, ওখানে কেন যাওয়া। দেশের জন্য দেশের ভেতর যেমন তিনি কাজ করেছেন বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে আজীবন, আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকেছেন সব সময়। বঙ্গমাতার সঙ্গে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকেছেন বঙ্গমাতা যখন বিশ্বনেতারা বাংলাদেশে সফরে এসেছেন। যেকোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার অপূর্ব এক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি।

বঙ্গবন্ধুর সেই ছোট্টবেলার খেলার সাথি রেণু আজন্ম বঙ্গবন্ধুর সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, ঘরে-বাইরে, বিশ্বাসে-আকাঙ্ক্ষায় আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী হয়ে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পরামর্শক হয়ে, বন্ধুর মতো, অনুপ্রেরণাদায়ী হয়ে, সহধর্মিণী হয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে মনেপ্রাণে ধারণ করে একজন রাজনৈতিক সংগঠক

হয়ে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত একই সঙ্গে ছিলেন দোহে। বেঁচে থাকাকালীন যেমন দুজন দুজনের জন্য উৎসর্গিত ছিলেন, যে সম্মানে, ভালোবাসায় আজীবন একে অপরের সম্পূরক-পরিপূরক ছিলেন, মৃত্যুবরণ করলেন একই সাথে, একই সময়, একই দিনে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট, একই বাড়িতে, ৩২ নং ধানমণ্ডিতে।

বলা কি যায় না–তিনি সহধর্মিণী হয়ে সহমরণ বরণ করে নিয়েছেন। আজ তাঁর ৯১তম জন্মজয়ন্তী। কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, বিশ্বের ইতিহাসে তিনি অনন্য ও একক। যুগ যুগ ধরে তিনি বাঙালির কাছে, বিশ্ব নাগরিকের কাছে পূজনীয়, বরণীয়, অনুকরণীয় হয়েই থাকবেন, এ কথা একবাক্যে নির্দ্বিধায় বলা যায়।

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর
... কোনো কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী।'

বঙ্গমাতার আজকের ৯১তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি রইল আমার অগাধ-পরম শ্রদ্ধা। তিনি অবশ্যই বেঁচে থাকবেন, বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসে, বেঁচে থাকবেন বিশ্ব নাগরিকের কাছে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক ধ্রুবতারা হয়ে।

লেখক : শিক্ষাবিদ, ডাকসুর সাবেক ভিপি।

তুমিই চিনাবে সবে

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আজ ১৭ই মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৭ই মার্চ তারিখটি আমরা জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করি; কারণ জীবদ্দশায় বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মদিনে কিছুটা সময় শিশুদের সাথে কাটাতে পছন্দ করতেন। শিশুরাও বঙ্গবন্ধুর সন্নিধ্যে কিছুটা সময় থাকার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত।

বঙ্গবন্ধুর জন্মের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইতিহাসের চিরন্তন সত্যে ভাস্মর। বঙ্গবন্ধুকে দিয়েই বিশ্বব্যাপী বাঙালির পরিচয়, বাংলাদেশের পরিচয়। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও বাংলাদশ একটি অভূতপূর্ব কিন্তু কঠিন সমীকরণ যার পেছনে আছে ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণদান।

১৩১৩ বঙ্গাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'তুমিই চেনাবে সবে' পঙক্তিটি এই প্রবল সত্যের অভাবনীয় প্রতিফলন বলেই প্রবন্ধের শিরোনামে উদ্ধৃত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, ১৯৭১ তারিখে বঙ্গবন্ধুপ্রদত্ত ঐন্দ্রজালিক যে ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের কার্যত স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' উচ্চারণ করে (de facto declaration of our independence) সেই ভাষণই ৪৬ বছর পর ২০১৭ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব স্মারক ঐতিহ্য তালিকায় সংযোজিত। মানবসভ্যতা এগিয়ে যাওয়ায় ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল মাইলফলক হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছে যে ভাষণ, এখন সারা পৃথিবীর মানুষের নিকট নিরন্তর অনুপ্রেরণার উৎস সে ভাষণ।

নিজ জন্ম নিয়ে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আমার জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। আমার ইউনিয়ন হলো ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বশেষ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের পার্শ্বেই মধুমতী নদী। মধুমতী খুলনা ও ফরিদপুর জেলাকে ভাগ করে রেখেছে।'

'টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশের নাম কিছুটা এতদঞ্চলে পরিচিত। শেখ পরিবারকে একটা মধ্যবিত্ত পরিবার বলা যেতে পারে। বাড়ির বৃদ্ধ ও দেশের গণ্যমান্য প্রবীণ লোকদের কাছ থেকে এই বংশের কিছু কিছু ঘটনা জানা যায়। আমার জন্ম হয়

এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১-৩)। জন্মের কথাটি কত সহজভাবে বঙ্গবন্ধু নিজেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

আজ ২০২২ সালে যখন আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করছি তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা ফিরে যাই ৫২ বছর পূর্বে একাত্তরের ১৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর ৫২তম জন্মদিনে।

একাত্তরের সেই অগ্নিঝরা মার্চে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে বহু দেশি-বিদেশি সাংবাদিক সমবেত হয়েছিলেন ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। ইতিপূর্বেই ব্রিটিশ গণমাধ্যম বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির' ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনটিকে লন্ডনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সাথে তুলনা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে সারা পূর্ব পাকিস্তান এখন পরিচালিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর এই বাড়ি থেকে।

ওই দিন, অর্থাৎ ১৭ই মার্চ ১৯৭১ তারিখে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সেনাশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে দ্বিতীয় দফায় এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক থেকে বের হলে বঙ্গবন্ধুকে কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছিল। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বঙ্গবন্ধুর মুখে মৃদু হাসির ছটা দেখে একজন বিদেশি সাংবাদিক বলেন, 'ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনার গতিধারা সম্পর্কে এই হাসিটুকু তাৎপর্যবহ কি না?' বঙ্গবন্ধু মৃদু হেসেই জবাব দিলেন, 'আমি সর্ব অবস্থাতেই হাসতে পারি।' এমনকি 'জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।' তারপর সাংবাদিককে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আপনিও তো হাসছেন।' কঠিন পরিস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধু ধীরস্থির থেকে নিজ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সর্বদাই সাহস নিয়ে এগিয়ে গেছেন। রবীন্দ্র পঙক্তি 'শান্ত তোমার ছন্দ' বঙ্গবন্ধুর দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিরই যথাযথ প্রতিচ্ছবি।

জনৈক বিদেশি সাংবাদিক একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর ৫২তম জন্মদিনে প্রশ্ন করেছিলেন, 'জন্মদিনের উৎসবের কোন অনুষ্ঠান আজ আপনার হয়নি? মোমবাতি জ্বালিয়ে জন্মদিনের কেক সাজানো হয়নি? আপনি একেক করে সেই মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলার পর শুভেচ্ছা জানিয়ে কেউ গান গেয়ে ওঠেনি?'

বঙ্গবন্ধু জবাবে বলেছিলেন, 'জন্মদিনের উৎসব! আমি জন্মদিনে উৎসব পালন করি না। এই দুঃখিনী বাংলায় আমার জন্মদিনই-বা কী আর মৃত্যুদিনই-বা কী? আপনারা বাংলাদেশের অবস্থা জানেন। এ দেশের জনগণের কাছে জন্মের আজ নেই কোনো মহিমা। যখনই কারো ইচ্ছা হলো, আমাদের প্রাণ দিতে হয়। আমার আবার জন্মদিন কী? আমার জীবন নিবেদিত আমার জনগণের জন্য। আমি যে তাদেরই লোক।' (অধুনালুপ্ত দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ মার্চ, ১৯৭১) জনগণের মঙ্গল ও মানুষের প্রতি সহমর্মিতায় জীবনভর তৎপর ছিলেন বঙ্গবন্ধু। মানুষের প্রতি ভালোবাসাই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনের মূল উপজীব্য।

ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন যে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হচ্ছে তিনি মানুষকে ভালোবাসেন আর সবচেয়ে দুর্বল দিক

হচ্ছে তিনি মানুষকে বেশি ভালোবাসেন। বঙ্গবন্ধু জীবনের স্বমূল্যায়ন করতে গিয়ে ভালোবাসার বাইরে যেতে পারেননি। এই ছিলেন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু।

'আমি জনগণের এবং জনগণ আমার। আমি বাংলার মাটিকে ভালোবাসি। আমায় ভালোবাসে বাংলার মাটি। বাংলা আমার। আমি বাংলার।'–এই আত্মোপলব্ধিই বঙ্গবন্ধুকে মাটির মানুষের কোমল হৃদয়ের এত কাছাকাছি এনে দিয়েছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাই প্রাণের নিবিড়তম স্পর্শে এই মুক্ত মহাপ্রাণকে অনুভব করে আপনজন হিসেবে। জাতি আজ অনাড়ম্বর পরিবেশে হৃদয়ের উষ্ণ উত্তাপে জাতির জনকের ৫৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করবে। (অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা, ১৭ মার্চ ১৯৭৪)

বঙ্গবন্ধুর জীবনে শেষ জন্মদিন ছিল ১৭ই মার্চ, ১৯৭৫। অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা সেদিন এক নিবন্ধে লিখেছিল ১৯৫৪ সালের ঘটনা। বাংলাদেশ তখন জাগতে শুরু করেছিল গ্রামে, গঞ্জে, শহরে। সে সময় পল্টনে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনতে আসা একজন সাধারণ শ্রোতার উক্তি, 'আমরা শেখ মুজিবের কথা বুঝি। কারণ, তিনি আমাদের ভাষায় কথা বলেন। আমরা তাঁর কথা শুনতে আসি। কারণ, এমন সহজে এত জোর দিয়ে আমাদের দুঃখের কথা আর কেউ বলতে পারেন না। আমরা তাঁকে ভালোবাসি। তিনিও ভালোবাসেন আমাদের। সুখে-দুঃখে আমরা তাঁর সাথে আছি এবং থাকব। কারণ তিনি আমাদের আপন মানুষ।'

মানবতাবোধ ও মানবিকতার শীর্ষ ধাপ হচ্ছে মানুষের প্রতি অন্তহীন ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থত্রয়ের পাতায় পাতায় বঙ্গবন্ধুর মানবতাবোধের দৃষ্টান্ত দীপ্যমান হয়ে আছে।

মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা লিয়ার লেভিনের ভাষায়, 'বঙ্গবন্ধুর নাম, ক্যারিশমা ও নেতৃত্ব ছিল প্রচণ্ড বিশ্বাসযোগ্য এক শক্তি। সেই শক্তিই একটি জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিল। নিয়ে গিয়েছিল বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার পথে। সম্ভব হয়েছিল নতুন একটি দেশের মহাজন্ম উদ্‌যাপন করার।' (বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু, এনআরবিসি ব্যাংক প্লানেট প্রকাশনী, পৃ. ৬৯৫)।

একাত্তরের ২৫শে মার্চ ভয়াবহ রাতে যখন পাকিস্তানের বর্বর বাহিনী ঘুমন্ত ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর গণহত্যা শুরু করে তখন ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্কচিত্তে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ও আইনগত স্বাধীনতা (de jure declaration of independence) ঘোষণা দেন। অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও গভীর প্রজ্ঞার কারণে বঙ্গবন্ধু জীবনে সর্বদাই সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগিয়ে গেছেন।

পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টেও ঘাতকদের গুলির সামনে বঙ্গবন্ধু মাথা উঁচু করে এসে দাঁড়ান ও আভিজাত্যের সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। বাঙালির মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে মরণজয়ী তা ঘাতকদের জানার কথা নয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শন জাতিকে সর্বদাই পথনির্দেশনা দেবে। মুজিব মৃত্যুঞ্জয়ী ও চিরঞ্জীবী।

বঙ্গবন্ধুর জাদুকরী ও সম্মোহনী নেতৃত্বের ফলেই যে আমরা আজ স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক তার ইতিহাস পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক আমলের ২৪ বছরের নির্যাতন ও বঞ্চনার ইতিহাস। পর্যায়ক্রমে বাঙালি জাতিকে কীভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন বঙ্গবন্ধু তা আজ সারা পৃথিবীর কাছে এক বিশাল বিস্ময়। কিন্তু আমরা জানি এর পেছনে বঙ্গবন্ধুর জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন। বলতে গেলে পাকিস্তানের চব্বিশ বছরই বঙ্গবন্ধু কারাগারেই ছিলেন। কারণ যখন কারাগারের বাইরে ছিলেন তখনো পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণ নজরদারিতে থাকতেন প্রতিটি মুহূর্ত। বঙ্গবন্ধু একবার নিজেই বলেছিলেন, 'কারাগার আমার দ্বিতীয় বাসস্থান'। কী নিদারুণ সংকটের মাঝে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালি জাতিকে পাহাড়ের ন্যায় অটল ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তা মানবমুক্তির আন্দোলনের দীপ্তিময় দৃষ্টান্ত।

শ্রীলঙ্কার দুইবারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষ্মণ কাদির গামার (১৯৩২-২০০৫) মতে, 'দক্ষিণ এশিয়া গত কয়েক শতকে বিশ্বকে অনেক শিক্ষক, দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক নেতা ও যোদ্ধা উপহার দিয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সব কিছুকে ছাপিয়ে যান। তাঁর স্থান নির্ধারিত হয়ে আছে সর্বকালের সর্বোচ্চ আসনে। শেখ মুজিবুর রহমান রাজবংশের সন্তান নন, তিনি পাশ্চাত্যের বিলাসী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন এক নিভৃত পল্লীর মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া সাধারণ মানুষ।' (বঙ্গবন্ধুর জীবনই বাঙালি জাতির রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, পৃ. ২৪৪)

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ের পর ১০ ডিসেম্বর ১৯৭০ লন্ডনের দ্য টাইমস পত্রিকা আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তানের 'মুকুটহীন সম্রাট' হিসেবে আখ্যায়িত করে। গার্ডিয়ান পত্রিকা এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে শেখ মুজিবকে নিরঙ্কুশ বিজয়ী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যা দেয়।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ১৯৭৪ সালের ৯ জানুয়ারি লন্ডনের নিউ স্টেটসম্যান সাময়িকী উদ্ধৃত করে নিম্নোক্ত সংবাদ পরিবেশন করে, যা পরদিন অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি ১৯৭৪ তারিখের অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয় যে 'সম্প্রতি লন্ডনের নিউ স্টেটসম্যানের এক নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের 'শ্রেষ্ঠ সম্পদ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নিবন্ধে বলা হয় যে 'অতীতের চেয়ে আজকের বাংলাদেশে মুজিবের নেতৃত্বের প্রয়োজন অনেক বেশি'। বঙ্গবন্ধুর প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার ইতিবাচক দিক তুলে ধরে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধির আশা প্রকাশ করা হয় উক্ত নিবন্ধে।

গত ১৪ মার্চ, ২০২২-এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমআইটি প্রেস থেকে 'ইনোভেশন' সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের সূত্র ধরে বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল যে এ দেশের মানুষ উন্নত-সমৃদ্ধ জীবন পাবে, সুখে-শান্তিতে বাস করবে। কিন্তু আরাধ্য কাজ শেষ করার আগেই তিনি ঘাতকদের হাতে সপরিবারে

নিহত হন। তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজ শেষ করাই আমার লক্ষ্য।' সাময়িকীতে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা রচিত 'Striving to Realise the Ideals of My Father' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৪১১ বঙ্গাব্দের প্রথম দিন, অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ (২০০৪ সালের ১৪ এপ্রিল) ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন বা বিবিসির বাংলা সার্ভিস সকালের অধিবেশনে বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি বাঙালির মাঝে পরিচালিত শ্রোতা জরিপের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে। জরিপ অনুযায়ী 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণা করে। শীর্ষ ২০ জন বাঙালির তালিকা প্রণয়নে বিবিসি এ জরিপ পরিচালনা করে।

জরিপের ফলাফল ঘোষণার এ অধিবেশনে প্রয়াত সাংবাদিক আতাউস সামাদ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন, "উনি নির্বাচনী যে প্রচারগুলো করেছেন তার অনেক জায়গায় আমি তাঁর সঙ্গে গিয়েছি। উনি সবখানেই ছয় দফার কথা বলতেন এবং ছয় দফা না হলে একটি আঙুল তুলে বলতেন আমার দাবি 'এই', অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করতে হবে।" জনাব সামাদ আরো বলেন, '১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্সে তিনি এমন একটি বক্তৃতা দিলেন, যা সবার মন ছুঁয়ে গেল, সবাই ওঁনার নির্দেশ মানতে লাগল এবং ওঁনার নামেই স্বাধীনতাযুদ্ধ চলেছে। ৯ মাসের যুদ্ধের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।'

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর প্রথম জন্মদিনে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর সাথে একই মঞ্চ থেকে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের প্রথম আজীবন সদস্য করা হয় বঙ্গবন্ধুকে ১৭ই মার্চ ১৯৭২-এ। ওই দিন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর কর্মব্যস্ততার কারণে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় ১৯৭২ সালের ৬ মে। সেদিন বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন ও ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু ১৭ মার্চ ১৯৭২-এ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন। তবে বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে বলেন, ভবিষ্যতে ১৭ মার্চ তাঁর জন্মদিন হিসেবে সরকারি ছুটি থাকবে না এবং দিনটি হবে ত্যাগ ও উৎসর্গের দিন।

এ দেশের সাড়ে সাত কোটি দুঃখী মানুষের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর জীবন উৎসর্গীকৃত। এ উৎসর্গই হচ্ছে তাঁর সকল শক্তির উৎস। আর এ জন্যই এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবন ও ভাগ্যের ওপর তাঁর অপরিসীম প্রভাব। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ মার্চ ১৯৭৩) জাতীয় শিশু দিবসে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শিশুদের যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেভাবে যেন আমরা শিশুদের পরিচর্যা করি। ১৯৫২ সালে গণচীন সফরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু সে দেশের শিশু-কিশোরদের শিক্ষাব্যবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, যার বর্ণনা আমরা পাই 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থে। বৈষম্যহীন, একমুখী,

বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন বঙ্গবন্ধু করেছিলেন তার সাথে এবারের শিশু দিবসের প্রতিপাদ্যের মিল রয়েছে। প্রজাতন্ত্রের সকল শিশুর সম অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিজ্ঞায় আসুন, আজ আমরা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের সূচনা করি। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রচনা করবে। তাই তিনি শিশুদের সুস্থ শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ দেখতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আজীবনের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলায় থাকবে সোনার মানুষ। রবীন্দ্রনাথের পঙক্তি 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে' উচ্চারণ আজকের দিনে জাতির প্রত্যাশা।

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য।

বঙ্গবন্ধু : আমাদের অনন্ত প্রেরণার উৎস

ড. আতিউর রহমান

আগস্ট শোকের মাস। আগস্ট প্রতিরোধেরও মাস। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট আমাদের জাতির পিতাকে কতিপয় পিশাচের আচমকা আক্রমণে শারীরিকভাবে হারিয়েছি। এ কথা ঠিক সাময়িকভাবে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। চারদিকে নেমে এসেছিল নিকষ অন্ধকার। তাঁর কষ্টের ধন বাংলাদেশ তখন চলছিল 'অদ্ভুত এক উটের পিঠে' মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উল্টো দিকে। অস্বীকার করার উপায় নেই এই আঘাত করা হয়েছিল বাঙালি জাতির মর্মমূলে। কেননা বঙ্গবন্ধুই যে বাংলাদেশের হৃদয়। সেই হৃদয়কেই গুলিবিদ্ধ করে বিশ্বাসঘাতকের দল। তারপর এই নির্বোধেরা বলতে থাকে তিনি কেউ নন। তার জবাবে কবি মহাদেব সাহা বলেন–

'তুমি কেউ নও, বলে ওরা, কিন্তু বাংলাদেশের আড়াইশত নদী বলে,
তুমি এই বাংলার নদী, বাংলার সুবজ প্রান্তর
তুমি এই চর্যাপদের গান, তুমি এই বাংলার অক্ষর,
বলে ওরা, তুমি কেউ নও, কিন্তু তোমার পায়ের শব্দে
নেচে ওঠে পদ্মার ইলিশ;
তুমি কেউ নও, বলে ওরা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান আর নজরুলের
বিদ্রোহী কবিতা বলে,
তুমি বাংলাদেশের হৃদয়।'

('এই নাম স্বতোৎসারিত', মহাদেব সাহা)

সেই আদিগন্ত বিস্তৃত বাংলাদেশের আরেক নামকে কি এত সহজেই মোছা যায় কোটি কোটি বাঙালির অন্তর থেকে? মোটেও না! তাই তো অশ্রু রূপ নিয়েছে অগ্নিতে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমরা তাঁকে করে নিয়েছি আমাদের চলার পথের নিত্যসারথি। আমাদের মনোজগতে তাঁর ঠাঁই হয়েছে অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস হিসেবে। তাঁর দেওয়া নিরন্তর লড়াই করার চেতনাকে বুকে ধারণ করেই আজ আমরা এগিয়ে চলেছি সম্মুখপানে। মাথা উঁচু করে।

বিশ্বজুড়েই বইছে করোনার লু হাওয়া। বাংলাদেশও তার বাইরে নেই। সংক্রমণ ও তা থেকে মৃত্যু দুইই আছে বাংলাদেশে। তবু থেমে নেই বাংলাদেশ। জীবন ও জীবিকা–দুটোই সামলে এগিয়ে চলেছে। আছে দুঃখ। আছে মৃত্যু। আবার একই সঙ্গে আছে প্রাণ। আছে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া স্বপ্ন, আমাদের বোধে, মননে। আমরা বসে নেই। ঠিক যেমনটি বসে নেই বঙ্গবন্ধুকন্যা। শুধু পিতা নয়, পরিবারের

পরমপ্রিয় প্রায় সকলকে হারিয়েও তিনি ভেঙে পড়েননি। শোককে শক্তিতে পরিণত করে তিনি তাঁর সমস্ত সামর্থ্য ঢেলে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বাড়ন্ত এই বাংলাদেশকে। শুধু এই বিশ্ব মহামারিই নয়, যেকোনো দুর্যোগের সময় তিনি জাতিকে সাহস জুগিয়ে চলছেন অনেকটা সময় ধরে। যেকোনো বিপর্যয়ে তিনি প্রায়ই একটি কথা বলেন, 'স্বজন হারানোর ব্যথা আমার চেয়ে বেশি আর কে বোঝে? তার পরও তো আমি চুপ করে বসে থাকিনি। দেশের মানুষের কথা ভেবেই জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।'

এই লড়াকু মন তিনি পেয়েছেন জাতির পিতার লড়াকু প্রাণশক্তি থেকেই। বঙ্গবন্ধু বিপদে কখনো ভেঙে পড়েননি। ফাঁসির মঞ্চের কাছাকাছি দাঁড়িয়েও তিনি গেয়েছেন জীবনের জয়গান। তাঁর এই মানসিক শক্তিই হতে পারে আমাদের চলার পথের সবচেয়ে বড় পুঁজি। তিনি জীবনভর সংগ্রাম করেছেন জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে। আজীবন বুক ফুলিয়ে লড়াই করে গেছেন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সর্বক্ষণ তিনি বিভোর ছিলেন শোষণ-বঞ্চনা, অন্যায়-অবিচারের অবসানে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের চিন্তায়।

বঙ্গবন্ধু তরুণ বয়সেই কারাবন্দি হয়েছেন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। জেলই হয়ে উঠেছিল তাঁর দ্বিতীয় ঠিকানা। সেখানেও 'লুদু'র মতো গরিব-দুঃখীদের কথা শুনতেন গভীর আগ্রহ নিয়ে। উদ্দেশ্য, কখনো সুযোগ পেলে তাদের মতো মানুষের দুঃখমোচনে যেন তিনি ঠিক কৌশলটি খুঁজে পান। একইভাবে বত্রিশ বছর বয়সী শেখ মুজিব নয়াচীন সফরে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেরিয়েছেন বিপ্লবোত্তর ওই দেশের ভিক্ষুক ও পতিতা সমস্যা কী করে সমাধান করা হয়েছে। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন কীভাবে হচ্ছিল। সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগ কী করে সবাইকে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। শ্রমিকের আবাসন কীভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছিল। প্রতিটি বিষয়ে তিনি নোট নিয়েছেন। মনে হয়, তখন থেকেই তিনি মনে মনে তৈরি হচ্ছিলেন সোনার বাংলা গড়বার জন্য।

এরপর তিনি জড়িয়ে পড়েন মূলধারার রাজনীতিতে। ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ। সে জন্য বারবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে। আবার এর ফাঁকে ফাঁকে করেন নির্বাচন। হন মন্ত্রী। বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করেন জীবন থেকে নেওয়া সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের নানা উদ্যোগ। পশ্চিম পাকিস্তানি নির্মম শাসকগোষ্ঠী তাঁকে স্থিরভাবে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে মনোনিবেশ করতে দেয়নি। ফের জেল। ফের জুলুম। তাই তো ছয় দফা কর্মসূচি। আর সে কারণে দীর্ঘ জেলজীবন এবং একপর্যায়ে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। লক্ষ্য, তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে চিরতরে শেষ করে দেওয়া।

কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে! বরং ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের শেষে তিনি ওই মামলা থেকে নিঃশর্ত মুক্তি পেয়ে পেলেন জনগণের ভালোবাসার মুকুট বঙ্গবন্ধু উপাধি। আজ তা তাঁর নামেরই অংশ। এর পরের কথা আমাদের সবারই জানা।

সত্তরের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়েও সরকার গঠনে বাধা পাওয়া, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে অসামান্য অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান, গণহত্যা শুরুর পরপরই ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহানায়কে পরিণত হন। এরপর পাকিস্তানি বন্দিশিবিরে ৯ মাস আটক থাকার পর মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন বীরের বেশে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি। দেশে ফিরেই শুরু করেন দেশ গড়ার আরেক কঠিন লড়াই। তাঁর অর্থনৈতিক সেই মুক্তির লড়াইও কম রোমাঞ্চকর নয়। সেদিনই তিনি বলেছিলেন, 'যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায় তাহলে স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে–পূর্ণ হবে না।'

যুদ্ধ-পরবর্তী ছাই-ভস্মের মধ্যে একেবারে শূন্য থেকেই যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। শরণার্থী পুনর্বাসনসহ যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার মানুষকে রক্ষা করার পাশাপাশি তাঁকে যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন করে দাঁড় করাতে হয়েছিল। একই সঙ্গে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে দেশের কৃষি ও শিল্প খাতকে গড়ে তুলছিলেন। লক্ষ্য–খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং শিল্পোৎপাদন বেগবান করা। সংবিধান এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার জন্য দরকারি মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠন করেছিলেন শিক্ষা কমিশন। উপর্যুপরি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের মধ্যেও দেশের অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। তীব্র খাদ্য ঘাটতি আর মূল্যস্ফীতি মোকাবেলা করেই এগোতে হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুকে। আর পাকিস্তানিদের প্ররোচনায় পরাশক্তিগুলোর নোংরা খাদ্য সহায়তার রাজনীতি তো ছিলই। দেশের ভেতরেও নানা অপশক্তি বঙ্গবন্ধুর সরকারকে বিপর্যস্ত করতে সদা তৎপর ছিল। তবুও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ ঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছিল। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৭৩ ডলার থেকে ২৭৩ ডলারে নিয়ে গিয়েছিলেন, মূল্যস্ফীতি অর্ধেকে নামিয়ে এনেছিলেন এবং দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মাধ্যমে আরো ব্যাপকভিত্তিক ইতিবাচক পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ফলে বহু বিশেষজ্ঞের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু তাঁর বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের 'এক্সপ্রেস ওয়ে'তে তুলে দিয়েছিলেন। এত অল্প সময়ে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত ক্ষুদ্র অর্থনীতির এমন করে ঘুরে দাঁড়ানোর ঘটনা ইতিহাসে নিতান্ত বিরল। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর জনগণের কাছ থেকে শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশের সে অগ্রযাত্রা রুখে দিয়েছিল। অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের উল্টো পথে যাত্রা শুরু হয় তারপর থেকে। মাথাপিছু আয়কে আবার ১৯৭৫-এর পর্যায়ে নিতে লেগে গিয়েছিল আরো তেরোটি বছর।

আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অভিযাত্রা পরের দুই দশকে মন্থর হতে হতে প্রায় থেমে গিয়েছিল। বহু বাধা ডিঙিয়ে ১৯৯৬-এ দেশ আবার সঠিক পথে ফেরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা আমাদের মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। মাঝখানে ছেদ পড়লেও বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কাজ তিনি আবার শুরু করেন ২০০৯ সালে। আর তার পর থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার গতি তো যেন কল্পনাকেও হার মানিয়েছে! 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। এর মধ্যেই আমরা এই অগ্রযাত্রার সুফল দেখতে পাচ্ছি। মাথাপিছু আয় তিন গুণেরও বেশি বেড়েছে, রিজার্ভ বেড়েছে ছয় গুণের বেশি, রেমিট্যান্স তিন গুণ হয়েছে, আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি, এবং পদ্মা সেতুর মতো বেশ কয়েকটি মেগা অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে আছি যেগুলো আমাদের অগ্রযাত্রার গতি আরো বাড়িয়ে দেবে। বৈশ্বিক মহামারির কারণে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কিছুটা হোঁচট খেলেও আমরা অধিকাংশ দেশের চেয়ে ভালোই করছি। বিপর্যয় মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়ার যে মানসিকতা বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে বুনে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার জোরেই আমরা লড়াই করে এগিয়ে যেতে পারছি। আমাদের চিন্তায় ও কর্মে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি ও অবদান তাই কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবি শামসুর রাহমানের লেখা 'ধন্য সেই পুরুষ' কবিতাটির কয়েকটি পঙক্তি দিয়ে শেষ করছি–

'ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে
চিরকাল, গান হয়ে
নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা; যাঁর নামের ওপর
কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া,
ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের ওপর পাখা মেলে দেয়
জ্যোৎস্নার সারস,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।'

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

ভালোবাসার বাংলাদেশ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১.

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ সিদ্দিক সালিক তাঁর লেখা 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বইটিতে ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের ঘটনাটি এভাবে লিখেছেন : "...জেনারেল টিক্কা খানের হেডকোয়ার্টারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি তেজোদ্দীপ্ত স্লোগান শুনতে পাচ্ছি। কিছুক্ষণের মাঝেই সেই 'জয় বাংলা' স্লোগান ছাপিয়ে রাইফেলের গুলির শব্দ ভেসে আসে। তারপর আসে অটোমেটিক রাইফেলের কর্কশ শব্দ, সর্বশেষে থেমে থেমে লাইট মেশিনগানের আওয়াজ। পনেরো মিনিট পর মানুষের কলরব আর শোনা গেল না, স্লোগানও থেমে গেল। মারণাস্ত্রের কাছে দীপ্ত স্লোগান হার মেনেছে...আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরবর্তী চার ঘণ্টা সেই বিভীষিকাময় দৃশ্যটি দেখেছি। সেই ভয়ংকর রাত্রিটির অন্যতম বৈশিষ্ট্যটি ছিল আকাশছোঁয়া আগুনের লেলিহান শিখা, মাঝে মাঝেই কালো ধোঁয়া কুণ্ডুলী পাকিয়ে উঠছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের শিখা সেটাকে ছাপিয়ে মনে হচ্ছিল বুঝি আকাশের নক্ষত্রকে ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। আকাশের নক্ষত্রের আলো আর চাঁদের জোছনা সেই রাতে মানুষের তৈরি অগ্নিকুণ্ডের কাছে হার মেনেছিল।... মনে হলো বুঝি নরকের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।..."

'সেই রাতে প্রথম বুলেটটি যখন গর্জে উঠেছিল তার পরপরই পাকিস্তান রেডিওর কাছাকাছি তরঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠস্বর আবছাভাবে শোনা যায়। সেটি নিশ্চয়ই আগে থেকে রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর–শেখ মুজিব সেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করেছেন...।'

২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর পৃথিবীর একটি নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড আর ধ্বংসলীলা চলাকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক একটি ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। বাংলাদেশ নামে সেই অসহায় শিশুটি তখন রক্ত-ক্লেদে মাখা, হিংস্র পশুরা তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার জন্য ছুটে আসছে, তার চারপাশে বৈরী পরিবেশ, অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্ক। শুরু হলো সেই অসহায় নবজাতককে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম, শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ।

২.

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসের ইতিহাস ছিল এই দেশের মানুষের গভীর একটি আত্মত্যাগের ইতিহাস, অবিশ্বাস্য সাহস ও বীরত্বের ইতিহাস এবং বিশাল একটি অর্জনের

ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়ে পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। সেই গণযুদ্ধে এই দেশের মাটিতে যুদ্ধ করছে কৃষক-শ্রমিক ছাত্র-জনতা, দেশের সেনাবাহিনী, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, দেশের পাহাড়ি ও আদিবাসীরা। মুক্তিযোদ্ধাদের গায়ে কাপড় নেই, পায়ে জুতা নেই, পেটে খাবার নেই, হাতে আধুনিক অস্ত্র নেই, এমনকি যুদ্ধ করার পূর্বপ্রশিক্ষণ পর্যন্ত নেই। সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ বলে দিয়েছেন, যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে তাদের প্রশিক্ষণ! শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল দেশের জন্য গভীর ভালোবাসা। সামনাসামনি যুদ্ধে যাওয়ার আগে যখন তারা অস্ত্র হাতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গায় তখন তাদের চোখে কেন পানি চলে আসে তারা বুঝতে পারে না।

যাঁরা স্বচক্ষে মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন এবং যাঁরা অংশ নিয়েছেন তাঁরা এখন একজন একজন করে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আর কয়েক বছর পর তাঁদের কেউ হয়তো বেঁচে থাকবেন না। মুক্তিযুদ্ধটা তখন বেঁচে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। কেউ যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবে তখন তারা হয়তো কিছু সংখ্যা উচ্চারণ করবে : ত্রিশ লক্ষ শহিদ, চার লক্ষ ধর্ষিতা নারী, এক কোটি শরণার্থী, সাড়ে তিন কোটি ঘরহারা মানুষ–যেকোনো হিসাবে সংখ্যাগুলো বিশাল, বিশেষ করে যখন পুরো ব্যাপারটি ঘটেছে মাত্র ৯ মাসে। লন্ডন টাইমস সঠিকভাবেই লিখেছিল, 'যদি রক্তের দামে স্বাধীনতা কিনতে হয় তাহলে বাংলাদেশ থেকে বেশি মূল্যে কেউ স্বাধীনতা কেনেনি'! 'রেপ অব নানকিং'-এর লেখক আইরিশ চ্যাং তাঁর মাতৃভূমির হত্যাযজ্ঞের কাহিনি লিখে বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। আইরিশ চ্যাংয়ের ভাষায়, পৃথিবীতে নানকিং ছাড়া আর যে স্থানে ভয়ংকর রকম নারী ধর্ষণ হয়েছিল, সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ। কিন্তু এই সংখ্যাগুলো শুধু পরিসংখ্যানের জন্য সংখ্যা নয়, এর প্রতিটির পেছনে একটি করে হৃদয়বিদারক কাহিনি আছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে রাইফেলের কালো নলের দিকে একজন মানুষ যে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই দৃষ্টি যে দেখেছে, সেটি কি কখনো তার স্মৃতিতে এতটুকু ম্লান হবে? ধর্ষণকালীন একটি মেয়ের আর্তচিৎকার যে শুনেছে, সে কি সেটি কখনো ভুলতে পারবে? শরণার্থী শিবিরে মায়ের কোলে যে শিশুটি কলেরায় মারা গেছে, সেই মা কি কখনো তাঁর সন্তানের ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি থেকে মুক্তি পাবেন? আজ থেকে এক-দুই দশক পর সেই দুঃসহ কাহিনিগুলো বলার মতো কেউ থাকবে না–এগুলো তখন শুধু তথ্য হিসেবে ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে আমাদের দেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। সেই দিনটি থেকে আনন্দের দিন আমাদের জীবনে কখনো আসেনি। একই রকম আনন্দের দিন ছিল জানুয়ারির ১০ তারিখ, যেদিন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এসেছিলেন। একটি মানুষ যে আসলে একটি দেশ হতে পারে, সেটি সেদিন পৃথিবীর মানুষ অবাক হয়ে

দেখেছিল। স্বাধীনতার পর আমরা যখন আমাদের দেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখছি তখন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'এই দেশটি হচ্ছে তলাবিহীন ঝুড়ি'। অবাক হওয়ার কিছু নেই, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মাঝে হেনরি কিসিঞ্জার ছিলেন অন্যতম, ক্রিস্টোফার হিচেনস তাঁর লেখা 'দ্য ট্রায়াল অব কিসিঞ্জার' নামের বইটিতে এই মানুষটিকে বাংলাদেশের গণহত্যার একজন কারিগর হিসেবে বিচারের দাবি করেছেন!

অস্বীকার করার উপায় নেই দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্রের মূল্য আমাদের কম দিতে হয়নি, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হারানোতেও শেষ হয়নি, এই দেশে প্রায় দুই যুগ বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যে মানুষটি এই দেশের সাথে সমার্থক তাঁর অবদান না জেনে এই দেশে কয়েকটি প্রজন্ম বড় হয়েছে। আমাদের অনেক বড় সৌভাগ্য বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বের কারণে জন্মশতবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু আবার তাঁর স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল হয়েছেন।

৩.

হেনরি কিসিঞ্জারকে ভুল প্রমাণ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি যথেষ্ট শক্ত হয়েছে। দরিদ্র দেশের উদাহরণ দিতে হলে এখন কেউ আমাদের দেশের উদাহরণ দেয় না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যখন নিজের দেশকে সুইজারল্যান্ড বানানোর স্বপ্ন দেখেন তখন তাঁর সাংসদরা তাঁকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেশ নিয়ে তাঁর দেশকে বাংলাদেশ তৈরি করার পরামর্শ দেন। আমাদের জিডিপি ভারতবর্ষের জিডিপিকে ছাড়িয়ে গেলে তাদের বুদ্ধিজীবীরা যখন মাথা চাপড়ান সেটি দেখে আমরা যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করি। শ্রীলঙ্কা বিপদগ্রস্ত হলে বাংলাদেশ তাদেরকেও বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে অর্থ সাহায্য করতে পারে। দুর্নীতির অপবাদ দিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যখন বাংলাদেশকে হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বঙ্গবন্ধুকন্যা তখন তাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজের অর্থায়নে পদ্মা সেতু তৈরি করেছেন। তথাকথিত সভ্য দেশ যখন তাদের নিজ হাতে তৈরি শরণার্থীদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য তাদের সীমানায় কাঁটাতার আর বৈদ্যুতিক তার লাগিয়েছে তখন আমরা তেরো লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছি।

কিন্তু দেশের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, সেটি সত্যি নয়। সাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পুরো পৃথিবীর অর্থনীতিতে একটি ধস নেমেছে, আমরা এর মাঝেই তার ধাক্কা অনুভব করছি। করোনার কারণে অসংখ্য মানুষ দরিদ্র হয়েছে, তারা এখন তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতেই হিমশিম খাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার পেছনে রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা কিছু ব্যবসায়ীর দুর্নীতি। দরিদ্র মানুষগুলো অসহায়, কার কাছে যাবে বুঝতে পারে না। সরকারকে এখনই তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে, সে জন্য সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে আছে।

সব কিছুর পরেও নিজ দেশকে নিয়ে গর্ব করার মতো আমরা অনেক কিছুই খুঁজে পেতে পারি। কিন্তু একই সাথে এই কথাটিও সত্যি শিক্ষা এবং গবেষণার

মতো বড় কিছু বিষয় এখনো আমাদের কাছে অধরা রয়ে গেছে। স্কুল-কলেজের মুখস্থনির্ভর, পরীক্ষানির্ভর, কোচিংনির্ভর, গাইড বইনির্ভর নিরানন্দ লেখাপড়া পদ্ধতি পাল্টে আনন্দময় পরিবেশে সত্যিকারের সৃজনশীল লেখাপড়া শুরু করার প্রক্রিয়াটিও শুরু হয়েছে। আমরা তার সাফল্যটিও দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

শিক্ষা এবং গবেষণা একে অন্যের হাত ধরে এগিয়ে যায়। পৃথিবীর নানা দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয় নানা গবেষণাগারে আমাদের অসংখ্য গবেষক-বিজ্ঞানী কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের দেশে এখনো গবেষণার কালচারটি গড়ে ওঠেনি। করোনার মহামারির সময় আমাদেরকে টিকার জন্য বাইরের দুনিয়ার দিকে হাত পেতে থাকতে হয়েছিল, আমরা কিউবার মতো নিজেদের টিকা নিজেরা উদ্ভাবন করতে পারিনি। আমাদের এখনো লজ্জায় মাথা কাটা যায় যখন দেখি মূলত গবেষণায় পিছিয়ে আছি বলে পৃথিবীর প্রথম কয়েক হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে আমাদের দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়েরও নাম নেই! এ রকমটি হওয়ার কথা ছিল না, বাংলাদেশের এই রূপটি আমাদের তীব্রভাবে ব্যথাতুর করে। প্রয়োজন হলে 'জাম্প স্টার্ট' করেও গবেষণার বিষয়টি নিশ্চিত করার সময় চলে এসেছে।

আগে হোক, পরে হোক আমাদের শিক্ষা এবং গবেষণার বিষয়টি নিশ্চয়ই একদিন দাঁড়িয়ে যাবে, কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের সবার ভেতরে একটা চাপা উৎকণ্ঠা, সেটি হচ্ছে এই দেশে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান।

৪.

গত দুর্গাপূজার সময় কুমিল্লায় যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা যেকোনো হিসাবে যথেষ্ট দুঃখ এবং লজ্জার একটা বিষয় ছিল, কিন্তু তারপর সেটা যত দ্রুত দেশের অন্য অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, সেটি হচ্ছে সত্যিকারের আতঙ্কের বিষয়। সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের দেশের বড় একটা জনগোষ্ঠীর ভেতর সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব এক ধরনের অসুস্থতার মতো ছড়িয়ে গেছে। সামাজিক নেটওয়ার্ক নামে মানুষের কলুষিত চিন্তাকে সবার মাঝে উন্মুক্ত করে দেওয়ার যে প্ল্যাটফর্ম দাঁড়িয়ে গেছে সেখানে চোখ বোলালেই মানুষের এই বিপজ্জনক রূপান্তরটি চোখে পড়ে। এই দেশের সংখ্যালঘু মানুষদের যদি আমরা জিজ্ঞেস করি এই পরিবেশে তারা কেমন আছে–আমার ধারণা, তারা গভীর বেদনা নিয়ে বলবে যে তারা ভালো নেই। অর্থনৈতিক সূচক বা উন্নয়নের মাপকাঠি যা-ই বলুক না কেন, যে দেশে সংখ্যালঘুরা ভালো থাকে না, সে দেশটিই আসলে ভালো থাকে না। নিজ থেকে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না, সমস্যাটাকে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে এর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

যারা ইতোমধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হয়ে আছে তাদের নিয়ে কিছু করার আছে কি না জানা নেই, কিন্তু নতুন প্রজন্মকে কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে কলুষিত হতে দেওয়া যাবে না। নিজের ধর্মকে ভালোবাসতে শেখানোর আগেই তাদের অন্য সকল ধর্মের জন্য সম্মানবোধ শেখাতে হবে। তাদের বোঝাতে

হবে যে সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল ভাষার মানুষের সাথে অন্য সকল মানুষের ভালোবাসা হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য এবং সবচেয়ে বড় সম্পদ।

আমাদের অনেক বড় সৌভাগ্য এই দেশে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নেতার জন্ম হয়েছিল, যিনি আমাদের এই দেশটিকে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক, সেই ১৯৫৫ সালে তাঁর রাজনৈতিক দলকে অসাম্প্রদায়িক করার জন্য দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি সরিয়েছিলেন। কাজেই আমাদের ভালোবাসার এই দেশটি যদি প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক না হয় তাহলে বঙ্গবন্ধুর প্রতি অনেক বড় একটি অসম্মান করা হবে। আমাদের ভালোবাসার এই বাংলাদেশে আমরা কোনোভাবেই বঙ্গবন্ধুর অসম্মান করতে চাই না।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক।

ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

বাঙালি মুসলমানদের ভাষা বাংলা কি উর্দু হবে–সে বিতর্ক ১৯১১ সাল থেকে দৃশ্যমান হলেও কার্যত পাকিস্তান সৃষ্টির কিছু আগ থেকেই তার তীব্রতা অবলোকন করা যায়। এই সময় বাংলার অভিজাত মুসলমান বিশেষত খাজাগজা, জমিদার-তালুকদারদের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু। তাদের অনেকেই আলীগড়ে শিক্ষা লাভ করে আভিজাত্য বজায় এবং চাষাভূষাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার অভিপ্রায়ে বাঙালি মুসলমানদের ভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষেই ওকালতি করে আসছিল। তার বিপরীতে সৈয়দ নওয়াব আলী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, রেনেসাঁ সোসাইটি এবং সলিমুল্লাহ হলের সাহিত্য সম্মেলন থেকে বাংলাকে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উচ্চারিত। ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করলে ভাষা বিতর্ক ক্রমে আন্দোলনে রূপ নিতে থাকে।

১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম সভায় গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বসলেন যে এ দেশের মানুষের পরিচয় মুসলমান বা হিন্দু নয়, তাদের পরিচয় হবে 'পাকিস্তানি'। জিন্নাহর এই বক্তব্যের কিছুদিন পর, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচিতে পাকিস্তান এডুকেশনাল কনফারেন্স থেকে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জোরালো দাবি জানানো হয়। বাংলাভাষী বা বাংলা অঞ্চলের বসবাসকারী তথাকথিত বিশিষ্টগণের কেউ কেউ তাতে সমর্থনও দিলেন। এটাকে ভিত্তি ধরে সাধারণ মানুষের মতামতকে তোয়াক্কা না করে কেন্দ্রের কাজকর্মে, পোস্ট কার্ড, মানি অর্ডার ফরম ইত্যাদিতে উর্দুর প্রচলন হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গে কর্মরত মোহাজের ও অতিউৎসাহী দেশীয় কর্মচারীরা শুদ্ধ-অশুদ্ধ উর্দুতে 'বাতচিত' এবং চাষাভূষা ও শিক্ষিত বাঙালিদের প্রতি নাক সিটকানো শুরু করে। এত দ্রুত উর্দুর দাবিকে কার্যকরী করা ও 'পাকিস্তানি' জাতি সৃষ্টির সাথে নিশ্চয়ই একটি যোগসূত্র ছিল। যোগসূত্রটি হচ্ছে জিন্নাহকে মুসলমান জাতির পিতা হিসেবে গ্রহণে অপারগতা। কারণ মুসলমান জাতির পিতা হলেন হজরত ইব্রাহিম (আ.)। মুসলমান জাতির পিতা হতে পারেন না বলে চতুর জিন্নাহ তাৎক্ষণিক পাকিস্তানি জাতিসত্তার প্রবক্তা হয়ে এই জাতিসত্তার সাধারণ ভিত্তি

সৃষ্টির প্রয়াসে 'উর্দু' নামক একটি ভাষাকে পাকিস্তানের সব মানুষের ভাষা বানাতে প্রয়াসী হন।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে; যার প্রতিবাদ করেন নীলক্ষেতে বসবাসকারী বাংলাভাষী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীগণ। পূর্ব-পশ্চিমের আর্থিক বৈষম্যও তখন উচ্চারিত হতে শুরু করে। কার্যত সে মাসেই ঢাকাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে দাবিনামা পেশ করেন। ডিসেম্বর মাসজুড়ে সভা ও সমাবেশ হতে থাকে, যার সাথে মাওলানা আকরম খাঁ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ একাত্মতা প্রকাশ করেন। এই মাসেই তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবি পেশ করলেন। এর পর থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে বিভিন্ন নামে সংগ্রাম পরিষদের কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মুসলিম ছাত্রলীগের জন্ম হলে তারাও ভাষার প্রশ্নে এক ধরনের চরমপন্থি ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উত্থাপিত বাংলা ভাষাকে সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার দাবি পাকিস্তানিদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হলে তা পূর্ববঙ্গের কতিপয় শিখণ্ডী ছাড়া বলতে গেলে সর্বস্তরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

পরিষদের বাইরে কিন্তু এই বিতর্ক আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। একে কেন্দ্র করে ছাত্র গণবিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করলে ২৯ ফেব্রুয়ারি অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১১ মার্চ ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত এই ১১ মার্চ 'ভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হতো। ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় আবারও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভিন্নরূপে ভাষার প্রশ্নটি নিয়ে আসেন। তিনজন হিন্দু সদস্য ও ৯ জন মুসলমান সদস্য ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন। 'বাংলা পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা' হিসেবে আনীত প্রস্তাবটিও মুসলিম লীগের কারণে গৃহীত হলো না।

১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গ সফরে এসে মি. জিন্নাহ একুশে মার্চ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে 'উর্দু এবং উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে' বলে দম্ভোক্তি করেন। ভাষাসংগ্রামকে তিনি তদানীন্তন পূর্ববঙ্গকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির আন্দোলন বলে অস্পষ্ট ইঙ্গিত রাখেন। ১৯৪৮ সালের ২৮ মার্চ ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে মি. জিন্নাহ উর্দুর প্রশ্নে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। পরবর্তীতে ঘরে-বাইরে বৈরিতার শিকার হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন লিয়াকত আলী-নাজিমুদ্দিনদের পোয়াবারো।
ভাষা আন্দোলনে ১৯৪৯-৫২ বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সময়ের মধ্যে আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। তখন কতিপয় বাঙালির উদ্যোগেই উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা কিংবা ভাষাকে পাকিস্তানীকরণের প্রয়াস জোরদার হয়। ২৭ জানুয়ারি ১৯৫২ সালের পল্টনের জনসভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নাজিমুদ্দিন কর্তৃক উর্দুই

হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পূর্ণ ঘোষিত হলে ঢাকা শহরের বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষ আন্দোলনে অধিক হারে সংযুক্ত হতে থাকে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শিক্ষার্থীরা ধর্মঘটে যোগ দিলে পুলিশের গুলিতে সেদিন ও পরবর্তী দিনগুলোতে ছাত্র-জনতা হত্যার প্রেক্ষাপটে আন্দোলনের ব্যাপকতা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর আন্দোলন স্তিমিত হলেও থেমে থাকেনি, যার প্রতিফলন ঘটে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব নির্বাচনী বিজয় দিয়ে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের কালেই ২১ ফেব্রুয়ারিকে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। তার পরও ষড়যন্ত্র থেমে ছিল না, যার প্রতিফলন বহু কিছুতে ঘটেছে।

১৯৪৯ সালের ১৪ আগস্ট থেকে লিয়াকত আলী ও নাজিমুদ্দিনের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় বহুমাত্রায় বেড়ে যায়। বাংলা ভাষাকে মুসলমানীকরণ ও সরলীকরলের প্রচেষ্টা ও তাকে রোমান হরফে লেখার প্রস্তাবের ভেতর দিয়ে কৌশলে তার বিলুপ্তি প্রচেষ্টাটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯৫২ সালের ২৮ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন কর্তৃক জিন্নাহর মতোই উস্কানিমূলক বক্তব্যের রেশ ধরে ৩০ জানুয়ারি আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' গঠিত হয়, যা পরবর্তীতে গোলাম মাহবুবের নেতৃত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' নামে আবির্ভূত হয়। সে বছর ১১ মার্চ ভাষা দিবস পালনের প্রস্তুতিকালে সরকার, সরকারি দল মুসলিম লীগ এবং সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলো অতিশয় বৈরী অবস্থান গ্রহণ করে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের নেতৃত্বে আন্দোলনকারীদের ভারতের দালাল, হিন্দুর চর, কমিউনিস্ট এবং পাকিস্তান ও মুসলমানদের শত্রু আখ্যায়িত করে নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানে হয়। এই পর্বে তথাকথিত ভাষাসৈনিকদের কেউ নিষ্প্রভ বা কেউ বা বিস্মৃতির অতলে চলে যান এবং অবস্থা বেগতিক দেখে পাকিস্তানি প্রভুদের কোলে আশ্রয় নিতে শুরু করে। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের শিখাটি যারা প্রজ্বলিত রেখেছিল তারা হলো আওয়ামী লীগের মতো মধ্যমপন্থিরা বা বামপন্থিরা। তবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন-পরবর্তী অভিজ্ঞতা, ৯২ (ক) ধারা, ইস্কান্দার-আইয়ুবের সামরিক শাসন, জাতিগত নিপীড়ন, শ্রেণিগত বৈষম্য এবং পাকিস্তানি বশংবদ সৃষ্টির ঘৃণ্য অপকৌশলের উলঙ্গ প্রয়াস ভাষা আন্দোলনকারীদের একাংশকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূতিকাগার হলেও তার চরিত্র বদলাতে থাকে এবং ১৯৬৬ সালের দিকে বাঙালি ধারার একাংশ সম্পূর্ণ পাকিস্তানবিরোধী ও স্বাধীনতাপ্রত্যাশী হয়ে দাঁড়ায়। এর পর থেকে প্রতি বছর একুশের চেহারা ও চেতনা বদলে যেতে থাকে।

১৯৬৯ সালে এসে ভাষা আন্দোলন আর ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১১ দফা আন্দোলন ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি ধারা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে ১৯৭১ সালে মাটির অধিকার আন্দোলনে বাম-মধ্যমদের বিভক্তির নিরসন টেনে হাজার বছরের বিশাল অর্জন স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনে। ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী ইতিহাসের এই নাতিদীর্ঘ বর্ণনা একটি কথাকে স্পষ্ট করে যে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার বিভিন্ন লক্ষ্য ছিল। ভাষা আন্দোলনের যে ধারাটি এটাকে একটি End itself হিসেবে বিবেচনা করেছিল, তারা বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির পর তার প্রয়োগ ও উৎকর্ষের কাজে হাত দেয়। রেনেসাঁ সোসাইটি ও তমদ্দুন মজলিসকে এই দলে ফেলা হয়। তারা পাকিস্তানের কাঠামোতে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানের ভাষা বাংলাকে সংস্কৃতের কবল থেকে উদ্ধার করে আরবি ফারসি উর্দু দিয়ে সমৃদ্ধ করতে চায়। তাদের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞানীর সামগ্রিকতা অনুপস্থিত ছিল। এদের কাছাকাছি কিছু ব্যক্তি বন্ধু বেশে ভাষা আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য কারো এজেন্ট বা পোষ্য হিসেবে অবস্থান করে। তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও তাদের তস্য দালাল পাকিস্তানের গুপ্তচর হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। ভাষা আন্দোলনের আর একটি স্রোত আন্দোলনটিকে একটি means হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের একটি উপধারা পাকিস্তানের সকল জাতিসত্তার সাবলীল বিকাশে ভাষার ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে একটি মানবিক পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখত। নিঃসন্দেহে গোপন কমিউনিস্ট পার্টি বা যুবলীগ পরবর্তীতে ন্যাপ ছাত্র ইউনিয়ন এবং সেকালের গণতন্ত্রী পার্টি এই উপধারায় ছিল। তারা পাকিস্তানের প্রতিটি জাতিসত্তার অস্তিত্বসহ তাদের স্বতন্ত্র ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাই তারা বাংলাকে পূর্ব বাংলার এবং উর্দুকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা না বলে সব জাতিসত্তার ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবি জানায়।

এ দুটো স্রোত বাদ দিলে ভাষা আন্দোলনকারী শক্তির একাংশ প্রথম থেকেই একে একটি চূড়ান্ত গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশী ছিল। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগের একাংশের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। প্রথমদিকে সোহরাওয়ার্দী, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান প্রমুখের প্রচণ্ড দাপটে তারা মনের কথাটি প্রকাশ করতে পারেনি। তবে ক্রমে উপরিউক্ত উপধারাটা বাস্তবতা ও তারুণ্যের আঘাতে দুর্বল হয়ে যায়, শেখ মুজিবের নেতৃত্ব মেনে নেয় বা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ন্যাপের কিয়দংশও প্রকাশ্যে বা গোপনে তাঁর সাথে স্থান খুঁজে নেয়।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাঙালি যে ধারাটির কথা বললাম তা বাস্তবতার কশাঘাতে উপলব্ধি করেছিল যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তাদের নিজস্ব পরিচিতি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক মানবিক জীবনবোধ ও শোষণহীন সমাজ স্বপ্ন বাস্তবায়ন অসম্ভব। তাই ৬ দফা ও ১১ দফাকে সামন্তরাল রাখলেও প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি এক দফার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিহাস বলছে যে

বঙ্গবন্ধু এই অগ্রযাত্রায় তার এককালের সহকর্মী এবং পরবর্তীতে ভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানকারীদের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় একাকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্বাধীনতাই ছিল বঙ্গবন্ধুর ধ্যান-জ্ঞান, সাধনা ও কর্মযজ্ঞ

আমাদের জাতির মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রাবস্থায় পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তবে সেই পাকিস্তান ছিল লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তান যেখানে অন্তত পূর্বাংশে এবং পশ্চিমাংশে একটি করে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র থাকবে বলে সিদ্ধান্ত ছিল। পূর্বাংশে যাতে যুক্ত বাংলা থাকতে পারে তার চেষ্টাও কেউ কেউ করেছিলেন যদিও মি. জিন্নাহ ও মি. জওয়াহের লাল নেহেরুর পরোক্ষ বিরোধিতার কারণে এই উদ্যোগ ব্যাহত হয়। তবে লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে দিল্লি প্রস্তাবভিত্তিক পূর্ব ও পশ্চিমাংশ মিলিয়ে এককেন্দ্রিক পাকিস্তান সৃষ্টির কারণেই অনেকের সাথে শেখ মুজিব আশাহত হলেন। বেদনাহত হয়ে মূলত সেদিন মানে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে তিনি বাঙালিদের উপযোগী একটি ভৌগোলিক সত্তা সৃষ্টির কথা চিন্তা করেন।

শেখ মুজিব নবসৃষ্ট পাকিস্তানে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে ভর্তি হন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল একটি মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি হয়। এই লক্ষ্যে তিনি প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের গোড়াপত্তন ঘটালেন। এমনকি গণতান্ত্রিক যুবলীগ নামক একটি যুব সংগঠনে তিনি যুক্ত হলেন। উভয় সংগঠন ছিল জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, শোষণহীন ও গণতান্ত্রিক চেতনার ধারক।

তবে ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয়বারের মতো তাঁর ধারণায় গভীর চিড় ধরল। বাধ্য হয়ে তিনি ভাষা আন্দোলনে শরিক হলেন এবং কারাবরণ করেন। তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায়ই আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিয়োজিত হলেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে তিনি জেলে ছিলেন, কিন্তু সেদিনটির সফলতার মূলে রাজবন্দি শেখ মুজিবের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ভাষা বিতর্কের মধ্যে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' জাতীয় স্লোগানের পাশাপাশি 'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই', জাতীয় একটা বোধ তাঁকে নাড়া দিতে থাকে। সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যায় যে শেখ মুজিব ১৯৫৪ সাল থেকে জামালপুরে গঠিত বাংলাদেশ যুক্তফ্রন্টকে বৈষয়িক, তাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক সাহায্য দিয়ে এই লক্ষ্যে এগোচ্ছিলেন।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে, সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর প্রিয় নেতা ছিলেন শেখ মুজিব। যুক্তফ্রন্টের শাসনামলে তিনি মন্ত্রিত্ব পেয়ে অনেকটা পদ-প্রদীপের আলোতে উদ্ভাসিত হচ্ছিলেন। মন্ত্রিত্ব ছেড়ে এ পর্যায়ে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যার মতলবটা ছিল সুস্পষ্ট। ওই অবস্থান থেকে দলটাকে স্বাধীনতাসংগ্রাম উপযোগী করে গড়ে তোলার নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ তিনি লাভ করলেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনোত্তর ঘটনাপঞ্জি বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের সিভিল ও মিলিটারি আমলা নির্ভরশীলতা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ তাঁকে আবারও নতুন

ভাবনায় ফেলে দিল। অস্থায়ী সংবিধানের ৯২(ক) ধারার যথেচ্ছ প্রয়োগ কিংবা রাজনীতিবিদ ও রাজনীতিকে কলঙ্কিত করার নেপথ্যের প্রয়াসও তিনি অবলোকন করলেন। স্মরণীয় যে ১৯৫৫ সালে মুজিব পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তান শব্দটির পরিবর্তে পূর্ববঙ্গ কথাটি ব্যবহারের দাবি জানান।

১৯৫৬ সালের অগ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র কিংবা সিয়াটো সেন্টোর ন্যায় সামাজ্যবাদী শক্তির সাথে গাঁটছাড়া ও কর্তৃত্ববাদী পাকিস্তানি শাসন মেনে নেওয়ার মাঝেও শুভদিনের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর থেকে সেনাপ্রধান আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে সে আশাও দুরাশায় রূপান্তরিত হয়। এই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব বিকল্প গন্তব্য খুঁজতে শুরু করেন।

সেনাশাসনের মধ্যেই ১৯৬১ সালের কোনো এক সময়ে তিনি পূর্ববঙ্গ মুক্তি ফ্রন্টের (ইবিএলএফ) ছত্রচ্ছায়ায় একটি লিফলেট বিতরণের ব্যবস্থা করেন, যা ছিল তাঁর ১৯৫৪ সালের প্রয়াসের সম্প্রসারিত ও সমন্বিত রূপ। বর্ণিত লিফলেট বিতরণের কিছুদিন পরই দলের গণ্ডি ছাড়িয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহ ও খোকা রায়ের কাছে স্বাধীন বাংলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। মণি সিংহ ও খোকা রায়ের সাথে আলোচনার পূর্বে শেখ মুজিব ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে গোপনে আগরতলা গিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওয়াহের লাল নেহেরু থেকে তেমন কোনো প্রতিশ্রুতি পেতে ব্যর্থ হলেও শেখ মুজিব একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে কথাবার্তা চালাতে থাকেন। শেখ মুজিব দেশে ফেরত এসে গ্রেপ্তার হন এবং মুক্তি পেয়ে ১৯৬৩ সালের শিক্ষা আন্দোলন ও ১৯৬৪ সালের সমাবর্তনবিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন জোগান।

১৯৬৩ সালেও তিনি আগরতলা গিয়েছিলেন এবং নেহেরুর সম্মতি পেয়েছিলেন বলে প্রকাশ। পরিকল্পনা ছিল নেহেরুর সম্মতি পেলে তিনি ব্রিটেনে গিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন এবং তাঁর অনুসারীরা ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করবেন। তিনি ১৯৬৩ সালে গঠিত অপূর্ব সংসদের পৃষ্ঠপোষক ছাড়াও পুনর্গঠিত বিএলএফ ও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কার্যক্রম চাঙ্গা করেন। এই সময়ে তিনি দেশ স্বাধীন হলে তাঁর জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'কে নির্ধারণ করে দেন। রবীন্দ্রনাথের এই গানটি তিনি প্রায়ই গুনগুন করে গাইতেন এবং এটাই যে জাতীয় সংগীত হবে তা নিকটস্থদের জানিয়ে দেন।

তারপর ১৯৬৪ সালে সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর একদল স্বাধীনতাপন্থি কর্মকর্তাদের সংস্পর্শে এসে তাদের প্রয়াসের প্রতি সমর্থন জানালেও একপর্যায়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে এসব সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হলেও গণতন্ত্র বা শোষণহীন সমাজ পত্তন অধরা থেকে যাবে। এই উপলব্ধির কারণে তিনি আওয়ামীপন্থিদের তথাকথিত সেনা অভ্যুত্থান থেকে বিরত রাখেন। ১৯৬৪ সালে তিনি গোপনে কংগ্রেস সভাপতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে স্বাধীনতার পরিকল্পনা নিয়ে যোগাযোগ করেন। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কালেও তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন না।

শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখাস্বরূপ ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ৬ দফা দাবি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর মাধ্যমে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও অন্তিমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম সত্তা সৃষ্টিও সম্ভব। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবি পেশের পূর্বে শেখ মুজিব ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ্যের মাধ্যমে ভারতের সরকার ও ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সংযোগের নতুন দ্বার উন্মোচন করেন।

৬ দফাকে কবর দেওয়ার মানসে আইয়ুব খান তাঁকে ও তাঁর দলের অধিকাংশ শীর্ষ নেতাদের জেলে প্রেরণ করেন এবং আওয়ামী লীগকে কার্যত বিলোপ করার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তদুপরি ১৯৬৪ সালের সশস্ত্র অভ্যুত্থান আকাঙ্ক্ষি ৩৪ জনের সাথে শেখ মুজিবকে ১ নম্বর আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনে আইয়ুব সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং পূর্ব বাংলার জনগণ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। এই সময় ৬ দফায় ঘোষিত এক লাখ প্যারামিলিমিশিয়া গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। শেখ মণি ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুর আগে জেল থেকে মুক্তি পেয়েই বিএলএফ পুনর্গঠনে মেতে ওঠেন। ১৯৬৯ সালের ১১ দফা আন্দোলনটি ছিল রূপান্তরিত ৬ দফা আন্দোলন। মুক্তিলাভের পর বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ধারা ও সমান্তরাল সশস্ত্র ধারার কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। ১৯৬৯ সালের শেষভাগে চিকিৎসার নামে লন্ডনে গমন করেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি ইন্দিরাকে তাঁর চূড়ান্ত অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করলে ইন্দিরা স্বাধীনতাকামীদের ভারতে প্রশিক্ষণ, অর্থায়ন, অস্ত্র সম্ভার প্রদান ও প্রচার সুবিধার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এই পর্যায়ে চিত্ত সুতারকে যোগসূত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭০-এর নির্বাচনে ভূমিধস বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং মার্চে ইন্দিরা ভারতের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে ও পরে বঙ্গবন্ধু বেশ কয়েকবারই প্রকাশ্য ইঙ্গিত দেন যে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। নির্বাচনের পর নির্বাচনী ও সরকার গঠনের গাইডলাইন এলএফওকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী প্রেস কনফারেন্সে জনৈক সাংবাদিকের স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি 'Not yet' বলে তাঁকে থামিয়ে দেন। জানুয়ারি ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতিগতি বুঝতে সেখানে বাংলাদেশ দূতাবাস খোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের ১৯৭১-এর ৩ জানুয়ারির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ও বক্তব্যে তিনি ৬ দফার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। তখনই বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের নাম বদলিয়ে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স রাখা হয়। এই ফোর্স কথাটির মধ্যে তার যুদ্ধ প্রস্তুতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ক্রমে বিভিন্ন নামে ও কমাণ্ডে বিভক্ত বিভিন্ন বাহিনী একটি কেন্দ্রীয় কমান্ডে নিয়ে আসার কৌশল হিসেবে পুনর্গঠিত বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের (বিএলএফ) দায়িত্ব শেখ ফজলুল হক

মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদকে দেওয়া হয়। মার্চ মাসের কোনো এক সময় ডাক্তার আবু হেনাকে গোপনে চিত্ত সুতারের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রেরণ করা হয়। সব কিছু পাকাপাকি করে তিনি ফিরে আসেন। ভারতীয় হাইকমিশনের কর্তাব্যক্তিদের সাথে তাজউদ্দীন আহমদের নিবিড় পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া হয়। জহিরুল কাইয়ুমের মাধ্যমে ত্রিপুরা হয়ে আর একটি সংযোগের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভারতীয় দূতাবাসের কর্তাব্যক্তি দিল্লিতে খবর পৌঁছিয়ে আসতে আসতে ক্র্যাকডাউনের লগ্ন এসে যায়।

পাকিস্তানিদের অপারেশন সার্চলাইট শুরুর সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তারপর তাঁকে বন্দি করা হলেও যুদ্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহকর্মীদের নেতৃত্বে ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাঙালি 'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে'।

স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, ভাষা আন্দোলনের মাঝে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা বিস্ফোরিত হয় এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ও মৃত্যুঞ্জয়ী প্রয়াসে বাঙালি এগিয়ে যায়। ১৯৫২ সাল থেকে টানা ১৯ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ও সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৌশলী পরিচালনায় স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয় বটে।

নির্দ্বিধায় বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের ন্যায় একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপকার হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এর থেকে স্বাধিকার ও পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন বোধ পরিপক্বতা অর্জন করে। এরই ধারাবাহিকতায় সকল আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতেই চলে যায়। সশস্ত্র যুদ্ধের মতো চরম সিদ্ধান্তও বাঙালিকে উদ্দীপ্ত করে।

বাংলাদেশ কায়েমের পর সর্বস্তরে বাংলাকে প্রচলন সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে গৃহীত হয় এবং ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলায় বক্তৃতা দেন। ১৯৯৯ সালে শেখ হাসিনার শাসনামলে ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তারই শাসনামলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই দেখা যায়, আন্দোলন এখনো শেষ হয়নি, এখনো বাংলাকে সর্বজনীন করার দায়িত্ব রয়েছে, দায়িত্ব রয়েছে অপর ভাষাভাষীদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাকে জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে গ্রহণীয় করা। বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভাষা আন্দোলন একটা চলমান প্রক্রিয়া, তার সূচনা চিহ্নিত করা যায়; তবে তাকে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে নিগড়বদ্ধ করা অবিমৃশ্যকারিতার লক্ষণ।

লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষাবিদ।

বিজয়ের স্বপ্ন সিঁড়ি

পান্না কায়সার

কেমন করে কেটে গেল বিজয়ের ৫০টি বছর। আনন্দ আর গৌরবে আন্দোলিত হয়ে বাঙালি জাতির কত স্মৃতি ভেতরে ভাঙচুর চলে অবিরাম। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে বীর বাঙালি শত্রুমুক্ত করে, দেশকে স্বাধীন করে, বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। ত্রিশ লক্ষ বাঙালি প্রাণ দিয়েছে। মা-বোনেরা ইজ্জত হারিয়েছেন। স্বাধীনতার শরীরে দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনায় বিজড়িত। স্বাধীনতার ইতিহাসে যে মহামানবের নাম গাঁথা হয়ে আছে, তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। 'রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দিবো'। আশ্চর্য, সাহসী, আপসহীন সত্য-সুন্দর ও স্বপ্নদ্রষ্টা-অগ্নিপুরুষ জাতির পিতাকে ছাড়া বছরের পর বছর বিজয় পালন করেছি। ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণ চলে। বেঈমান খুনিরা ৩২ নম্বরে ঐতিহাসিক বাড়িতে সপরিবারে হত্যা করে যে পাপ করেছে, এ পাপ নিরবধিকাল ভোগ করেও তা মোছা যাবে না। বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন বাংলাদেশ ও বাঙালির অন্তরে। সোনার বাংলার সোনার মানুষের দুই চোখের আলোয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে বাংলার মানুষ এই দিনে তাঁকে স্মরণ করে–তাঁর আদর্শেই দেশ গড়ার শপথ নেয়। স্মরণ করি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, সুলতানা, রোজী এবং ১০ বছরের শিশু শেখ রাসেলকে।

বাংলাদেশের সৌভাগ্য বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে ছিলেন বলে বেঁচে গেলেন। ১৯৭৫-এর পরে যেভাবে ঘাতকরা ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কলঙ্কিত করেছিল। '৮১-তে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে তাঁর প্রজ্ঞা, প্রত্যয় ও চেতনার আলোই কঠিন প্রত্যয়ে আদর্শিক কৌশলের কারণেই দেশ আজ সত্য ও সুন্দরের দিকে ধাবমান। বাংলার মানুষ বিজয়ের দিনে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় পদক্ষেপ, দৃঢ় প্রত্যয়ে যে বিভায় হিমালয়ের চূড়াকেও জয় করবে। স্মরণ করি শেখ রেহানাকে, যেভাবে বড় বোন শেখ হাসিনার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে বড় বোনকে অনুপ্রাণিত করেছেন। হঠাৎ খোলা জানালা ভেদ করে ঝিরঝিরে বৃষ্টি আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল–একটি ছায়া, হাতের মৃদু স্পর্শ অনুভব করলাম। ছায়াকে ছাপিয়ে রায়েরবাজার বধ্যভূমি অস্পষ্ট ভেসে উঠল। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরে রায়েরবাজার বধ্যভূমির রক্ত, কাদামাটিতে পড়ে থাকা আমার প্রিয়জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। উল্টেপাল্টে দেখলাম কতজনকে, পেলাম না। তীরে উঠে দেবর জাকারিয়াকে নিয়ে ফিরে আসা। এ রকম আমার প্রায় হয়েছে দীর্ঘ বছর ধরে, এমনই ছায়া–হাতের স্পর্শে সামনে চলার শক্তি পাই। স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের

একটি খেলা, রায়েরবাজারের রক্তে ভেজা মাটি ছুঁয়ে কসম খেয়েছিলাম, 'আমি তোমার সঙ্গেই থাকব...আমাকে দাও সাহস।' সে-ই যে '৭১-এর বিজয়ের দিনে ঘাতকদের প্রকাশ্যে থুতু মেরে ঘৃণা ছুড়ে এসেছিলাম, আজও আর যাওয়া হয়নি। এই লাশের কাফেলার স্মৃতির চির জাগরূক থাকুক। স্মৃতির সঙ্গেই বাস আমার। সামনে চলার শক্তি আমার। বিজয়ের আনন্দের মুহূর্তে স্মৃতি কত স্মৃতি কখনো কখনো চোখের পানিতে ভিজে যায়।

কত পরিকল্পনা ছিল শহীদুল্লা কায়সারের। 'সংবাদ' পেয়ে নতুনভাবে সাজাবে। ডিসেম্বরের ৩ তারিখ রাতে মর্টার, মেশিন গান বোম্বিংয়ের শব্দে ঢাকা শহর কেঁপে কেঁপে উঠল। আমি দুই বাচ্চা নিয়ে নিচে যাব কি না, জিজ্ঞেস করতেই বলল, আর কোথাও নয়। দেখো, সংবাদের হেডলাইনগুলো। ডিসেম্বরের ৩ তারিখ সকালে জহুর হোসেন চৌধুরী ও আহমেদুল কবীর এসেছিলেন। বুঝতে পারলাম খুব জরুরি কিছু আলাপ করছেন। তিন কাপ চা নিয়ে সামনে রাখতেই মামা (জহুর হোসেন চৌধুরী) বললেন 'ভালো থেকো'। চোখ দুটি টল টল করে উঠেছিল। মামা কপালে হাত দিয়ে আমাকে সাহস দিয়ে বললেন, আমাদের দিনবদলের পালা হবে এবার। মামার কথার মর্মার্থ কিছু বুঝিনি, কিন্তু কথাটা বুঝবার ভান করে বললাম, 'মামা, আপনারা কথা বলুন–আমি আসি'। বারান্দা থেকে ঘরে আসতে আসতে চোখের ওপর ভেসে উঠল ২৭ মার্চ থেকে কত অপরিচিতজনের বাসায় আশ্রয় নিয়ে থেকেছি। এভাবে পালা বদল করে বাসা বদলে শহীদুল্লা ঘরে ফিরে আমার কপালে হাত দিয়ে বলল, তুমি দেখবে একটি স্বাধীনতা–আমি দেখব দুটো স্বাধীনতা। বাচ্চারা ঘুমালে সংবাদের হেডলাইনগুলো দেখবে, যাই আমি। ভীষণ তাড়াহুড়া করে চলে গেল পড়ার টেবিলে। ভীষণ ব্যস্ততায় কাটল দিন। বেশ কয়বার অচেনা মানুষ এলো, বারান্দায় বসে কী সব কথা বলল জানি না। ডিসেম্বরের ৩ তারিখে মধ্যরাতে শুরু হলো মর্টার, মেশিন গানের বিকট শব্দ। আমাকে নিয়ে গেল বাড়ির ছাদে। নিজের চোখে দেখলাম বোমারু বিমানের শেল। ওর সঙ্গে ২ বছর ১০ মাসের যাপিত জীবনের অল্প সময়ে গ্রাম থেকে আসা এই আমি অনেক কিছু দেখলাম। ওর হাতটা শক্ত করে ধরে মনে মনে বলতাম দেশ স্বাধীন হলে বিজয় উল্লাসের স্বাধীনতা দিবসে তোমার হাত ধরে দেশ গড়ার কাজ করব, তা হলো না। ১২ ডিসেম্বর নুরুল ইসলাম (গণতন্ত্র পার্টির সভাপতি ছিলেন) পরবর্তীতে বাসায় এলেন। তিনি মিনিট পাঁচেকের মতো ছিলেন। উনি চলে যাওয়ার পর আমি এসে দাঁড়ালাম পাশে। আমার হাতটা ধরে বলল, কাল আমাকে বাসা থেকে চলে যেতে হবে। 'কেন?' আমাকে আরো কাছে টেনে বলল–দেশ তো স্বাধীন হয়েই যাচ্ছে, কিন্তু রাজাকাররা শেষ একটা ছোবল মারবে।

আমরা বিভিন্ন বাসায় আশ্রয় নিয়ে নভেম্বরে বাসায় ফিরেছি। তবে ফিরলাম কেন? শান্তভাবে বুঝিয়ে বলল, দেশে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কি সবাই ভারতে যেতে পেরেছে? আমার প্রশ্নে বলল, বিশাল দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। খাবার, ওষুধ, কাপড়চোপড় জোগাড় করে সীমান্ত পার করা। মনে আছে, সুফিয়া খালাম্মার বাসায় গিয়ে জোগাড় করা রসদগুলো দেয়ালের ওপাশে

দিতাম। তুমি জানতে না পাশের বাড়িটি কার? আজ বলি, বাড়িটি ছিল রাশিয়ান কালচারাল সেন্টার। যারা ভারতে চলে গেছে, যাওয়ার সময় সবার রেশন কার্ডগুলো খালাম্মার কাছে দিয়ে গেছে। রসদগুলো তুলে আনার টাকা জোগাড়েও অভাব হয়নি। শোন, কাল ১৪ তারিখ কারফিউ উঠলে আমরা রওনা দেব। সব গুছিয়ে নাও। কাল যেতেই হবে। ১৪ ডিসেম্বর সকাল থেকে অপেক্ষার সময় গড়িয়ে যাচ্ছে–কারফিউ তুলে নেওয়ার কোনো ঘোষণা নেই। এভাবে সকাল, দুপুর, বিকেল। পড়ন্ত বিকেলে আমি বারান্দা পেরিয়ে নিচে যাচ্ছিলাম–হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে দেখি আমাদের বাসা থেকে একটু দূরে ৪-৫টি ছেলে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। আমি সরে দাঁড়ালাম, আমাদের আমগাছের আড়ালে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতেই দেখি আঙুল দিয়ে দুটি ছেলে আমাদের বাসার দিকে তাকিয়ে কী যেন বলছে। আমি ছুটে গেলাম ঘরে। বসার ঘরে ও বিবিসি সংবাদ শুনছে। অস্থিরভাবে পাশে বসাল–কথাটা বলতে চেষ্টা করেও পারছিলাম না। আমি উঠে যেতেই হাতটা ধরেই পাশে বসিয়ে বলল, কী ওমন কথা? সংবাদটা শুনতেই পারলাম না। বলো, কী সে কথা? আমি ঘটনাটা বলতেই ও হেসে বলল, নিশ্চয়ই এ পাড়ারই ওরা। ভয় পেয়ো না, বিচ্ছুদের এখন নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালানোর পথ পাচ্ছে না আমি ভাবলাম হয়তো বা তাই। উঠে গেলাম শোয়ার ঘরে।

শমীর জন্য শিশিতে দুধ গুললাম। দুধের শিশি টেবিলে রেখে মাগরিবের নামাজে দাঁড়ালাম। ভাবলাম শমী ঘুমাচ্ছে। এই ফাঁকে নামাজটা পড়ে ফেলি। কী আশ্চর্য নামাজে দাঁড়ানোর পর আমার কেবলি কান্না পাচ্ছিল। কাঁদতে কাঁদতে নামাজ শেষ করলাম। মোনাজাতে চোখের পানিতে ভাসলাম। কাঁদতে কাঁদতে শহীদুল্লা কায়সারের জন্য অনেক দোয়া করলাম। দোয়া চাইলাম ছোট শিশু অমিতাভ কায়সার আর শিশু শমী কায়সারের জন্য। নামাজ শেষ করে শমীর জন্য বানানো দুধের শিশি হাতে নিয়ে বললাম–চল, টুনটুনি বাবার কাছে। দুধের শিশিটা হাতে দেখে টুনটুনি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। শহীদুল্লা কায়সার আদর করে শমীকে টুনটুনি এবং অমিতাভ কায়সারকে ডাকত ভোম্বল দাস। শমীকে কোলে নিয়ে বসার ঘরে এসে দেখি অমিতাভকে সোফায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে কী যেন লিখছে। আমি নিচে সোফার ওপর বসে। আজ ১৪ তারিখ তো চলে গেল। কারফিউও উঠল না–আমাদেরও বাসা ছেড়ে যাওয়া হলো না। ওর চেহারাটা মলিন...বলল, দেশ তো স্বাধীন হয়েই যাচ্ছে। এই কথাটা শেষ না হতেই নিচ থেকে দেবর (মিয়া) এসে বলল–বড়দা, বাইরের গেট ধাক্কাচ্ছে কিছু লোক। খুলব? খোলো, শহীদুল্লা কথাটা বলেই উঠে দাঁড়াল। চাবিটা দাও। আমি বললাম, চাবি দিয়ে কী করবে? আরে মুক্তিযোদ্ধারা এসেছে। ওদের টাকা-পয়সার দরকার হতে পারে। ইশারায় আমার আঁচলটা দেখিয়ে দিলাম। দ্রুত চলে গেল শোবার ঘরে। আলমারি খোলার শব্দ। দ্রুত বসার ঘরে ফিরে চাবিটা আঁচলে বেঁধে বলল, 'কী হলো আসছে না কেন' বলতেই চারজন লোক মুখে কালো কাপড় বাঁধা। শহীদুল্লা কায়সার কে? নিজেই বলে ফেলল আমি। চারজনই দ্রুত সামনে এগিয়ে ওর হাতটা ধরে, হেঁচকা টানে

বারান্দায় যেতেই আমি শমীকে ফেলে ছুটে গিয়ে ওর আরেক হাতটাকে টেনে ধরলাম। দুধের শিশিটা ছিটকে পড়ল। সেদিন থেকে আজ অবধি শমী দুধ খায় না। বারান্দায় এসেই আমি বারান্দার বাতিটা জ্বালিয়ে দিলাম। আর চিৎকার করে ডাকছিলাম–কে কোথায় আছ? কোথাও কোনো সাড়া নেই। ঘাতক রাজাকারের দল নিচে সবাইকে আটকে রেখেছে। ওরা ওকে টানতে টানতে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এলো। আমি একজনের মুখের কালো কাপড়টা খুলে ফেলতেই আমার ননদও ছুটে এসে মুখের কাপড়টা ভালো করে খুলে চিৎকার শুরু করল। আমরা দুজন ওদের চারজনের সঙ্গে পারলাম না। আমার হাতটা ছুটে গেল...।

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি ভালো থেকো। আমি ফিরে আসব। আমার কত কথা ওর সাথে, আর শোনা হলো না, আমার কথা বলা হলো না। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। কীভাবে যে ১৪, ১৫ তারিখ কেটে গেল, আমি জানি না। ১৫ তারিখ রাত থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগানে সারা দেশ প্রকম্পিত হচ্ছিল। ১৬ ডিসেম্বর সকালে জাকারিয়া এসে বলল, জহুর হোসেন মামাকে কয়েকটা থানার নাম বলেছেন। আসুন, ভাবি। একটা রিকশা নিয়ে গেলাম কোতোয়ালি, মতিঝিল... আরো কয়েক থানায় গিয়ে কোনো হদিস পেলাম না। পড়ে গেলাম রায়েরবাজার বধ্যভূমির তীরে। পথে আসতে আসতে দেখলাম বিজয়ে আনন্দ-উল্লাস। বাড়ির মা-বোনেরা, ছেলে-বুড়ো, যুবা মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে হাত নেড়ে নেড়ে। কত পরিকল্পনা ছিল দুজনের। যেদিন দেশ শত্রুমুক্ত হবে, সেদিন স্বাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বাগত অভিনন্দন জানাব মুক্তিযোদ্ধাদের ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! হলো না। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর কেটে গেল বেশ সময় বাকিটা সময় রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে রক্তে ভেজা কাদামাটিতে প্রিয় মানুষকে খুঁজে না পেয়ে হতাশচিত্তে বাড়ি ফিরলাম। আর ভাবলাম শুরু হলো কষ্টের সঙ্গে যুদ্ধে যুদ্ধে পথ চলা। হলো না বিজয় দেখা।

ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি
কিছু নাই ভয়
তুমি আছ
আমি আছি।

লেখক : শহিদজায়া, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক।

আমাদের ছোট্ট শেখ রাসেল

অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ

ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার ৩২ নম্বর সড়কে পাশাপাশি দুটি বাড়ি # ৬৭৭ ও # ৬৭৮। একটি শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যটি বেগম বদরুন্নেসা আহমদের। দুই বাড়ির মধ্যে নেই কোনো পাকা দেয়াল। দেয়াল যখন উঠল তখন কোমরসমান দেয়ালের মাঝে রাখা হলো ছোট গেট। যে গেট দিনভর খোলা থাকত, আর দিনে-রাতে যখন-তখন দুই বাড়ির মানুষজন আসা-যাওয়া করত। দুই বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে ভীষণ ভাব, অনেক হৃদ্যতা। আত্মীয়তা নেই তাঁদের কোনো, কিন্তু আত্মার আত্মীয় হিসেবে গর্ব করার মতো সম্পর্ক।

দুই বাড়ির মধ্যে ওই গেট দিয়ে ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ভোরে ছুটতে ছুটতে এলো রেহানা। মেয়েটি হাঁপাচ্ছে খুশিতে। ওদের ভাই হয়েছে! সে খবর জানাতেই তার ছুটে আসা আমাদের বাড়ি। 'ও' বাড়ির হাসিনা, কামাল, জামাল ও রেহানার ভাই হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের এ বাড়িতেও ভাই হয়েছে। দেখতে গেলাম ভাইকে এবং দেখলাম সে ভাইটি খুব সুন্দর। মাথা ভরা কলো চুল আর ফুলোফুলো দুটি গাল–দেখেই গাল টিপতে ইচ্ছা করে।

রাসেল যেদিন জন্মগ্রহণ করে তখন পিতা শেখ মুজিবুর রহমান অনুপস্থিত, আর যখন রাসেল একটু বড়, তখন তার আব্বা ৬ দফা ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে প্রায় সময় জেলে; বাড়িতে এই আছেন আব্বা আবার এই নেই হয়ে যেতেন তিনি। সুতরাং রাসেলের আব্বা আর আম্মা দুটোই ওর 'মা'–বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। যত দিন পেরেছে রাসেল তার মায়ের আঁচল ধরে থেকেছে। ছোট্ট রাসেলের ছোট্ট জগতে আব্বার অনুপস্থিতি পূরণ করতেন 'মা', নিজের ঘর-সংসারের সমস্ত দায়িত্ব সামলিয়ে। বড় বোন হাসু আপাকে অনেক ভালোবাসত রাসেল। দুই ভাই কামাল এবং জামালের সাথে ছিল রাজ্যের আল্লাদ আর 'দেনা' আপার সাথে মাঝেসাঝে একটু-আধটু লেগে যাওয়া ছিল স্বাভাবিক। কারণ ওরা তো পিঠাপিঠি ভাই-বোন। আর বাবাকে কম কাছে পেলেও যখন পেত তখন 'আব্বা' উজার করে ভালোবাসতেন তাঁর রাসেল সোনাকে।

সবার চোখে চোখে থেকে বড় হয়েছে ছোট্ট রাসেল। মা আর ভাই-বোনদের চোখের মণি সে। আরেকটু বড় হলো যখন রাসেল তখন তার ঘোরাঘুরি, যাওয়া-আসা, ভালো লাগার গণ্ডি বৃদ্ধি পেল। একটু স্বাধীনচেতা ভাবটা মনে উঁকি দিচ্ছে

তখন। দুই বাড়ির মধ্যের সেই ছোট গেট দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ প্রায় চলে আসত রাসেল। আমাদের বাড়ির ভেতরে আসত না, ডাকলেও না, শুধু বাইরে থেকে নিজের মনে ঘোরাঘুরি করে চলে যেত। বাড়ির কাজের ছেলেরা ওর খেলার সাথি তবে তারা থাকত দূরে দূরে। রাসেল যখন আরেকট বড় তখন পাশের বাড়ির সমবয়সী আদিল আর ইমরান হলো ওর খেলার সাথি। প্রায়ই খেলত সে ওদের সাথে। মনে পড়ে সে সময় তার জ্বলজ্বল করা বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ আর পোকায় খাওয়া দাঁতে ফোকলা মুখের হাসি।

১৯৬৪ সালে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে ১৯৭১ সালে বন্দি জীবন কাটিয়ে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যে পরিবার ও পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, সে শিশু অন্য সব শিশুর থেকে একটু আলাদা হবেই। রাসেল বেড়ে উঠেছে অদ্ভুত পরিবেশে। রাসেল কখনো দেখেছে বাড়িভর্তি অচেনা-অজানা মানুষজন আবার কখনো কেউ নেই, এমনকি আব্বাও। কাকপক্ষীও মনে হয় উড়ে যেতে ভয় পেত তখন। সেই ছোট্ট শিশুটির বুকের ভেতর হতো তোলপাড়। নিশ্চয়ই একটা শূন্যতা বাস বাঁধত তখন, কিন্তু মায়ের আদরে এবং ভাই-বোনদের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থেকেছে সে শূন্যতা, শান্ত হয়েছে তোলপাড়। ওর বয়সের অন্য ছেলেমেয়েদের মতো তেমন দুষ্টুমি করতে দেখিনি রাসেলকে। কাজের লোক কিশোর ও রমার সাথে খেলা করেছে, কিন্তু বকাঝকা করেনি কখনো। শুনিনি ওর মুখে কোনো গালাগাল। স্কুলে পাঠানো অথবা বাসায় পড়তে বসানোও অসুবিধা হতো। কারণ রাসেল ছিল একটু জেদি, নিজের মনে খেলা করত বেশি আর বাড়ির ভেতর গরু, হাঁস, মুরগি, কবুতরে ছিল তার ভীষণ আকর্ষণ। ওই ছোট্ট রাসেলকে বাড়ির পোষা কবুতরের মাংস কেউই কখনো খাওয়াতে পারেনি। মজা লাগত রাসেলের ডিম খাওয়া দেখে। ডিম পোচের ওপর চিনি ছেটানো রাসেলের চাই-ই চাই।

১৯৭৫-২০২১ সাল। এত বছর ধরে যখনই রাসেলের কথা মনে আসে তখন মনে ভেসে ওঠে চিকমিক করা উজ্জ্বল দুটি নিষ্পাপ চোখ। পরমুহূর্তে মনে ভেসে ওঠে পোকা খাওয়া 'কুটিকুটি' দাঁতে ফোকলা হাসি। এ ছবি আমি ধরে রাখতে চাই আজীবন, কিন্তু পারি না। পারি না কারণ কানে বেজে ওঠে সেই মুহূর্তে, বিকট শব্দে দুটি গুলির আওয়াজ।

১৯৭৫ সালের সেই আগস্ট মাসের ভয়ংকর সকালে দুই বাড়ির সেই ছোট্ট গেটের খুব কাছে বসেছিলাম আমরা। বসিয়ে রাখা হয়েছিল আমাদের। দেখি, ওই ছোট গেট দিয়ে কালো পোশাকে অনেক জানোয়ারের আনাগোনা। হঠাৎ ভয়ার্ত এক নারীকণ্ঠের আর্তনাদ তারপর বিকট শব্দে দুটি গুলির আওয়াজ। তারপর নীরবতা...।

শুনেছি, রাসেল অনেকক্ষণ বাড়ির সামনের গেটের কাছে অন্যদের সাথে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড় করে রাখা হয়েছিল রাসেলকে। মাত্র ১০ বছরের বাচ্চা কী

ভীতিকর পরিবেশে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। কাঁদছিল সে মায়ের কাছে যাবে বলে। মায়ের কাছে নেবে বলে সেই বাচ্চাটিকে নিয়ে চলল জানোয়ারের দল। বাবা, মা আর ভাইদের রক্তাক্ত নিথর দেহের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সেই ছোট্ট শিশুটিকে ঠাণ্ডা মাথায় কে ওই পাষণ্ড যে বধ করল তাকে সেদিন? কাঁপেনি হাত যখন সে ছুড়ল গুলি? কাঁপেনি তার হাত রাসেলের নিষ্পাপ চোখ দুটি দেখে? এরা কারা? মনুষ্যত্বহীন জানোয়ারের দল নিশ্চয়ই!

লেখক : সাবেক শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাঙালির মহাকাব্য ॥ দাবায়ে রাখতে পারবা না

মুহম্মদ শফিকুর রহমান

বাঙালির মহাকাব্য কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে কেউ বলবেন, মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা', কেউ মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ', কেউ আলাওলের 'পদ্মাবতী', কেউ মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু', বাঙালি হাজার বছরে বলবে আমাদের মহাকাব্য 'দাবায়ে রাখতে পারবা না' চারটিমাত্র শব্দ, কিন্তু এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই মহাকাব্য সেদিনের সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র মানুষকে মুহূর্তে সশস্ত্র করে পাকিস্তানি ঔপনিবেশবাদী মিলিটারি জান্তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং সমস্ত দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারেনি। আজও স্বাধীনতাবিরোধী দেশি-বিদেশি শক্তির চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র পদদলিত করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাবেই। প্রমত্তা পদ্মার ওপর আত্ম অহংকারের সেতু থেকে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-০১-০২, ঢাকার মেট্রো রেল থেকে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেল, গভীর সমুদ্রবন্দর থেকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ইত্যাদি এগিয়ে যাওয়ার মহাসড়ক রচনা করেছে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)। ঐতিহাসিক ১৯৭১ খ্রি.। স্বাধীনতাসংগ্রাম তথা মুক্তিপাগল ১০ লাখ বা এক মিলিয়ন জনতা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা কৃষক-শ্রমিকের কণ্ঠের সাথে ছাত্রসমাজের কণ্ঠ এক হয়ে স্লোগান ওঠে–'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'আপস না সংগ্রাম–সংগ্রাম সংগ্রাম', 'জনতার সংগ্রাম–চলবেই চলবেই', 'পিন্ডি না ঢাকা–ঢাকা ঢাকা', 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার-আমার ঠিকানা', '৬ দফা ১১ দফা–এবার কেবল এক দফা', 'পরিষদ না রাজপথ–রাজপথ রাজপথ', 'তোমার দেশ, আমার দেশ–বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান–আজিমপুরের গোরস্তান', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো' ইত্যাদি। তবে ৭ই মার্চ সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়েছে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। বক্তৃতা মঞ্চের ১৫-২০ মিটার দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে আমরা ওই সব স্লোগান দিচ্ছিলাম। লাখো জনতার হাতে লাঠি আর গগনবিদারী স্লোগান এমন এক আবহ তৈরি করেছিল, সেই উত্তাল জনসমুদ্রের কথা ভাবলে আজও শরীরে শিহরণ জাগে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বাঙালি জাতির

হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে ভাগ্যবান প্রজন্ম হিসেবে দাবি করতে পারি। সেদিন রেসকোর্সে পশ্চিম মুখ করে মঞ্চ বসানো হয়েছিল। ৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ের পর এই ভাষণ। আগেই ঘোষণা ছিল ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন। জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে সভামঞ্চে আসেন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ আহ্বান–'ভায়েরা আমার' বলে ভাষণ শুরু করেন এবং ১৯ মিনিটে ১০৯৫ শব্দের সম্পূর্ণ অলিখিত ভাষণ এই বলে শেষ করেন–

'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব,
এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।
এবারের সংগ্রাম আমাদের
মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ, যা বিগত আড়াই হাজার বছরের কালজয়ী রাজনৈতিক ভাষণের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। অথচ এই ভাষণকেও বিতর্কিত করার চক্রান্ত হয়েছে স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতির মতো। তবে দুঃখজনকভাবে গ্রন্থ রচনা করে এই বিকৃতিতে অংশ নেন দুজন অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার এ আর ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার। তাঁদের বক্তব্য ছিল বঙ্গবন্ধু 'জয় পাকিস্তান' বলে ভাষণ সমাপ্ত করেন। তখন অনেকেই প্রতিবাদ করেছিলেন। আমি এক জার্নালিস্টিক কলাম লিখেছিলাম তাতে ওই দুজন সম্পর্কে আমার বক্তব্য ছিল : বিচারপতি হাবিবুর রহমান হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন পরে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিও হন। ভদ্রলোক ওই জনসমুদ্রে ছিলেন কি না, জানি না। আগেই বলেছি, বক্তৃতা মঞ্চে মাত্র ১৫-২০ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়েছি; প্রথম থেকে শেষ শব্দটি পর্যন্ত বক্তৃতা শুনেছি। আমরা শুনলাম, বঙ্গবন্ধু 'জয় বাংলা' বলে বক্তৃতা শেষ করেছেন। বিচারপতি সাহেব কোথা থেকে শুনলেন 'জয় পাকিস্তান' উচ্চারণ করতে। অবশ্য অবাক হই না এ জন্য যে এই প্রধান বিচারপতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাঝে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের সহযোগিতার কারণে নাগরিকত্ব হারানো গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এ আর ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার সাহেব তো আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রীও হয়েছিলেন। একাত্তরের ৭ই মার্চ ক্যান্টনমেন্টে ছিলেন। তিনি কী করে শুনলেন বঙ্গবন্ধু 'জয় পাকিস্তান' বলেছিলেন। আমরা মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে শুনলাম না, তিনি শুনলেন। ইতিহাসবিদ গবেষক বঙ্গবন্ধু প্রফেসর ড. মুনতাসীর মামুনের একটি উক্তির কথা মনে পড়ে, স্বাধীন বাংলাদেশেও অন্তত ৩০ শতাংশ মানুষের বুকের ভেতর একটি করে পাকিস্তানি পতাকা রয়েছে। পরে শুনেছি বিচারপতি সাহেব ভুল স্বীকার করে তাঁর ওই বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এ কে খন্দকার সাহেব করেছেন কি না, চোখে

পড়েনি। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে পাকিস্তানের ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনা আর অত্যাচার-নির্যাতনের বর্ণনা। রাজনৈতিক ও সামরিক রূপরেখা প্রদান স্বাধীনতার ঘোষণা, যা ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গেরিলা যুদ্ধের ডাক।

বঙ্গবন্ধু শুরু করেন এভাবে যে আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিনিময়ে পাকিস্তানিরা আমাদের বুকে গুলি চালিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করেছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনে জনগণ আমাকে এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং দেশকে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে গড়ে তুলব। দুঃখের সাথে বলতে হয়, ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হবার করুণ ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি, ৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেও গদিতে বসতে পারিনাই, ৫৮ সালে আইয়ুব মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর গোলাম করে রাখে। ১৯৭০ সালে আইয়ুবের পতন হলে ইয়াহিয়া ক্ষমতায় বসে বললেন দেশে গণতন্ত্র দেবেন, শাসনতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম। পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে বললাম জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে। পিপিপি নেতা ভুট্টো বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা এখানে এলে অ্যাসেম্বলি কসাইখানা হবে। তারপর অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো আমাকে, বাংলার মানুষকে। এমনকি ইয়াহিয়া বেতারে ঘোষণা দিলেন– Mujib is a traitor, this time he will not go unpunished. অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলাম। জনগণ সাড়া দিল। ইতিহাসের নজিরবিহীন অসহযোগ আন্দোলন হলো। গরিবের রোজগারের পথ রিকশা, গরুর গাড়ি, ট্রেন, লঞ্চ ছাড়া আর সব বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং নির্দেশ দেওয়া হলো ২৮ তারিখের মধ্যে বেতন-ভাতা দিয়ে দিতে। ২৫ তারিখ অ্যাসেম্বলি কল করেছে। শহিদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ১০ তারিখ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যাবে না। অ্যাসেম্বলিতে যেতে হলে চারটি দাবি পূরণ করতে হবে : সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সামরিক বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে হবে, জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এর পরই স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু গেরিলা যুদ্ধের রূপরেখা দেন : প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যার যা আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা সব কিছু বন্ধ করে দেবে আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব আর আমার বুকে গুলি চালানোর চেষ্টা করো না, ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না যে পর্যন্ত দেশের মুক্তি না হবে সে পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবে না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে শ্রমজীবী কর্মজীবী মানুষের মাইনে পত্র নেবার জন্য। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের এক পয়সাও চালান হতে পারবে না

টেলিফোন-টেলিগ্রাম পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেওয়া-নেয়া চলবে না। এর পরই বঙ্গবন্ধু একটি বাক্য উচ্চারণ করেন, যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয় বাঙালিরা 'বুঝেশুনে' কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 'সংগ্রাম পরিষদ' গড়ে তোলো এবং যার যা আছে তাই নিয়ে 'প্রস্তুত থাকো'। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। তৃতীয় অধ্যায় এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম–এই ঘোষণা ছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমি এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি বাঙালিরা বুঝেশুনে কাজ করবেন।

পাড়ায়-মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো; সবাই প্রস্তুত থাকো যদি 'হুকুম দেবার নাও পারি' বা 'বুঝেশুনে' বা 'সংগ্রাম পরিষদ' এই কথাগুলো প্রত্যেকটি দ্ব্যর্থবোধক এবং সিগনিফিকেন্ট। সুদূরপ্রসারী। বঙ্গবন্ধুর এই বক্তৃতার পর একটি গ্রুপ বলতে শুরু করল কেন সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন না। সরাসরি ঘোষণা দিল, অর্থাৎ যা ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে দিলেন, তাহলে পাকিরা এত গণহত্যার সুযোগ পেত না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু দুনিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস জানতেন। ইম্যাচুর বা হঠকারী ঘোষণা যে সফল হয় না, তা তিনি জানতেন। তাঁর সামনে বায়াপ্রার দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে, তেমনি ভারতবর্ষের মহান বিপ্লবী নেতাজি সুভাষ বোসের Give me blood I will give you independence বলে হারিয়ে যাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেদিন এমনভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন তাতে সব কিছুই বললেন। আবার তাঁকে অভিযুক্ত করা গেল না। অর্থাৎ সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলার সুযোগ রইল না। বললেন অ্যাসেম্বলি কল করেছেন তার আগে আমার দাবি মানতে হবে বলে মার্শাল ল প্রত্যাহার, জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরসহ চারটি দাবি দিলেন। এতে করে বঙ্গবন্ধু চ্যাম্পিয়ন অব ডেমোক্রসি এবং মহান বিপ্লবী বলে বিশ্বে পরিচিত হলেন। বিশ্বে মিডিয়াও অবাক হলো, কোনো দোষ চাপাতে পারল না। ২৫ মার্চ রাতে যখন নিরস্ত্র মানুষের ওপর পাকি সামরিক জান্তা ট্যাংক-কামান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, গণহত্যা শুরু করল তখন স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ও চূড়ান্ত ঘোষণা দিলেন–

'This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last'.

'Your fight must go on until the last soldier of the Pakistani occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved'.

লক্ষ করার বিষয় হলো, এই ঘোষণার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে চোখ থাকতে হবে। রাজনৈতিক জ্ঞান থাকতে হবে। স্বাধীনতাবিরোধী চোখ দিয়ে দেখলে হবে না। ঘোষণার আগেই বঙ্গবন্ধু জাতিকে তৈরি করেন, দলকে সংগঠিত করেন, দলের নেতাদের সবাইকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন কোথায় যেতে হবে, কার কার সাথে দেখা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভারতের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নাম সবার আগে আসে। নিজে ৩২ নং বাড়ি থেকে সরেননি। বিএনপিসহ বেশ কিছু দল একে বঙ্গবন্ধুর সারেন্ডার(?) বলে প্রপাগান্ডা করছে আজও। বঙ্গবন্ধু এত বড় মাপের নেতা ছিলেন যে মিলিটারির চামচাদের তাঁকে বোঝার ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই নেই। যে কারণে বঙ্গবন্ধুর ওপর ৫০ বছর পরেও হাজার হাজার প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার পরও এখনো অনেক কিছু লেখা বাকি। শেষ হবে না কোনো দিন। শতবর্ষ পরেও মানুষ লিখবে। শুরুতেই আমি বলেছি বাঙালির মহাকাব্য হলো 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'। পারেওনি। আজ তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন এক উচ্চতায় উঠে এসেছে, যা বিশ্বের বিস্ময়। অনেক দেশের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। পিতা দিলেন স্বাধীনতা, কন্যা দিলেন আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত বাংলাদেশ। জয়তু বঙ্গবন্ধু, জয়তু শেখ হাসিনা।

লেখক : সংসদ সদস্য ও সাবেক সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্বঘোষণা ও অভিযাত্রা

অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯ মিনিটের যে ভাষণটি প্রদান করেছিলেন, তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের জন্যই শুধু নয়, পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের সেই সময়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ, ইতিহাস নির্মাণ এবং সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুত করার এক অদ্বিতীয় রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘোষণার দলিল হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। সে কারণেই প্রতি বছর ৭ই মার্চ তারিখটি বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক দিবস হিসেবে ফিরে আসে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত এই ভাষণটি পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহকে স্বাধীনতার আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান এবং মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার এক বিস্ময়কর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। ২৫ মার্চে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামিয়ে যে গণহত্যা শুরু করেছিল, তা রুখে দিতে এবং স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করতে বঙ্গবন্ধুকে ৭ই মার্চের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি। এখান থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীনতা দীর্ঘ ৯ মাস এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়। সে কারণে ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর দরাজ কণ্ঠ থেকে সেদিন যে ভাষণটি উচ্চারিত হয়েছিল, তা সমাগত লক্ষ লক্ষ জনতাকে এতটাই আবিষ্ট করেছিল যে নেতা বঙ্গবন্ধু এবং জনতা যেন একাকার হয়ে উঠেছিল, বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ ও বাক্য যেন জনগণের প্রাণের কথা। জনগণ নেতা বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় কণ্ঠের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে থাকে। নেতা বঙ্গবন্ধুও জনতাকে তাঁর আবেগ, ভালোবাসা এবং তাদের চাওয়া-পাওয়া বাস্তবে রূপ দেওয়ার কঠিন চ্যালেঞ্জকে রাজনীতির পথে এগিয়ে নেওয়ার রাস্তা প্রদর্শন করলেন। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ ও বাক্য যেমন সুগঠিত ছিল, তেমনি ইতিহাসের পথ মাড়িয়ে আসা এক নির্জলা আন্দোলন-সংগ্রামের পথ বেয়ে আসা ইতিহাস তাতে উপস্থাপিত হচ্ছিল। যেখানে শোষণ-বঞ্চনা, আত্মত্যাগ-রক্তপাত ঘটেছিল নিরীহ-নিরস্ত্র-বুভুক্ষু মানুষের ওপর, যা ছিল বাঙালির ওপর

পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণ টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে। ভাষণে তিনি জনগণের অধিকার কীভাবে বারবার লঙ্ঘিত হয়েছিল, পূর্ব বাংলার জনগণ কীভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে একের পর এক অমানবিক আচরণ এবং আঘাত পেয়েছিল, সেটি তিনি জাতির নেতা হিসেবে কীভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার বর্ণনাও দিয়েছেন। ভাষণে ২৩ বছরের পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্বের অবহেলার ও দুঃশাসনের চিত্র তিনি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। সেই অবস্থায় একজন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান নেতা হিসেবে তাঁর অনুভূতির প্রকাশ এই ভাষণের ছত্রে ছত্রে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। উপস্থিত জনতা তাঁর সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করছিল এবং সমর্থন জানিয়েছিল পরবর্তী করণীয় নির্দেশনার প্রতি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণের শুরুতেই জনগণের প্রতি আস্থা রেখে বলেছিলেন, 'আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।' কারণ এই সময়ে যে আন্দোলন সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল তা যেমনিভাবে সবার জানা ছিল, একইভাবে সেই আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণও ছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। জনগণই একসময় ভোটের অধিকারের জন্য বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ৬ দফার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। গোটা জাতি তখন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, সংগঠিত করেছিল '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান আর তাতেই স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদায় দিয়ে শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতার হাতবদল ঘটিয়ে মনে করেছিল জনগণের আকাঙ্ক্ষা দমন করা যাবে। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত টেকেনি। সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানকে দিতে হয়েছিল। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ একাট্টা হয়ে যে রায় প্রদান করেছিল, তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের মনোভাব প্রকাশিত হয়ে যায়। এটি বুঝতে পেরেই পাকিস্তানের সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করছিল। ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ৩ তারিখে শুরু হতে যাওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার পর পূর্ব বাংলা প্রতিবাদে জেগে ওঠে। এখানে জনগণ সকল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। জনগণ ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার প্রতিবাদ করে রাস্তায় নেমে আসে। এটিকে দমন করতেই গুলি করে হত্যা করা হয় নিরীহ প্রতিবাদকারীদের। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করলেন, 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।' এখানেই বঙ্গবন্ধু জনগণকে ঘুরে দাঁড়ানোর যে আহ্বান জানালেন তাতে পাকিস্তানের প্রতি তাঁর কঠোর মনোভাব এবং হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছিল। তাঁর এই উচ্চারণ পূর্ব বাংলার জনগণকে তখন অসীম সাহস জুগিয়েছিল। মানুষ তাদের সম্মুখেই এমন একজন নেতাকে দেখতে পাচ্ছে, যিনি পাকিস্তানের ক্ষমতাধরদের মোটেও ভয় করেন না। জনগণ ২৩ বছরের শাসন-শোষণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা নেতাকেই তাদের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছে। যাঁর কাছে অধিকার আদায়ে নির্ভয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথাই উচ্চারণ করেছিলেন।

এর মাধ্যমে মানুষের প্রত্যাশা নতুন মাত্রায় জেগে ওঠে। যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে এত দিন জেগে উঠেছিল, সেটি বাস্তবে রূপ দেওয়ার নেতৃত্ব সেদিন সামনে দেখতে পেয়েছিল মানুষ। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বঞ্চনার ইতিহাস রুখে দেওয়ার মাধ্যমে মুক্তির পথের কথা উচ্চারণ করলেন। এর জন্য তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন। কারণ নেতা জানেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতেই হবে। পাকিস্তানিরা সত্তরের ভোটের পর পূর্ব বাংলার জনগণকে পাকিস্তানের নাগরিকের অধিকারের চোখে দেখতে চায়নি। তারা গণরায়কে ধূলিসাৎ করার জন্য জাতীয় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছে। কেননা এই পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলে পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। সেটি তারা কিছুতেই মেনে নিতে চায়নি। তাদের এই মেনে না নেওয়ার বিষয়টি পূর্ব বাংলার জনগণও মেনে নিতে পারেনি। সে কারণেই ১ তারিখ থেকে পূর্ব বাংলা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। হরতাল, অসহযোগ, স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন, 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার-আমার ঠিকানা'–স্লোগান উচ্চারণে যে সাহসী ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, সেটি ছিল পাকিস্তানের প্রতি অনাস্থারই বহিঃপ্রকাশ। সেই অনাস্থা মানে হচ্ছে স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু জনমনের এই প্রস্তুতি ও পরিবর্তন লক্ষ করেই বলেছিলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' এই কঠিন বক্তব্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু বুঝিয়ে দিলেন যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁকে ৭ তারিখের পর অগ্রসর হতে না-ও দিতে পারে। কিন্তু নেতা জনতার আবেগ-উত্তেজনা, চাওয়া-পাওয়া এবং মনোভাব দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই জনতা এখন আর পেছনের দিকে নয়, সম্মুখের দিকেই ছুটে যাবে অনির্বাণ গতিতে। সে কারণে তিনি উচ্চারণ করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এখানে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে যে বিষয়টি সবাইকে বলে দিলেন, তা বুঝতে কারোরই বাকি রইল না। রাজনীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্যকে দুটি ধারায় দেখতে হবে। প্রথমত, যেহেতু ৩ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন চলে আসছিল; সে আন্দোলন ৭ তারিখের পর চালিয়ে নেওয়ার নির্দেশ বঙ্গবন্ধু দিলেন। তাই নিয়মতান্ত্রিক ধারায় অসহযোগ আন্দোলনের গতি যে পরিণতি নেবে, তাতে সামরিক স্বৈরশাসকের ক্ষমতায় থাকার সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে না। তাকে অবশ্যই ক্ষমতা ছেড়ে বিদায় নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে সূচিত অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক ধারায় পাকিস্তানের পতন ঘটানোর কথা। কিন্তু ক্ষমতা না ছেড়ে যদি আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় তাহলে নিরস্ত্র জনগণের ওপর আঘাত হানা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ শাসকগোষ্ঠী বেছে নেবে না। সে ক্ষেত্রে বাঙালির ওপর আক্রমণ ঘটলে স্বাধীনতার ন্যায়সংগত অধিকার

প্রতিষ্ঠার পাল্টা আক্রমণ অনিবার্য হয়ে উঠবে। বঙ্গবন্ধু এই দুটি পথই তাঁর উক্ত আহ্বানের মধ্য দিয়ে খোলা রেখে দিলেন। সকলেই বুঝতে পারছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতিতে পাকিস্তানিরা ক্ষমতা ছাড়বে না, পূর্ব বাংলাও ত্যাগ করবে না। সুতরাং দ্বিতীয় সশস্ত্র পথেই তারা জনগণের উত্থানকে দমন করতে চাইবে। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার, যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানালেন। কত নিগূঢ় সত্য লুকিয়ে ছিল বঙ্গবন্ধুর এমন তেজোদীপ্ত, প্রজ্ঞাদীপ্ত বজ্রকণ্ঠের মধ্যে। গোটা ভাষণের নির্যাসটি যেন এখানেই এসে মানুষকে সশস্ত্র হওয়ার পথে নামিয়ে দিল। তিনি ভাষণ শেষ করেছেন, কিন্তু আন্দোলনকে স্বাধীনতা অর্জনের পথে চড়িয়ে দিলেন। সেই পথ প্রতিদিন প্রশস্ত হতে থাকল। পাকিস্তানিরা ঢাকায় এসে ফয়সালা করার চেষ্টা করল, কিন্তু ফয়সালার নিয়মতান্ত্রিক পথে তারা অগ্রসর হয়নি। ফলে ১৬ তারিখ থেকে ইয়াহিয়া খান আলোচনার টেবিলে বসে আসলে গোপনে অপারেশন সার্চলাইটের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু সাড়ে সাত কোটি মানুষকে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে প্রস্তুতি নিতে সময় দিলেন। ২৫ মার্চে পাকিস্তানিরা অপারেশন সার্চলাইট নামিয়ে যে গণহত্যা শুরু করেছিল তার পরিণতিতে তারা চেয়েছিল পূর্ব বাংলায় মানুষ নয়, পোড়ামাটির বাস্তবায়ন। কিন্তু এই মাটি কত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সেটি তারা উপলব্ধি করতে পারেনি, এই মাটির সন্তানরা অপারেশন সার্চলাইটের আগুন নিভিয়ে দিতে লক্ষ লক্ষ বুক চিতিয়ে দিয়েছিল। সেই বুক ধারণ করেছিল ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া তেজোদীপ্ত ভাষণকে। এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধপূর্ব স্বাধীনতার মন্ত্রে প্রজ্বলিত সাড়ে সাত কোটি মানুষের হাতে একেকটি অগ্নিশিখা।

যে নেতা জাতিকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে স্বাধীনতার মন্ত্র ছড়িয়ে দিতে জানেন তিনি ইতিহাসের ক্ষণ, বাস্তবতা এবং স্বাধীনতা অর্জনের উপায়কে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়েই প্রদর্শন করেন। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে স্বাধীনতার আলোকোজ্জ্বিত পথ দেখিয়ে দিলেন, কিন্তু কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলেন না। কারণ অনিবার্য স্বাধীনতার জন্য আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই ৭ তারিখে স্বাধীনতার চূড়ান্ত নয়, নিকটবর্তী ঘোষণা উচ্চারণ করাই কেবল যেতে পারে। সেটিই তিনি সেদিন করলেন। যদি ৭ তারিখেই তিনি স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা দিতেন তাহলে পাকিস্তানিদের তাক করা ট্যাংক, বন্দুক, কামান, মেশিনগান রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর শুধু নয়, গোটা দেশের মানুষের ওপর নিক্ষিপ্ত হতো। তাতে নেতৃত্ব যেমন এক জায়গাতেই পাকিস্তানিদের হাতে নিহত হতো। নিরস্ত্র মানুষও তাদের হাত থেকে বাঁচতে পারত না। পাকিস্তান রাষ্ট্র বিশ্বকে বুঝিয়ে দিত শেখ মুজিব স্বাধীনতাকামী নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো ছিলেন বিশ

শতকের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সেরা নেতা। তাই ৭ মার্চ তিনি জনতাকে নিয়ে স্বাধীনতার দীর্ঘ আন্দোলনের সঠিক পথে পদযাত্রা শুরু করলেন। এই যাত্রাকে সামরিক বাহিনী ২৫ তারিখ গণহত্যা চালিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল, এর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ন্যায্য প্রতিরোধ, জনতার জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়ে প্রতিউত্তর দেওয়া হলো। এই যুদ্ধই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিল। ৭ মার্চ স্বাধীনতার ইতিহাস নির্মাণের এক ঐতিহাসিক পদযাত্রার দিন। সেই যাত্রার নেতৃত্ব দিলেন বঙ্গবন্ধু। কণ্ঠে ছিল তাঁর অমর এক রাজনৈতিক ভাষণ, যা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ দলিল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

লেখক : অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ।

আর দাবায়ে রাখতে পারবা না

জাফর ওয়াজেদ

উদার আকাশ আর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে লাখো লাখো মানুষের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি জলদগম্ভীর স্বরে ডাক দিয়েছিলেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রণাঙ্গনে শত্রুর হাত থেকে স্বদেশ উদ্ধারে। একটি ডাকে জেগেছিল সাত কোটি প্রাণ রণাঙ্গনে স্বাধীনতার সোনার স্বপন এনেছিল রক্তদানে। বাঙালির জীবনে নয়া উন্মোচনের বার্তা হয়ে এসেছিল একাত্তরের ৭ই মার্চ। আর তারই পথ ধরে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে এনেছিল স্বাধীন স্বদেশ। সামগ্রিকভাবে ৭ই মার্চের ভাষণের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ভাষণের শব্দে সামান্য একটু ওদিক হলেও অর্থ একটাই–স্বাধীনতা। স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই ভাষণ বাঙালি জাতিকে নতুন করে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। বাঙালির মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল নতুন উদ্দীপনা। ইতিহাস জানান দেয় ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রাসঙ্গিকতা থাকবে চিরকালই। জাতিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলেও এই ভাষণ একটি 'ইনস্টিটিউশন' হিসেবে বেঁচে থাকবে। 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'–এটা শুধু কোনো উদ্দীপ্ত ভাষণ নয়, বরং আরো বেশি কিছু।

৫১ বছর আগে একাত্তরের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দেন, তা বাঙালির প্রতীক। জাতীয় চেতনা ও জাতীয় ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রতীক আর সেই প্রতীক হিসেবে যুগ-যুগান্তর ধরে উজ্জীবিত রাখবে বাংলার মানুষকে শুধু নয়, বিশ্ববাসীকেও। এই ভাষণ আজ আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। যে ভাষণ বিশ্বের ৫০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। যে ভাষণ শুনে এখনো আবেগতাড়িত হয় বাংলার নয়া প্রজন্ম, যে ভাষণ সংগত কারণেই ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে। একটি রাজনৈতিক ভাষণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তা এই ভাষণ নিয়ে গবেষণা, আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকেই বোঝা যায়। গবেষকরা বলেছেনও এ ভাষণটির গুরুত্ব বহুমাত্রিক, নিরন্তর, স্বাধীনতার ইতিহাস নির্মাণে সম্পূর্ণরূপে সফল। ইতিহাসবেত্তাদের মতে, ৭ই মার্চের ভাষণ একটি দেশের স্বাধীনতার আগাম ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ও দিকনির্দেশনা হয়ে উঠেছিল। ফলে ভাষণটি হয়ে উঠল মহান মুক্তিযুদ্ধের নিকটবর্তী অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণ শেষ পর্যন্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি অকাট্য ও শ্রেষ্ঠ দলিলে পরিণত হয়। যা শুধু একাত্তর সালেই মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি যুগ যুগ এ দেশের মানুষকে শুধু নয়, বিশ্বের নিপীড়িত মানুষকেও

স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় উজ্জীবিত করবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহস, দেশপ্রেম, নেতৃত্বের দৃঢ়তা এবং কণ্ঠের আকর্ষণ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ভাষণটি এ দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস নির্মাণে একাত্তরেই শুধু নয়, অনন্তকাল ধরে জাতি গঠন, ইতিহাস নির্মাণ ও পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেই চলবে। একটি ভাষণ একটি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কী দারুণভাবে প্রোৎসাহিত করেছিল, তা বিশ্ব ইতহাসে আজও বিরল ঘটনা। যে ভাষণ বাঙালি জাতিকে যেভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করেছিল, তা বিশ্বে সৃষ্টি করেছে নতুন এক বক্তৃতা আলেখ্য। আর এই ভাষণ সারা বাংলার সব মানুষকে পথপ্রদর্শন করেছিল শত্রুর সঙ্গে অদম্য লড়াইয়ের। দেখিয়েছিল কোন পথে এগোতে হবে, কেমন করে। তারও নির্দেশনা ছিল বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক নির্দেশনামূলক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে। যে ভাষণ পৃথিবীর অর্ধশত ভাষায় অনূদিত হয়েছে, সে ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কতখানি, তা সহজেই অনুমেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী ভাষণটি দেন ৭ই মার্চ। সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ না করেই তিনি পরিষ্কার বা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিবেদনের জন্য বাঙালিদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ফলে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পথ বা অন্ততপক্ষে আইনগত দিক থেকে না হলেও সারবত্তার দিক থেকে এক ধরনের স্বাধীনতা অর্জনের পথ খোলা থাকল। ইতিহাস স্পষ্ট করে যে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ যেদিন পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শাসক ইয়াহিয়া খান গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে, সেদিনই মূলত বাঙালির ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ। সেদিনই বাঙালিরা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। আর এই ১ মার্চ থেকে ধারাবাহিক সংগ্রাম এবং অসহযোগ আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণভার দৃশ্যত চলে আসে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের হাতে। বীরের জাতি বাঙালি এবং তাকে পাকিস্তানের ২৩ বছর পরও পর্যুদস্ত করে রাখা যাবে না–এই উত্তাল মার্চেও সেই সময়ে প্রতিভাত হয়েছিল।

৭ই মার্চ এসেছিল বাঙালির জীবনে তার জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের নয়া উন্মোচনের বার্তা নিয়ে। যার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত বাঙালি জাতি চেয়েছিল তাদের ভোটে নির্বাচিতরা সরকার গঠন করবে, শাসনতন্ত্র তৈরির জন্য সংসদ অধিবেশনে মিলিত হবে। জন্মলগ্নের এই আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করার কাজটি ১ মার্চ করা হয়। বাঙালিকে যেদিন অপমান করা হয়েছিল। জাতীয় সংসদের পূর্বঘোষিত ৩ মার্চের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় বাঙালি বুঝে নিয়েছিল–পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনসাধারণের প্রদত্ত সুস্পষ্ট নির্বাচনী

রায়কে দলিত-মথিত করা হচ্ছে। ইয়াহিয়া খানের এক ঘোষণায় সারা বাংলা আগুনের ফুলকির মতো ঝলসে ওঠে। দাবানলের মতো আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়া বাঙালি ঘর ছেড়ে রাজপথে নেমে পড়ে। মিছিলে মিছিলে সয়লাব সারা বাংলা। মুক্তির পথপরিক্রমায় বাঙালি বুঝে নিয়েছিল আরো যে তাদের নির্বাচনী বিজয়ের রায় ও স্বাধিকারের চেতনা নস্যাৎ করে দিতে বদ্ধপরিকর পাকিস্তানিরা। যুগ-যুগান্তরের শৃঙ্খল ভেঙে জেগে ওঠা বাঙালি এই অন্যায়-অপমান মাথা পেতে নেয়নি।

যুদ্ধটা শুরু হয়ে গিয়েছিল একাত্তরের ৩ মার্চ থেকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন গর্জে ওঠা বাঙালির মুখোমুখি সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে। ৩ ও ৪ মার্চ চট্টগ্রামেই ১২০ জন নিহত ও ৩৩৫ জন আহত হন। প্রতিরোধের বহ্নিশিখা তখনই উথলে উঠেছে। ৪ মার্চ সেনাবাহিনীর গুলিতে খুলনায় ছয়জন নিহত ও ২২ জন আহত হন। ৫ মার্চ টঙ্গীতে পাকিস্তানিদের গুলিতে চারজন নিহত এবং ২৫ জন আহত হন। খুলনায় দুজন ও রাজশাহীতে একজন নিহত হন। ৬ মার্চ ঢাকাসহ সারা দেশে হরতার চলাকালে সেনাবাহিনী ও জনতার মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এদিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৩৪১ জন কারাবন্দি পলায়নকালে গুলিতে সাতজন নিহত ও ৩০ জন আহত হন। সম্মুখসমরের পূর্বাভাস এভাবেই পাওয়া যায়। আর এই শহিদদের হত্যার বিচারের দাবিতে তখন উৎকণ্ঠিত শেখ মুজিব। ৭ই মার্চের ভাষণেও বলেছেন শহিদদের রক্ত মাড়িয়ে তিনি অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন না।

১ মার্চ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর ঝলসে ওঠা বাংলাদেশের চারদিকে শুধু বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ। ২৩ বছরের শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীন সত্তার জাগরণ ঘটছে তখন দিকে দিকে।

২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করা হয় এবং তাঁরই নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে এবং স্বাধীন বাংলার মানচিত্রখচিত পতাকা উত্তোলিত হয়। ৩ মার্চের পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে বঙ্গবন্ধু জানিয়েছিলেন যে ৬ মার্চের মধ্যে যদি ইয়াহিয়া সরকার দাবি না মেনে নেয়, তবে ৭ মার্চ তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন। এই ঘোষণার আলোকে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি উজ্জীবিত হয়ে উঠে স্বাধীনতার অভিলক্ষ্যে। আর পাকিস্তানি শাসক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও উদগ্রীব হয়েছিল যে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু কী ঘোষণা দেন। তার পরও পাকিস্তানি শাসকদের পক্ষ থেকে নমনীয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। কেবল ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া সংসদ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করে। ইয়াহিয়ার এই ঘোষণা ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিতর্কিত বক্তব্য-বিবৃতিতে ফুঁসে উঠেছিল বাংলাদেশ অগ্নিঝরা মার্চের প্রথম দিন থেকেই।

একই সঙ্গে সেনানিবাসে সেনা সমাগম বৃদ্ধি এবং যুদ্ধংদেহী প্রবণতা এবং স্থানে স্থানে নিরস্ত্র বাঙালি হত্যার প্রবণতায় পরিস্থিতি হয়ে ওঠে ক্রমে বিস্ফোরোণ্মুখ। এরই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর পূর্বঘোষিত জনসভা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত

হয়ে ওঠে। আর বিদ্রোহী বাংলা ক্রমে দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। ৪ মার্চ রেডিও পাকিস্তান ঢাকার নাম থেকে পাকিস্তান শব্দ মুছে যায়। নয়া নামকরণ হয় ঢাকা বেতার কেন্দ্র। টেলিভিশনের নাম হয় ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র। এই দুই গণমাধ্যম থেকে প্রচারিত হতে থাকে স্বাধীনতার সপক্ষে গান, নাটকসহ জন-উদ্দীপনামূলক নানা অনুষ্ঠান। শেখ মুজিবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনে সচেষ্ট বাঙালি জাতি মুক্তি অর্জনের ইস্পাত কঠিন সপথের দৃঢ়তায় সশস্ত্র হয়ে ওঠার প্রেরণায় প্রশিক্ষিত হতে থাকে নানা স্থানে। অসহযোগ আন্দোলন বাঙালিকে প্রাণিত করেছে দুর্দমনীয় প্রতিরোধের বজ্রকঠিন সাহসে। গণসংগীত ভেসে আসতে থাকে সারা দেশ থেকে। প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের আগুন জ্বলতে থাকে বাঙালির মনে। অনেক রক্তদান করা বাঙালিকে তখন ডাকছে রণাঙ্গন। সাড়ে সাত কোটি প্রাণ এক হয়ে তখন শত্রুহননের জন্য প্রস্তুতি পর্বে নিমগ্ন ছিল। ৭ই মার্চের ভাষণ কোনো আকস্মিক বিষয় ছিল না। এই ভাষণের আগে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে বিভিন্ন সমাবেশে বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু জাতিকে ক্রমে স্বাধীনতার পক্ষে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের ষড়যন্ত্র এবং তা উপড়ে ফেলার জন্য করণীয়ও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি ভেতরে ভেতরে যে গভীর ষড়যন্ত্র চালু রেখেছে, তা আঁচ করতে পেরে একাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণের পর শপথবাণী উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার শক্তি পৃথিবীতে কারো নেই। যারা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধিকারের দাবি বানচালের জন্য বাঙালিকে ভিখারি বানিয়ে ক্রীতদাস করে রাখছে, তাদের উদ্দেশ্য যেকোনো মূল্যে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে।' সেদিন অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে এমনও বলেছিলেন, 'সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি হয়তো আপনাদের মাঝে না-ও থাকতে পারি। মানুষকে মরতেই হয়। জানি না আবার কবে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারব। তাই আজ আমি আপনাদের এবং বাংলার মানুষকে ডেকে বলছি–চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোন। বাংলার মানুষ যেন শোষিত না হয়। লাঞ্ছিত, অপমানিত না হয়।...বীর শহিদদের অতৃপ্ত আত্মা আজ দুয়ারে দুয়ারে ফিরছে–বাঙালি তোমরা কাপুরুষ হইও না। চরম ত্যাগের বিনিময়ে হলেও স্বাধিকার আদায় করো। বাংলার মানুষের প্রতি আহ্বান–প্রস্তুত হোন, স্বাধিকার আমরা আদায় করবই।' দৃঢ়তায় তিনি আবদ্ধ করার কাজটি সত্তরের নির্বাচনের পরই শুরু করেন। একাত্তরের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণসভায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শেখ মুজিব বলেন, 'এই প্রথমবারের মতো বাঙালি জাতি একতাবদ্ধ হয়েছে। নিজেদের দাবিতে বাঙালিরা আজ ঐক্যবদ্ধ।' বঙ্গবন্ধুর নির্ভরতা ছিল জনগণের ওপর। যে জনগণকে তিনি তিলে তিলে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেছেন। বলেছেনও একাত্তরের ২৯ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে, গত ২৩ বছর বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণ করা হয়েছে।

সেই পরিস্থিতি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে সনাতন ষড়যন্ত্র আজও চলছে। তবে ভরসা হচ্ছে, দেশবাসী আজ সম্পূর্ণ সচেতন ও জাগ্রত এবং ষড়যন্ত্রজালকে ছিন্নভিন্ন করে কায়েমি স্বার্থবাদকে খতম করার ক্ষমতা দেশবাসী রাখে। ২৪ জানুয়ারি পূর্ববাংলার সংগীতশিল্পী-সমাজের সংবর্ধনার জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'যদিও জনগণ প্রাথমিকভাবে বিজয়ী হয়েছে; তবুও বিপদের আশঙ্কা এখনো দূরীভূত হয়নি। পথ এখনো কণ্টকাকীর্ণ এবং অনিশ্চিত। ...মনে রাখবেন, বিপদ আমাদের কাটে নাই। লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয় নাই। চরম সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেদিনের জন্য প্রস্তুত হোন।' এর আগে ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দীর্ঘ ভাষণে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন দিকনির্দেশনাসমেত গুরুত্বপূর্ণ অনেক কথা। বলেছিলেন, 'দেশে যদি বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সে বিপ্লবের ডাক আমিই দেব।' এমনটাও বলেছিলেন, 'জনগণের স্বাধীনতার ফল ভোগ নিশ্চিত করার জন্য আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।' ৭ই মার্চের আগের ভাষণ, বিবৃতি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়, ওই সব ভাষণের উপসংহার তিনি টেনেছিলেন ৭ই মার্চের ভাষণে।

একাত্তরের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় লাঠিসোঁটা, তীর-ধনুক নিয়ে এসেছিলেন যাঁরা স্বাধীনতার মন্ত্র বুকে বেঁধে, মহানায়কের ঘোষণা শোনার জন্য–তাঁরা জানতেন, কঠিন লড়াই ছাড়া স্বাধীনতা আসবে না। জনসভার ওপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান প্রদক্ষিণ দেখে তাতে শত্রুসেনা আছে ভেবে কেউ কেউ লাঠি ছুড়ে মেরেছিল। মনোয়ারা বিবি একজন মহিলা গাইছিলেন–'মরি হায় রে হায়, দুঃখের সীমা নাই, সোনার বাংলা শ্মশান হইল পরাণ ফাইডা যায়।'

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ কেন সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল বাহাত্তরের গোড়াতেই। ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু এই প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন আপাতত পাকিস্তানিদের কাছ থেকে আসুক। প্রখর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন দূরদর্শী রাজনীতিক বঙ্গবন্ধু তাই স্বাধীনতার কথা পরোক্ষভাবে বললেও সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। যদি করতেন তবে পাকিস্তানিরা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে পারত যে শেখ মুজিব বিচ্ছিন্নতাবাদী। তিনি পাকিস্তানিদের এ সুযোগ দেননি। আর পাকিস্তানিরা তো বিমান, ট্যাংক নিয়ে প্রস্তুতই ছিল। যদি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। তবে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত। ডেভিড ফ্রস্ট জিজ্ঞেস করেছিলেন, '৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানেই কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন?' জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি জানতাম, কী ঘটতে যাচ্ছে। আমি জনসভায় ঘোষণা করি যে স্বাধীনতা ও মুক্তির এটিই মোক্ষম সময়।' ফ্রস্ট আবার প্রশ্ন করেন, "সেদিন যদি আপনি বলতেন, 'আমি আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি', তাহলে কী হতো?" জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ওই দিনই সুনির্দিষ্টভাবে আমি তা বলতে চাইনি। কেননা তাতে তারা বিশ্বকে এ কথা বলার সুযোগ পেত যে শেখ মুজিবুর

রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, অতএব আক্রমণ করা ব্যতীত আমাদের উপায় ছিল না। আমি চেয়েছিলাম, আঘাতটা তাদের কাছ থেকে আসুক, আমার জনগণ সে আঘাত মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিল।'

ইতিহাস বলে, বাংলাদেশ কার্যত স্বাধীন হয়েছে ৫ মার্চ। সেদিন বাংলাদেশের কর্তৃত্ব চলে আসে বঙ্গবন্ধুর হাতে, ওই তারিখের পর ইয়াহিয়া যা-ই করেছেন, বাংলাদেশের মানুষ তা সার্বভৌম দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হিসেবেই দেখেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল না কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন।...৭ই মার্চ সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসমাবেশে বলেছেন, 'বাংলার মানুষকে আমি ডাক দিয়েছিলাম। ৭ই মার্চ আমি তাদের প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। যখন দেখলাম আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে আমি ডাক দিয়েছিলাম–আর নয় মোকাবিলা করো। বাংলার মাটি থেকে দখলদারদের উৎখাত করতে হবে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।'

স্বাধীনতা ও মুক্তি শব্দ দুটি বঙ্গবন্ধুর খুব প্রিয় ছিল। তাই ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি মাঝখানে একবার বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

আবার শেষে সদর্পে বলেছেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' জাতি স্বাধীনতা পেয়েছে, চলছে মুক্তির সংগ্রাম। এই সংগ্রাম থেকে বাঙালিকে বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, 'কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না।'

লেখক : একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ।

আইনের শাসন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

এ বি এম খায়রুল হক

বাংলাদেশ ৩০ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ ও চার লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ স্বাধীনতা লাভ করে। ৪ নভেম্বর ১৯৭২-এ বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২-এ এই সংবিধান বলবৎ হয়। এর ১৫৩টি অনুচ্ছেদ। সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে ২৬ শে মার্চ ১৯৭১-এ স্বাধীনতার ঘোষণা হতে সংবিধান বলবৎ পর্যন্ত ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সংবিধানের প্রস্তাবনার তৃতীয় প্যারাগ্রাফে আইনের শাসনের অঙ্গীকার রয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদ বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। সপ্তম অনুচ্ছেদ সংবিধানের প্রাধান্য ঘোষণা করেছে। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষণা করেছে; তৃতীয় ভাগ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের বিধান করেছে। এই ভাগের ২৬ অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকার; সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। ষষ্ঠ ভাগ সুপ্রিম কোর্টসহ একটি বিচার বিভাগ স্থাপন করেছে। সপ্তম ভাগ একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন স্থাপন করেছে। আইন ও আইনের শাসনপ্রক্রিয়া উপর্যুক্ত প্রতিটি ভাগের প্রতিটি অনুচ্ছেদে প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে। তবে সংবিধান ও আইনের বইতে আইন ও আইনের শাসনের কথা লিপিবদ্ধ থাকা এক জিনিস আর ওই সকল মহান বিধান রাষ্ট্রের বাস্তব প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হওয়া সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপার।

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫-এ রাষ্ট্রপতিকে হত্যা ও অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হয়। ২০ আগস্ট সামরিক শাসন জারি ইত্যাদি–সবই সংবিধান ভঙ্গ করে করা হয়েছিল, এই সকল ঘটনা ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা, আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থি, মহান সংবিধান এবং সংবিধানে ব্যক্ত সকল বিধান থাকা সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রদ্রোহিতা ঘটেছিল। এখানেই শেষ নয়, দেশের রাষ্ট্রপতি ও তাঁর পরিবারের প্রায় সবাইকে যারা হত্যা করল তাদের যেন বিচারের সম্মুখীন হতে না হয় সে জন্য তদানীন্তন শাসকগণ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫-এ Indemnity Ordinance মারফত বিচারের পথ বন্ধ করে তথাকথিত আইন করে আইনের শাসনের পথ বন্ধ করে। এই রাষ্ট্র ছিল তখন একটি Totalitarian বা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সেখানে আইনের শাসন কথাটিই ছিল এক নিদারুণ রসিকতা। ২ নভেম্বর ১৯৭৫-এ দিবাগত রাতে কিছুসংখ্যক সশস্ত্র ব্যক্তি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে উপস্থিত হয়ে কারাগারের প্রধান ফটক ও অন্যান্য ফটক খোলার হুকুম দেয়। উল্লেখ্য, রাতে কোনো অবস্থাতেই ফটক খোলা

যায় না, অধিকন্তু তাদের কাছে ফটক খোলার কোনো লিখিত অনুমতিপত্রও ছিল না। কারাগার কর্তৃপক্ষ প্রথমে ফটক খুলতে অস্বীকার করলেও পরে বঙ্গভবন থেকে (তাদের বক্তব্য অনুসারে) নির্দেশ পেয়ে তারা সশস্ত্র ব্যক্তিদের দাবিমতো ফটক খুলে দেয়। তৎপর তারা বাংলাদেশের চার প্রথিতযশা নেতাকে খুন করে চলে যায়। দুর্ভাগ্যজনক এই কারণে যে মৌখিক নির্দেশ, তা যারাই হোক না, কারাগার কর্তৃপক্ষ তা মানতে একেবারেই বাধ্য ছিল না, তারা বরং যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত নির্দেশ ব্যতিরেকে ফটক খুলতে পারে না, তা সত্ত্বেও আইন ভঙ্গ করে তারা ফটক খোলে। এভাবেই তারা আইনের শাসন ভঙ্গ করে এবং ফলশ্রুতিতে জাতি তাদের চারজন নেতা হারাল এবং দেশ আবারও কলঙ্কিত হয়।

তিন ব্যক্তি সংবিধান ভঙ্গ করে পর পর দেশের রাষ্ট্রপতি হলেন। প্রথম দিকে এক পুতুল সংসদ ছিল। দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি সেই সংসদও বাতিল করলেন। তৃতীয় রাষ্ট্রপতি এক 'হ্যাঁ-না' ভোটের মাধ্যমে নিজের গদি পাকাপোক্ত করলেন। সেই সময় সংবিধান ভঙ্গ ও আইন ভঙ্গ এবং আইনের শাসন ভঙ্গের প্রতিযোগিতা চলছিল। ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে ৬ এপ্রিল ১৯৭৯-এ যখন নতুন নির্বাচিত সংসদ অধিবেশনের প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যেই ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ থেকে ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সকল অবৈধ রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপের বৈধতা পঞ্চম সংশোধনী আইনের মারফত প্রদান করে। তৎপর তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি এক ঘোষণা মারফত পরদিন ৭ এপ্রিল তারিখে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন। সংসদ সংবিধানের আওতায় সংবিধানে ব্যক্ত কার্যাবলি করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেও অবৈধ রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যের বৈধতা দিতে পারে না, যা অবৈধ তা অবৈধই থাকবে। একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল ২৪ মার্চ ১৯৮২-এ। তদানীন্তন সেনাপ্রধান সংবিধান ভঙ্গ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন, সামরিক শাসন জারি করেন, চার বছর ধরে সামরিক শাসন চালু থাকে। সামরিক আদালত প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দেয়। সামরিক শাসন চার বছর চলার পর তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচন হলো। আবারও জনগণকে ধোঁকা দিয়ে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে চার বছরের অবৈধ কার্যকলাপের বৈধতা প্রদান করা হলো। এভাবেই স্বৈরশাসন তাদের আজ্ঞাবহ সংসদকে দিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের সাথে এবং দেশের সংবিধানের সাথে প্রতারণা করল (committed fraud upon the people of Bangladesh)।

আইনের শাসনের কথা শুধু সংবিধানের পাতায় লেখা থাকলেই হয় না, মুক্তির কথা, স্বাধীনতার বাণী আইনের শাসন জনগণের আত্মায় যতক্ষণ না প্রোথিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সংবিধানই তাদের অধিকার হাতে উঠিয়ে দেবে না, সংবিধানে আইনের শাসনের কথা লেখাই থাকবে তাদের ন্যায়বিচার দেবে না। কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মচারী যদি ফৌজদারি অপরাধ করে তাকেও বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। সকলকেই মনে রাখতে হবে, ভয় পেতে হবে যে আইন ভঙ্গ করলে তাকেও শাস্তি পেতে হবে।

ওপরের প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনের শাসনের কথা বলা হয়েছে। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইন ভঙ্গকারীকে, তিনি যত বড় শক্তিশালী ব্যক্তিই হোন না কেন, একই আইনের বিধান অনুসারে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই আইনের বিধান অনুসারে একই আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে একই পদ্ধতিতে শাস্তি পেতে হবে, তবে অপরাধ প্রমাণিত না হলে মুক্তি পাবে। যদিও আইন ভঙ্গকারীকে আদালতে বিচারক বিচার করে আইনের শাসন সমুন্নত করবেন, কিন্তু তিনি যদি নিজেই আইন ভঙ্গ করেন বা অপরাধ করেন তবে আইনের শাসন তাঁকেও ক্ষমা করবে না। আইনের মানদণ্ডে তাঁরও বিচার হবে। বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশে একই বিধান। মনে রাখতে হবে যে অপরাধী যদি কারো ক্ষতি করে বা কারো বিরুদ্ধে অপরাধ করে, সে যেন মানবজাতির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করল। এখানেই আইনের শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব।

২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের Minnesota-তে demonstration (প্রতিবাদ) চলাকালীন জনৈক George Floyd কে Derek Chauvin নামে একজন পুলিশ কর্মকর্তা হাঁটুর নিচে তাঁর ঘাড় চেপে রাখার ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বিচারে Derek Chauvin-এর সাড়ে ২২ বছর জেল হয়। তা ছাড়া Minneapolis কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২৭ মিলিয়ন ডলার Floyd পরিবারকে প্রদান করে। একেই বলে আইনের শাসন। আমাদের দেশেও অনেক সময় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় পুলিশের হেফাজতে আসামির মৃত্যু ঘটার সংবাদ পাওয়া যায়। তা ছাড়া নিপীড়ন করে স্বীকারোক্তি আদায়ের অভিযোগ শোনা যায়। অথচ এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট মানতে বাধ্য, অন্যথায় তাঁরা আইন ভঙ্গ করবেন, আইনের শাসন ভঙ্গ করবেন। অনেকে বলেন যে এ ছাড়া আসামিকে বিচারের সম্মুখীন করা দুরূহ। কিন্তু এ কোনো যুক্তি হতে পারে না। কোনো কারণেই আইন ভঙ্গ করা যাবে না। প্রয়োজনে অধিকসংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে, তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে, তাঁদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। তবে তাঁদের সঠিকভাবে অর্থবহ তদন্ত করতে হবে, কিন্তু জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় যদি করা হয়, নিরুৎসাহিত করতে হবে। কারণ প্রথমত, এটা আইনের শাসনের পরিপন্থি; দ্বিতীয়ত, অন্য কোনো স্বাধীন সাক্ষ্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র দোষ স্বীকারেক্তির ওপর ভিত্তি করে আদালত খুব কম ক্ষেত্রেই সাজা প্রদান করেন।

এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় মামলা হতো, তাঁকে নানা জায়গায় ছুটে ছুটে জামিন নিতে হতো, এভাবে তিনি নিজেও ক্রমাগত আইনের শাসন ভঙ্গের শিকার হতেন, যাতে অন্য কেউ আইনের শাসন ভঙ্গের শিকার না হয়, সে কারণেই হয়তো আমাদের মহান সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই আইনের শাসনের কথা বলা হয়েছে। তা ছাড়া ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭২-এ যখন তিনি সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে এসেছিলেন তখন 'আইনের শাসন' কায়েম করার ওপরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই আইনের

শাসনের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। কারণ বঙ্গবন্ধু ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, ছিলেন জনগণের একচ্ছত্র নেতা, তিনি তাদের কষ্টের কথা নিজের অন্তরে ধারণ করতেন এবং সে কারণেই তিনি আইনের শাসনের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আমাদেরও উচিত, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বীকৃত আইনের শাসনে বিশ্বাস করা। অন্তরে ধারণ করা।

উল্লেখ্য, আইন হচ্ছে, রায়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলে দায়রা জজকে আইনের বিধান অনুসারে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে নথি পাঠাতে হয়। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে দায়রা জজগণ কঠোরভাবে এই আইন পালন করে আসছেন। উদ্দেশ্য হলো, হাইকোর্ট বিভাগ যেন সংশ্লিষ্ট Death Referenceটি দ্রুততম সময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুনানি করতে পারে, কিন্তু বর্তমানে ৮০০-এর অধিক Death Reference শুনানির অপেক্ষায়, কতশত আসামি Condemned cell-এ বছরের পর বছর ফাঁসিতে মৃত্যুর অপেক্ষায়। এর থেকে অমানবিক ঘটনা আর কী হতে পারে। মৃত্যুর জন্য Condemned cell-এ অপেক্ষমাণ আসামিদের নিকট আইনের শাসন কথাটি হাস্যকর। তেমনিভাবে যদি কোনো বিচারক আইনানুগ কারণ ব্যতিরেকে কোনো মোকদ্দমা শুনানি করতে অনীহা প্রকাশ করেন, বা আংশিক শ্রুত মোকদ্দমা শুনানি সম্পন্ন করতে অহেতুক বিলম্ব করেন বা শুনানি শেষে রায় না দিয়ে মাসের পর মাস ফেলে রাখেন তাহলে আইন ভঙ্গ হয় কি না জানি না, কিন্তু অবশ্যই আইনের শাসন ভঙ্গ হয়। তবে এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে দেশের জনগণকেও সজাগ থাকতে হবে। যেমন এথেন্সের জনগণ তাদের ম্যাজিস্ট্রেটদের কার্যকলাপের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখত, তারা জানত eternal vigilance-ই শুধু তাদের অধিকার সমুন্নত রাখতে পাবে, অন্যথায় নয়। এ কথা সকল যুগে, সকল দেশেই প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে Kangaroo court-এ বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যা ছিল আইনের শাসন ভঙ্গের এক চরম লজ্জাজনক উদাহরণ।

শেষকথা, যে পদ্ধতিতে ধনী-দরিদ্র, শক্তিশালী-দুর্বল, প্রভাবশালী-অক্ষম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সকলের ওপর সমভাবে, একই মানদণ্ডে আইনের প্রয়োগ হয়, সেই পদ্ধতিকেই বলে আইনের শাসন।

লেখক : বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি।

বিলেতে মুক্তিযুদ্ধ

শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

আজ যেমন সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মানুষ ছড়িয়ে আছে, ১৯৭১ সালে তা ছিল না। তবে যুক্তরাজ্য ও আমেরিকায় বেশ কিছু প্রবাসী বাঙালি বসবাস করতেন। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যেই ছিল সর্বাধিকসংখ্যক বাঙালি। সে সময়ের লক্ষাধিক বাঙালির বাস ছিল যুক্তরাজ্যে। বেশির ভাগই ছিলেন কর্মজীবী, তবে বেশ কিছু ছাত্রও ছিলেন। বিলেতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা বেশ পুরনো। এটি প্রাথমিকভাবে বিরাজ করছিল মূলত প্রগতিশীল বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে। অবশ্য অন্য বাঙালিরাও ক্রমান্বয়ে এতে শরিক হয়েছিলেন। এই চেতনাকে ঘিরেই ষাটের দশকেই গড়ে ওঠে 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস'-এ প্রগতিশীল ছাত্রদের একটি গোষ্ঠী। সেটি একটি ছাত্রাবাস হওয়ায় সেখানে বসবাসরত ছাত্রদের সুযোগ ছিল বাঙালিদের অধিকার নিয়ে রাজনীতি চর্চা করার। সে সময়টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশসুলভ আচরণের কারণে, বাঙালিদের ভাষা এবং সংস্কৃতির ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের আক্রমণের কারণে এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক গোষ্ঠী দ্বারা গোটা পাকিস্তানে সামরিক একনায়কত্বের কারণে সকল প্রগতিশীল বাঙালির মনে গভীর ক্ষোভের। বেশ কয়েকজন সাহসী এবং রাজনৈতিক অধিকারসচেতন বাঙালি ছাত্র তখন যুক্তরাজ্যে পাঠরত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আমিরুল ইসলাম (পরে ব্যারিস্টার), জাকারিয়া চৌধুরী (সদ্য প্রয়াত), মওদুদ আহমদ (পরে ব্যারিস্টার, কয়েক মাস আগে প্রয়াত), আলমগীর কবির (পরে প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক), বাদল রশিদ, শেখ আব্দুল মান্নান, জগলুল হোসেন, তোজাম্মেল হক, আব্দুর রাজ্জাক, লুৎফর রহমান শাজাহান, আমির আলী, ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী (পরে ব্যারিস্টার)। চিন্তা-চেতনায় তাঁরা সকলেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং তখন থেকেই ভাবতেন স্বাধীনতা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই বাঙালির মুক্তি সম্ভব। নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতা দ্বারা তাঁরা যুক্তরাজ্যপ্রবাসী কর্মজীবীদের মধ্যেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা বিস্তার করতে থাকেন, আর এই চেতনায় উদ্বুদ্ধদের মধ্যে ছিলেন তোছাদ্দক আহমেদ, মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ, মোতালিব চৌধুরী, রমজান আলী প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধকালেও তাঁরা সকলেই সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন।

ষাটের দশকের মধ্য এবং শেষভাগে বহু ছাত্র যুক্তরাজ্য গমন করলে বাঙালি চেতনায় উদ্বুদ্ধদের সংখ্যা বেড়ে যায়। আর সে সময় যুক্তরাজ্যে নবাগতদের মধ্যে

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুলতান মাহমুদ শরিফ, মোহম্মদ হোসেন মঞ্জু, (সম্প্রতি প্রয়াত), জিয়াউদ্দিন মাহমুদ (পরে ব্যারিস্টার), নিখিলেশ চক্রবর্তী, সুবেদ আলী টিপু, যাঁরা বাঙালিদের চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষার কথা বাঙালি সম্প্রদায়ের বাইরে প্রচারের প্রয়াসে বেশ কয়েকজন ইংরেজ, ভারতীয়, পাকিস্তানিকেও আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার থমাস উইলিয়ামস কিউসি (এমপি), পিটার শোর (এমপি), জন স্টোন হাউস (এমপি), লর্ড ব্রুকওয়ে, জন এনালস (মানবাধিকার নেতা), মার্টিন এনালস (অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব, গান্ধী শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত), মাইকেল বার্নস (এমপি), ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ (ওয়ার অন ওয়ান্টের প্রধান), তারেক আলী (অক্সফোর্ডের ছাত্রনেতা এবং পরে শ্রমিক দলের নেতা), তারাপদ বসু (ইন্ডিয়া লীগ প্রধান), সিবগাত কাদরি (পরে ব্যারিস্টার এবং কিউসি)। ১৯৬৫ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার দাবি যুক্তরাজ্যের বাঙালি মহলেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। সে সময়ে যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগও বিশেষ ভূমিকা এবং কর্মপন্থা গ্রহণ করে, যা ছিল মূলত বাঙালিদের মধ্যে চেতনাবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

১৯৬৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি এবং এতে পশ্চিম পাকিস্তানের নিষ্ক্রিয়তার কারণে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাঙালিদের মধ্যেও স্বাধীনতার দাবি প্রকট হয়ে ওঠে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময়ে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাঙালিরা বিশেষ ভূমিকায় নেমে পড়েন। তাঁরা যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী এবং পার্লামেন্ট সদস্য ব্যারিস্টার থমাস উইলিয়ামস কিউসিকে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন সেই মামলায় বঙ্গবন্ধু এবং অন্যদের পক্ষে আইনি লড়াইয়ের জন্য। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয়ের পর পশ্চিম পাকিস্তানিদের সন্দেহজনক আচরণের কারণে বাঙালিদের স্বাধীনতার প্রবণতা বাংলার মাটিতে প্রবল হলে তার ঢেউ যুক্তরাজ্যেও পৌঁছায়। স্বাভাবিক কারণেই প্রাথমিক উদ্যোগ নিতে হয় ছাত্রসমাজকে। তখন পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন ছিল সকল পাকিস্তানি ছাত্রদের সংস্থা, তবে এর মধ্যে বাঙালি ও পাকিস্তানি বিভাজন ছিল স্পষ্ট। সেই সংস্থার দপ্তর এবং কর্মকাণ্ড চলত নাইটস ব্রিজ এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তান ছাত্রাবাসে। '৭০-এর নির্বাচনের পর রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সাথে যুক্তরাজ্যের ছাত্ররাজনীতিতে তার প্রভাব পরে, ফলে বাঙালি ছাত্ররা পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন থেকে আলাদা হয়ে বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি গঠন করে ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জিন্নাহর ছবি এবং পাকিস্তানের পতাকা জ্বালিয়ে দেয় ছাত্রাবাস থেকে। এটি গঠনের পেছনে মূল ভূমিকায় ছিলেন সুলতান মাহমুদ শরিফ, ওয়ালি আশরাফ, মোহম্মদ হোসেন মঞ্জু, লুৎফর রহমান শাজাহান, জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, নিখিলেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রথমত ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত ইস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয় মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জুকে এবং দ্বিতীয় পদ দেওয়া হয় খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে (পরে বিএনপি নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ)। এই সংস্থার চতুর্থ অবস্থান দেওয়া হয় শফিউদ্দিন বুলবুল মাহমুদ (পরে ব্যারিস্টার) এবং পঞ্চম স্থানে রাখা হয় আমাকে। উল্লেখ্য যে

সদ্য পিএইচডি গবেষণার জন্য যুক্তরাজ্যে আসা খন্দকার মোশাররফ লন্ডনযাত্রার পূর্বে ছাত্রলীগের এক তুখোড় নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর এক বড়মাপের সৈনিক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুক্তরাজ্যব্যাপী দেড় শতাধিক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, কিন্তু বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি ছিল দ্বিতীয় কমিটি। এর আগে কার্ডিফে সেলিম সাহেবের নেতৃত্বে ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট নামীয় সংস্থাটি ছিল প্রথম কমিটি। মার্চের শেষের দিকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে এসে আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলে কমিটিগুলোর মধ্যে একতা নিশ্চিত হয় এবং একই সাথে স্টিয়ারিং কমিটি নামে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক কমিটি গঠিত হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন আজিজুল হক ভুইয়া, শেখ আব্দুল মান্নান, কবির চৌধুরী, মনোয়ার হোসেন, শামসুর রহমান । এর সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন ভিকারুননিসা স্কুলের সাবেক অধ্যক্ষ লুলু বিলকিস বানু। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে এসেই ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম এবং ছায়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেনিস হিলিসহ বিভিন্ন ব্রিটিশ নেতার সাথে বৈঠক করে বাঙালিদের দাবির কথা জানান। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের জন্য আমরা মুখিয়ে ছিলাম এবং সেদিনই পাকিস্তান দূতাবাস দখল করার জন্য কয়েক শত লোক একত্র হয়েছিলাম। বিবিসি বাংলা বিভাগে সেরাজুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মকর্তার সহায়তায় ওই দিনই আমরা বঙ্গবন্ধুর বিশ্বনন্দিত ভাষণটি শুনতে পেরেছিলাম। আমরা হাইড পার্কে মিলিত হয়ে বিশাল শোভাযাত্রা নিয়ে পাকিস্তান দূতাবাস দখলের জন্য এগোতে থাকলে দূতাবাসের কাছাকাছি জায়গায় পুলিশ আমাদের বাধা দিলে দূতাবাস দখল করা সম্ভব হয়নি, তবে সেদিনের শোভাযাত্রা শুধু বাঙালিদের মধ্যেই নয়, ইংরেজদের কাছেও পাকিস্তানিদের দ্বারা গণহত্যার কথা পৌঁছাতে সহায়ক হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর আমাদের সংস্থার নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রাখি এবং এতে সেই ১২ জনের বাইরে আরো অনেককে সদস্য করা হয়, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ক্যামব্রিজে অধ্যয়নরত সুরাইয়া খানম (প্রয়াত), সৈয়দ মোজাম্মেল আলী (বর্তমানে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহসভাপতি), মাহমুদ এ রৌফ, নুরুল আলম, আফরোজ আফগান চৌধুরী (পরে হবিগঞ্জের পিপি), আকতার ইমাম (পরে ব্যারিস্টার), আনিসুর রহমান (পরে ব্যারিস্টার এবং ব্রিটিশ রানির দেওয়া ওবিই খেতাবপ্রাপ্ত), আমিনুল হক (পরে ব্যারিস্টার এবং মন্ত্রী), আনিস আহমেদ (জনমতের নির্বাহী সম্পাদক), আবুল হাসান চৌধুরী কায়সার (পরে প্রতিমন্ত্রী), আরশ আলী (পরে ব্যারিস্টার), হাবিবুর রহমান ভুইয়া, আব্দুল মজিদ চৌধুরী মঞ্জু, আব্দুল হাই (পরে সিলেট জেলা বারের সভাপতি), মুজিব, ফজলে রাব্বি খান, সৈয়দ ফজলে এলাহী (পরে ড. এলাহী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), হিজত আলী প্রামাণিক (পরে ড. প্রামাণিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), আক্তার ফেরদৌস লাকী প্রমুখ। বাম রাজনীতির সাথে জড়িত নিখিলেশ চক্রবর্তী, হাবিবুর রহমান, সাইদুর রহমান মিয়া (পরে ব্যারিস্টার), ডা. নুরুল আলম, রেনু

চক্রবর্তী, পরিমল গুহ, শ্যামা প্রসাদ ঘোষ (পরে ব্যারিস্টার) প্রমুখরাও আন্দোলনে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। মার্চ মাসের শুরু থেকেই আমাদের মুখ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে প্রচারণা চালানো, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি। ২৬ মার্চও আমরা তেমনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রচারণা চালানোর সময় সুলতান শরিফ জানালেন দেশে গণহত্যা শুরু হয়ে গেছে, এখনই প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির দরজায় অনশন শুরু করতে হবে। তাঁর কথামতো আমি এবং আফরোজ আফগান চৌধুরী স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি, ১০ নং ডাউনিং স্টিটের সামনে অনশন শুরু করলাম। সে সময় প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির চারপাশে এত নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং বেষ্টনী ছিল না বলে ঠিক তাঁর বাড়ির সামনে ফুটপাতেই শুরু হয় অবস্থান, সেটি ছিল যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে এ ধরনের প্রথম পদক্ষেপ। তখন কোনো দপ্তর ছিল না। তাই অনশনের বিশাল জায়গায় ছুটে আসত শত শত বাঙালি। স্থানটি পার্লামেন্টের কাছে হওয়ায় পার্লামেন্টের অনেক সদস্যও চলে আসেন আমাদের কথা শোনার জন্য, আসেন বহু সাংবাদিক, ট্যুরিস্ট এবং সাধারণ ইংরেজ। আমাদের অনশনের খবর ছবিসহ ব্রিটিশ টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে ব্যাপক প্রচারের কারণে গোটা যুক্তরাজ্যের সব অঞ্চলের প্রচুর লোকের আগমন ঘটায় যান নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। অনশনের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে ব্রিটিশ রাজনীতিক, সাংবাদিকদের মধ্যে আমাদের দাবিসমূহ জানাজানি হয়, যার মধ্যে ছিল বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান, পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ এবং আর্থিক সাহায্য বন্ধ করা। অনশনকালে আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে যেসব এমপি এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাইকেল বার্নস, ব্রুসডগলাস ম্যান, জন স্টোন হাউস, আর্থার বটম লি, টবি জেসেল, ডেনিস হিলি, টনি বেন, লর্ড ব্রুকওয়ে, লেডি গ্রিফিথ। এ ছাড়া এসেছিলেন শ্রমিক নেতা আর্থার স্কারগিল, গ্রেটার লন্ডন কাউন্সিলপ্রধান কেন লিভিং স্টোন, মানবাধিকার নেতা জন এনালস, অ্যামনেস্টিপ্রধান মার্টিন এনালস, সাংবাদিক ডেভিড উইম্বলবি, ডেভিড ফ্রস্ট, বিবিসির কমল বোস, সেরাজুর রহমান, শ্যামল লোধ, দীপঙ্কর ঘোষ। তিন দিন পর সংসদ সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী পিটার শোর এসে আমাদের অনশন ভঙ্গ করার সময় এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করেন যে পরদিনই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাকিস্তানিদের দ্বারা গণহত্যা বন্ধের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে পিটার শোর সাহেব পরদিনই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করান। তবে সেদিন মাত্র ৩০ জন সেই প্রস্তাবের পক্ষে অংশ নেন। ক্রমান্বয়ে আমাদের প্রচারণার ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমাদের সমর্থন বাড়তেই থাকে। পরবর্তী সময়ে সেখানে বহুবার পাকিস্তানবিরোধী প্রস্তাব পাস হয়, যাতে আরো অধিক সদস্য অংশ নিয়েছিলেন। এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সামনে অনশন করেছিলেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আব্দুল হাই এবং রিজিয়া চৌধুরী। মে মাসে পাকিস্তান ক্রিকেট দল বিলেতে গেলে আমরা ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে তাদের

খেলা বর্জন করার দাবি সফলতার সাথেই পৌঁছাতে পেরেছিলাম বলে তাদের খেলা দেখতে লোক সমাগম হয়নি। তাদের সম্মানে দেওয়া অনুষ্ঠানও আমরা পণ্ড করতে পেরেছিলাম। ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় লেখালেখি এবং বিজ্ঞাপন প্রদানও আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল।

পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে ধরনা দেওয়া ছাড়াও লন্ডনে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে প্রচারণা চালানোও আমাদের কার্যাবলির অংশ ছিল। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মধ্যে প্রচারণা গতিশীল করার জন্য আমরা মূল তিনটি দল, যথা–শ্রমিক দল, রক্ষণশীল দল এবং উদারনৈতিক দলগুলোর বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে প্রচারণা চালাতাম এবং বক্তৃতা প্রদান করতাম। কেননা তাদের সম্মেলনগুলোতে শীর্ষ নেতাসহ অনেক বেশিসংখ্যক সদস্য পাওয়া যেত। এসব সম্মেলনে আমরা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছিলাম এই অর্থে যে তিনটি দলই একপর্যায়ে বাংলাদেশের স্বীকৃতি, গণহত্যা বন্ধ এবং পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিলেতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা এবং প্রচারণার মাধ্যমে আমরা সে দেশের ছাত্র এবং শিক্ষক সমাজের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছিলাম। ব্রিটিশ জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন এলাকায় মিছিল করতাম। এপ্রিল মাসে পল কনেট এবং মেরিয়েটা প্রকোপের নেতৃত্বে কয়েকজন ইংরেজ বাংলাদেশের গণহত্যায় মর্মাহত হয়ে 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' নামে যে সংগঠন সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠায় এবং কর্মকাণ্ডে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ভূমিকা রাখতে হয়েছিল। সেই সংস্থার জন্মের পর বিলেতে বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এদের আয়োজনে। ১ আগস্ট কেন্দ্রীয় লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে যে বিশাল সম্মেলন হয় তাতে বাঙালি-অবাঙালি মিলে প্রায় ২০ হাজার লোকের সমাবেশ হয়, যাতে কয়েকজন ব্রিটিশ লর্ড এবং এমপি ভাষণ দিয়ে গণহত্যা বন্ধে পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগ ছাড়াও বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতির দাবি তোলেন। এর আগে জুলাই মাসেও তাঁরা একই জায়গায় সম্মেলন করেন, যখন শ্রী বিমান বসু বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট প্রদর্শন করেন। আগস্টের সম্মেলন শেষে অপারেশন ওমেগা নাম ধারণ করে পল কনেট এবং তাঁর স্ত্রী এলেন কনেটের নেতৃত্বে একটি ত্রাণ এবং ওষুধবাহী গাড়ির বহর বাংলাদেশে রওনা হয়, যদিও যশোরে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের আটক করেছিল। ফজলে হাসান আবেদ (পরে স্যার ফজলে হাসান) অ্যাকশন বাংলাদেশের কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন। শুরু থেকেই পাকিস্তান দূতাবাসের তিনজন কূটনীতিক যথা–মহিউদ্দিন আহমেদ, লুৎফল মতিন এবং হাবিবুর রহমান আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পরে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জন্ম হয় জেবুন্নেছা বখত ও আনোয়ারা জাহানের নেতৃত্বে। মহিলা পরিষদের নেতৃত্বে আরো ছিলেন রাবেয়া ভুইয়া (পরে ব্যারিস্টার), মিসেস খায়ের, ডা. হালিমা আলম, সেলিনা মোল্লা, শেফালী, শেলি, ফেরদৌসি রহমান, রাজিয়া চৌধুরী প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমেও প্রচারণা চালানোর জন্য বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন এনামুল হক (পরে জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক, ড. এনামুল হক), মুন্নি রহমান, রুনি সুলতানা, ফাহমিদা মঞ্জু মজিদ, মুজাহিদ, আফরিন কামাল প্রমুখ। অন্যান্য মর্যাদায় ভূমিকা রেখেছিলেন শিল্পী আব্দুর রউফ (যিনি পরে আমাদের সংবিধান লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং ফিল্ম আর্কাইভের প্রধান হয়েছিলেন), ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন, রাজিউল হাসান রঞ্জু (পরে রাষ্ট্রদূত), শামসুল মোর্শেদ লাভলু (পরে ব্যারিস্টার ও রাষ্ট্রদূত), অধ্যাপক কবির, জাকিউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ মোবাচ্ছির (আলো) চৌধুরী, ব্যারিস্টার শাহ ফেরদৌস, ফজলে রাব্বি মাহমুদ হাসান (পরে ড. ফজলে রাব্বি মাহমুদ হাসান), মতিউর রহমান চৌধুরী, গাউস খান (যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ সভাপতি), তৈয়বুর রহমান, আতাউর রহমান খান, হরমুজ আলী, মিম্বর আলী, ইসহাক, আহমেদ হোসেন জোয়ার্দার, রাজ্জাক খান প্রমুখ। লন্ডন ছাড়া অন্যান্য শহরেও আন্দোলন হয়েছিল। বার্মিংহামে নেতৃত্ব দেওয়াদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জগলুল পাশা ও তাঁর স্ত্রী, তোজাম্মেল (টনি) হক প্রমুখ। ম্যানচেস্টারে মতিন সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে পরামর্শ দান করতেন বঙ্গবন্ধু গবেষক এবং বহু বইয়ের লেখক আব্দুল মতিন এবং বিবিসির সেরাজুর রহমান। মে মাসে ফরাসিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়ার জন্য দাতাগোষ্ঠীর বৈঠকে গিয়ে আমরা পাকিস্তানকে সাহায্য না দেওয়ার দাবি জানালে সংস্থাটি পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদান বন্ধ করেছিল। আমরা ইউরোপের কয়েকটি দেশে গিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পাকিস্তান কর্তৃক চালিয়ে যাওয়া গণহত্যার কথা পৌঁছাতে পেরেছিলাম। একসময় বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন নামে ডাক্তারদের সংগঠন তৈরি হয়, যাতে ছিলেন ডা. হাকিম, ডা. আলম, ডা. হালিমা আলম, ডা. জোয়ার্দার, ডা. হাফিজসহ বেশ কয়েকজন ডাক্তার। কিছু সময়ের জন্য ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীও (রণাঙ্গনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত) ওই সংস্থায় ছিলেন। মুজিবনগরে এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপর আমরা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই।

যুক্তরাজ্য সরকার তখনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দিলেও আমাদের মিশন প্রতিষ্ঠায় কোনো বাধা দেয়নি। যুক্তরাজ্যের ভারতীয় দূতাবাস সার্বক্ষণিক আমাদের সহায়তায় ছিল। নভেম্বর মাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লন্ডনে এলে তিনি বাঙালি ও ভারতীয়দের এক মহাসম্মেলনে ভাষণ দেন, যা বাস্তবায়িত করতে আমাদেরও ভূমিকা ছিল। সেই সভায় শ্রীমতী গান্ধী ইঙ্গিত দিলেন ভারত শিগগির প্রত্যক্ষ সমরে নামবে। ৬ ডিসেম্বর ভারত এবং ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর আমরা আনন্দে ফেটে পড়ি এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানাতে যাই। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণ খবরের পর সকল বাঙালিই আনন্দে আত্মহারা

হয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েছিল। বিলেতে অবস্থানরত বাঙালিদের কর্মকাণ্ডের পুরো ফিরিস্তি দিতে আরো অনেক কিছু লেখার প্রয়োজন রয়েছে, যাদের নাম লেখা হয়েছে তার বাইরেও আরো অনেক লোক অবদান রেখেছেন, তাঁদের কর্মকাণ্ড ছিল অনেক ব্যাপক। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস কাল তাঁরা যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের দাবির পক্ষে, পাকিস্তানি গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে জনমত সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখতে পেরেছিলেন। তাঁদের এবং অন্যান্য দেশের প্রবাসীদের অবদান স্বীকার করে সরকার ২০১৮ সালে প্রবাসী আন্দোলনকারীদেরও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করেছে, যেটি একটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত। কেননা বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে প্রবাসী বাঙালিদের অবদান অনস্বীকার্য।

লেখক : আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও উন্নয়নের পথপরিক্রমা

গোলাম রহমান

জাতি একই সাথে ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে। ভারত বিভাজন, বাংলাদেশের স্বাধিকার-স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনকথা একই সূত্রে গাথা। অন্যদিকে জন্মলগ্নে যে দেশটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও পরবর্তী সময়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আক্ষায়িত করেছিলেন ৫০ বছরের পথপরিক্রমার পর সে দেশটি বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে।

ভারতে তখন ব্রিটিশ শাসন। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিব বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগে যোগ দেন। এর দুই বছর পর তিনি ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'পাকিস্তান দাবির পক্ষে গণভোট' খ্যাত ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে এবং পরবর্তীতে সিলেট গণভোটে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সংগঠক ও প্রচারক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্টে প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। ধর্মভিত্তিক 'দ্বিজাতি' তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। দেশবিভাগের পরপরই শেখ মুজিব কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন এবং ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় হন। পাকিস্তান পূর্ব-পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশ থেকে অন্য অংশের দূরত্ব প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার। পূর্ব পাকিস্তান দেশের ৫৬ শতাংশ বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আবাসস্থল। দুই অংশের ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন। অন্যদিকে দেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক কর্তৃত্ব মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় উর্দু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর হাতে। দেশের রাজধানী ও প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহও পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। স্বাভাবিকভাবেই নতুন রাষ্ট্রে বাঙালিদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি সামনে

এসে যায়। এ প্রেক্ষাপটে ৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮-এ শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮-এ প্রথম আঘাত আসে ভাষার ওপর। পাকিস্তান গণপরিষদে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের বিরোধিতার ফলে বাতিল হয়ে যায়। ২ মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি সভা ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত হয় এবং শেখ মুজিবের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদের আহ্বানে ১১ মার্চ ১৯৪৮ ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। শেখ মুজিবসহ কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী গ্রেপ্তার হন। ১৫ মার্চ তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং মুক্তি-পরবর্তী শোভাযাত্রা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় অনুষ্ঠিত সভায় শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসমাবেশে এবং ২৬ মার্চ কার্জন হলে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একটি এবং সেটি উর্দু' ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবসহ উপস্থিত ছাত্ররা দাঁড়িয়ে 'নো, নো' বলে প্রতিবাদ করেন। ৯ মার্চ, ১৯৪৯ পাকিস্তান সরকার বাংলাকে আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায্য দাবি পূরণে অনীহা এবং ভাষার ক্ষেত্রে নীতির বিরোধিতায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ২৯ জুন, ১৯৪৯-এ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কারা অন্তরীণ শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। ২৭ জানুয়ারি, ১৯৫২-এ পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন আবারও ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তাঁর এই ঘোষণা ভাষা আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দান করে। এ সময়ে জেলে থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিব নানা দিকনির্দেশনা দিয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আয়োজনে সাহসী ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। সাধারণ ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয় এবং মিছিল নিয়ে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের দিকে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। পুলিশ লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে ওই দিন চারজন ও ২২ ফেব্রুয়ারি আরো চারজনের মৃত্যু হয়। সারা প্রদেশে দাবানলের মতো অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। শেখ মুজিব জেলে থেকেই ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন পালন করেন এবং তাঁর এই অনশন ১৩ দিন স্থায়ী ছিল।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৪ নভেম্বর সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয় এবং আসন্ন প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ আসনের মধ্যে ২২৩টিতে বিজয় অর্জন করে। এর মধ্যে

আওয়ামী লীগ জয়ী হয় ১৪৩টি আসনে। ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলা প্রদেশে সরকার গঠন করে এবং শেখ মুজিব মন্ত্রী পরিষদে যোগদেন। ৭ মে ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ পাকিস্তান জাতীয় সংসদে বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধান পাস হয়।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে, দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা জোরদার হয়। ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয় এবং শেখ মুজিব পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যবহার, দেশ পরিচালনায় বাঙালিদের অংশীদারি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে সোচ্চার থাকায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের শাসনকালের বেশির ভাগ সময় এবং বাঙালি জাতির অধিকার-স্বাধীনতাসংগ্রামে শেখ মুজিব পাকিস্তানের ২৪ বছর শাসনামলে মোট ৪,৬৭৫ দিন, অর্থাৎ প্রায় ১৩ বছর কারাবাস করেছেন।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। একই বছর ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখাসংবলিত ছয় দফা দাবি পেশ করেন, যা পরবর্তী সময়ে বাঙালির 'প্রাণের দাবি' ও 'বাঁচা-মরার দাবি' হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি আইয়ুব পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচিতে ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ব পাকিস্তানে দুর্বার গণ-আন্দোলন সূচনা হয়। অন্যদিকে ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের শোচনীয় অবস্থা ও 'তাসখন্দ চুক্তি' পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সারা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯-এ লাহোরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের 'গোলটেবিল বৈঠক' আহ্বান করেন। ওই বৈঠকে শেখ মুজিবের যোগদানের পথ সুগম করার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করে। তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। পরদিন রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত বিশাল জনসভায় ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

'গোলটেবিল বৈঠকে' বঙ্গবন্ধু বাঙালির প্রাণের দাবি ছয় দফা উত্থাপন করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের 'এক ইউনিট' বাতিল ও প্রত্যেক নাগরিকের ভোটের সমান অধিকারের দাবি জানান। সমঝোতা ছাড়াই ১৪ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক শেষ হয়। সারা দেশে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে গণ-অসন্তোষ চরম পর্যায়ে পৌঁছে। ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতার মসনদে বসেন। তিনি ২৮ নভেম্বর, ১৯৬৯-এ সামরিক ফরমান জারির মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের 'এক ইউনিট' বাতিল করেন এবং প্রত্যেক নাগরিকের ভোটের সমান অধিকারের দাবি মেনে নেন। ডিসেম্বরে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব "এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' হিসেবে পরিচিত হবে", ঘোষণা দেন।

১৯৭০-এর জাতীয় নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়ী হয়ে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা লাভ করে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৪৪টি আসনের ৮৫টি আসনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি জয়ী হয়। শুরু হয় ষড়যন্ত্র। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় সংসদের সভা আহ্বানে কালক্ষেপণ করতে থাকেন। অবশেষে ৩ মার্চ, ১৯৭১-এ ঢাকায় সংসদের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু মার্চের ১ তারিখে ভুট্টোর পরামর্শে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল পালনের ঘোষণা দেন। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অনির্দিষ্টকালের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং বস্তুত সেদিন থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের কর্তৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। ৭ই মার্চে রমনা রেসকোর্সে বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তিনি আরো বলেন, 'আমি যদি নির্দেশ দেয়ার জন্য নাও পারি, তোমাদের যার যা কিছু আছে তা দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে।'

৬ মার্চে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ সংসদ সভার নতুন তারিখ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে বিপুলসংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্রসম্ভার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ইয়াহিয়া ১৫ মার্চ এবং ভুট্টো ২১ মার্চ ঢাকায় আসেন। দফায় দফায় বৈঠক হয়, কিন্তু কোনো সমঝোতা ছাড়াই ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ গভীর রাতে 'Operation Search Light' খ্যাত ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নির্দেশ দিয়ে সন্ধ্যায় ঢাকা ত্যাগ করেন। শেখ মুজিব তাঁর সহকর্মীদের আত্মগোপনে চলে যেতে বলেন। তিনি তাঁর বাসভবনে থেকে যান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরুর পর ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (২৫ মার্চ রাত্র ১২টা ২০ মিনিট) তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং রাত ১টা ১০ মিনিটে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ওয়্যারলেস ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে সারা দেশে প্রচারিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের গবেষণা

গ্রন্থ Bangladesh: A Country Study অনুযায়ী ২৬ মার্চ 'the independent, sovereign Republic of Bangladesh was first proclaimed in a radio message broadcast from a captured station in Chittagong'.

১০ এপ্রিল ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয়। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলার (বর্তমানে মুজিবনগর) আম্রকাননে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ পাঠ করেন। পরবর্তী ৯ মাস বঙ্গবন্ধুর নামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশে-বিদেশে স্বাধীনতার সপক্ষে প্রচার-প্রচারণা এবং কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালিত হয়। বাংলার দামাল ছেলে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণে বিপর্যয়ের মুখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করে। পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর নিকট সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তান দখলদার বাহিনী ঢাকার রেসকোর্সে আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

স্বাধীনতাযুদ্ধে অনুপস্থিত শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল অভূতপূর্ব। স্বাধিকার-স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামে তাঁর ভূমিকার চেয়ে যুদ্ধকালীন সময়ের ভূমিকা ছিল আরো ব্যাপক ও বলিষ্ঠ। মুক্তিযুদ্ধে মুজিবর আর বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল সমার্থক, এক ও অভিন্ন। গানের ভাষায়, 'শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিববের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণী বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।' ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' অঙ্কুরিত হয়েছিল পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের সময় তাঁর পরিচর্যায় তা মহিরুহে পরিণত হয় এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' ধারণ ও লালন করেছেন এবং বলেছেন, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।'

২৬ মার্চ ১৯৭১-এ গ্রেপ্তারের পর বঙ্গবন্ধুকে পাঞ্জাবের লায়ালপুর (বর্তমান ফয়সালাবাদ) কারাগারে অন্তরীণ রাখা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহ এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাসহ মোট ১২টি অভিযোগে অভিযুক্ত করে সামরিক আদালতের ৪ ডিসেম্বরে দেওয়া রায়ে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। রায় কার্যকর করার পূর্বেই যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় হয় এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়ে ৭ জানুয়ারি, ১৯৭২ রাতে রাওয়ালপিন্ডি বিমানবন্দরে বিদায় জানান। শেখ মুজিব লন্ডন ও নয়াদিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি ১টা ৪১ মিনিটে বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে আসেন। তাঁর প্রত্যাগমনের মাধ্যমে স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় পূর্ণতা লাভ করে।

দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু দ্রুততার সাথে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ১১

জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রথম সংসদ গঠন করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথা অনুযায়ী তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। দ্রুততম সময়ে সংসদ সংবিধান প্রণয়ন করেন এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ তারিখে প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩ টিতে জয়ী হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়।

দেশে ফেরার পথেই বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে ১২ মার্চ বাংলাদেশ ত্যাগ করে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণও সম্পন্ন করা হয়। ভারত থেকে প্রত্যাগত প্রায় এক কোটি শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণভাবে আরো এক কোটিরও বেশি বাস্তুচ্যুতের পুনর্বাসন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত সড়ক ও রেলপথ পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর সচল করা হয়। প্রথম বছর ৩৭% অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। উন্নয়ন কার্যক্রম সুপরিকল্পিতভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক (১৯৭৩-১৯৭৮) প্রণয়ন করা হয়। একই সাথে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে দেশে ঘুষ-দুর্নীতির প্রসার ঘটে। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'বাংলার মাটি থেকে দুর্নীতি উৎখাত করতে হবে। দুর্নীতি আমার বাংলার কৃষক করে না। দুর্নীতি আমার বাংলার শ্রমিক করে না। দুর্নীতি করে শিক্ষিত সমাজ।' তিনি আহ্বান জানান, 'কোনো অফিস-আদালতে দুর্নীতি হলে এবং আপনাদের নিকট কেউ ঘুষ চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তিন পয়সার একটি পোস্টকার্ডে লিখে আমাকে জানাবেন। আমি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব, যাতে দুর্নীতি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।' এ সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি অপশক্তি ষড়যন্ত্রের জাল বোনে। বিদেশ থেকে খাদ্যের চালান আসা বিঘ্নিত হওয়ায় ১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। নাজুক পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৪-এ দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ১৯৭৫ সালের ২৮ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও দুর্নীতি উৎখাতের উদ্দেশ্যে তাঁর নেতৃত্বে একক রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) প্রতিষ্ঠা করেন। আওয়ামী লীগসহ দেশের সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করা হয়। তাঁর পরিকল্পিত দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্মসূচির বাস্তবায়নের সূচনালগ্নে ১৫ আগস্ট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তার হঠকারী অভ্যুত্থানে তিনি সপরিবারে নিহত হন। তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। অঙ্কুরেই জাতির পিতার দ্বিতীয় বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে শুধু একবার। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে প্রথম বিজয় দিবস পালন অনুষ্ঠানে বঙ্গভবনে আয়োজিত

অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীসহ আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠানস্থলে এলেন। আমি অবাক বিস্ময় নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। যখন কাছে এলেন, আমি পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সামরিক হিসাব বিভাগের কনিষ্ঠতম কর্মকর্তা বলে পরিচয় দিই। তিনি হাত ধরে বললেন, 'সততা ও নির্ভীকতার সাথে রাষ্ট্রের আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করবে। নিয়ম-নীতির মধ্যে সকলকে সাহায্য করবে। কাউকে কষ্ট দেবে না।' তাঁর সে উপদেশ আমার সারা কর্মজীবনের পাথেয় ছিল।

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময় ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। এই সময়টি ছিল মূলত জেনারেলদের শাসনকাল। প্রথমে জেনারেল জিয়া এবং ৩০ মে ১৯৮১ ইং তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। উভয়ই সামরিক আইন জারির মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতার বৈধতা দেন। এ সময়ে জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ শতাংশের কাছাকাছি বা তারও কম। মাথাপিছু আয়ের স্থবিরতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং দুর্নীতির ব্যাপক প্রসারের ফলে এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে গণ-অসোন্তষ দেখা দেয় এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের আন্দোলনের মুখে তিনি ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং পদত্যাগ করেন। প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন এবং তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ইং অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়লাভ করে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করে। তাঁর শাসনকালে জিডিপির প্রবৃদ্ধি কিছুটা বাড়ে। প্রথমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ১৯৯৫-এ তা ১০% অতিক্রম করে। মাগুরার উপনির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনকে অবাধ ও নির্বাচনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথা প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করে। সরকার এই দাবি অসাংবিধানিক ও অবাস্তব মনে করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ ইং ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দলসমূহ নির্বাচন বর্জন করে এবং দুর্বার গণ-আন্দোলনের সূচনা করে। দেশে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। নতুন সংসদের একমাত্র অধিবেশনে ২১ মার্চ, ১৯৯৬ ইং তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করা হয়। রাষ্ট্রপতি ৩০ মার্চ সংসদ ভেঙে দেন এবং বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং তাঁর সময়ে ১২ জুন, ১৯৯৬ ইং অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তাঁর শাসনামলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ৫.৬% উন্নীত হয়। মুদ্রাস্ফীতিও নিয়ন্ত্রিত থাকে। ২০০১ সালের ১৫ জুন বিচারপতি লতিফুর রহমান প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ করেন। সে

সময়ে আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সচিব ছিলাম। দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি ১৩ জন সচিবের বদলির আদেশ জারি করেন, তবে আমার বদলির আদেশ পরে বাতিল করা হয়। তাঁর সরকার আওয়ামী লীগ সরকার গৃহীত বেশ কিছু পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত বাতিল করে। নিরপেক্ষতার লেবাসে তাঁর সরকারের কার্যক্রম ছিল পক্ষপাতদুষ্ট। এতে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। ১ অক্টোবর ২০০১ ইং অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হয় এবং বেগম জিয়া আবারও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর এ মেয়াদে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জঙ্গিবাদের ব্যাপক উত্থানের ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান অবনতি হয়। সে সময়ে ৬৪ জেলায় একসাথে বোমা হামলা, চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার, ২১ আগস্টে শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টায় আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলাসহ অসংখ্য ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশ পর পর ৫ বছর একনাগাড়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ধারণা সূচকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। সার, বিদ্যুৎসহ নানা পণ্যের সরবরাহ সংকটের ফলে বিভিন্ন স্থানে গণ-অসন্তোষ দেখা দেষ। সরকার পছন্দের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতিদের বয়স বৃদ্ধি করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের আন্দোলনের মুখে বিচারপতি কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজেই প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পক্ষপাতমূলক আচরণে দেশে চরম রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ উপদেষ্টা ড. আকবর আলিসহ চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। তা সত্ত্বেও বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত না হয়ে তিনি ২২ জানুয়ারি ২০০৭ ইং নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ধার্য করেন। তাঁর অধীনে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে সংশয় অব্যাহত থাকে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। দেশব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘাত ব্যাপক আকার ধারণ করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে ১১ জানুয়ারি, ২০০৭ ইং রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে নির্বাচন স্থগিত করেন এবং প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরদিন ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয় এবং সরকার ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের রোডম্যাপ ঘোষণা করে। ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ ইং যথারীতি নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জয়ী হয়ে ৩ জানুয়ারি ২০০৯ শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

উচ্চ আদালতে আপিল বিভাগের রায়ের প্রেক্ষাপটে ২০১১ সালে গৃহীত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথার

বিলুপ্তি ঘটে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ আবারও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। তবে বিএনপি-জামায়াত জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং নির্বাচনকালীন সময়ে ও পরবর্তীতে ব্যাপক সহিংস কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকার দক্ষতার সাথে তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ মোকাবেলা করে। সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে শেখ হাসিনা একটানা তৃতীয় মেয়াদে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ সময় সরকার পরিচালিত হওয়ায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা সম্ভব হয় এবং করোনা মহামারি দেখা দেওয়ার পূর্বে বার্ষিক জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে উন্নীত হয়। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে স্বয়ংক্রিয় উন্নয়ন পর্যায়ে (Self-sustaining stage) পৌঁছে গেছে। করোনা মহামারির নেতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থামেনি। আইএমএফের হিসাবে ২০২০ সালে প্রতিবেশী ভারতের জাতীয় আয় ১০.২% সংকুচিত হওয়ার বিপরীতে বাংলাদেশের আয় বেড়েছে ৩.৮% (সরকারি হিসাবে ৫.২%)। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে মাথাপিছু গড় আয় ভারত ও পাকিস্তানের গড় আয়কে অতিক্রম করে। বাংলাদেশের গড় আয় এখন বার্ষিক ২,৫০০ মার্কিন ডলারের অধিক। বিশ্বব্যাংক বেশ আগেই বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যবিত্তের দেশ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করেছে। জাতিসংঘ নির্ধারিত মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ায় সংস্থাটি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে ২০২৬ সালে প্রস্তুতিকালীন সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জন্মলগ্নে যে দেশটিকে আখ্যায়িত করা হয়েছিল 'তলাবিহীন ঝুড়ি' ৫০ বছরের পথপরিক্রমার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তা এখন 'উন্নয়নের রোল মডেল'। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৩২ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের বড় ২৫টি অর্থনীতির দেশের একটি হবে। তখন বাংলাদেশ হবে ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। বর্তমানে অবস্থান ৪১তম। ২০৩৩ সালে বাংলাদেশের পেছনে থাকবে মালয়েশিয়া, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ।

শেখ হাসিনার হাত ধরে জাতি স্বপ্ন দেখছে ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে উন্নত বিশ্বের অংশ। তবে সবই নির্ভর করবে সংঘাত-সহিংসতা পরিহার করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার ওপর। জাতির পিতা সূচনা করেছিলেন 'দ্বিতীয় বিপ্লব'। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে তাঁর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তা অঙ্কুরেই থেমে যায়। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত কয়েক কোটি মানুষসহ

সর্বসাধারণের জীবনমানের দৃশ্যমান উন্নয়ন, মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা আয় বৈষম্য, দুর্নীতির প্রসার ও পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং 'উন্নয়নশীল দেশ' হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হওয়ার পর বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দেশকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের 'তৃতীয় বিপ্লব' অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার পক্ষেই কেবল এই বিপ্লবের সূচনা করা সম্ভব। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই।

লেখক : সাবেক চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন।

মানবাধিকার, বঙ্গবন্ধু এবং মানবিক মূল্যবোধ

নাছিমা বেগম, এনডিসি

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের মূলসুর হলো, প্রতিটি মানুষের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার। মানুষ হিসেবে এই অধিকার প্রত্যেকের প্রাপ্য; যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। মানবাধিকার শাশ্বত এবং কোনো দেশের সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, শিশু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী-আদিবাসী, তৃতীয় লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী যা-ই হোক না কেন, তিনি গ্রাম বা শহর বা বিশ্বের যে প্রান্তেই বসবাস করেন না কেন, মানুষ হিসেবে সবার সমান অধিকার।

মানবাধিকার আসলে কী? এটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি মানবাধিকার মূলত একদিকে জীবনের অধিকার, অন্যদিকে স্বাধীনভাবে কথা বলার, চলাফেরা করার; অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য–সব কিছুর অধিকার। কার্যত অধিকার ও দায়িত্ব একে অন্যের পরিপূরক। অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে অধিকার প্রদানকারীর যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি অধিকার ভোগকারীরও দায়িত্ব রয়েছে। উভয় পক্ষের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ছাড়া অধিকার বাস্তব রূপ পায় না।

মানবাধিকার একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি অনেক ব্যক্তির সমষ্টি জনগণের জন্যও সমানভাবে কার্যকর। উদাহরণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নিজের কোনো সুবিধা আদায়ের জন্য কখনো সংগ্রাম করেননি। তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন সাধারণ জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য।

কারা সদর দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'জাতির পিতার সমগ্র জেলজীবন–৩০৫৩ দিন' পাঠ করলে দেখা যায়, তিনি নিজের কোনো ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কখনো সংগ্রাম করেননি, সংগ্রাম করেছেন জনদাবি আদায়ের জন্য। জনস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের, বিশেষ করে যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো তাঁকে কারা যাপন করতে হয়েছে। বাংলা ও বাঙালির অধিকার, বিশেষ করে জনদাবি আদায়ে বঙ্গবন্ধুর এই আত্মত্যাগের বিবরণ বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ দুটির পরতে পরতে উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু জনদাবি আদায়ে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন এবং সফল হয়েছেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু অনশন শুরু করে যখন প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী, তখন পাকিস্তানের শাসকরা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

জনদাবি ও মানবাধিকার সুরক্ষায় পাকিস্তান শাসনামলের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবিতে তাঁর সংগ্রামের ঘটনাসমূহ বঙ্গবন্ধু সুনিপুণ লেখনীর মাধ্যমে অজানাকে জানার সুযোগ রেখে গেছেন। বঙ্গবন্ধু রচিত এই গ্রন্থ দুটি বঙ্গবন্ধুর অসামান্য দেশপ্রেমের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

আমাদের প্রিয় স্বদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবাধিকার সংগ্রামের ফসল হিসেবে। আর এই ফসল ফলিয়েছেন আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের ধারক-বাহক, উদ্দীপক ও মহানায়ক ছিলেন তিনি। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে, বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। আর এগুলোর সমষ্টিই হলো মানবাধিকার। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদসংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকার দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন না করলে অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে সবাইকে দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে। তাঁর ভাষায়, 'আমরা যদি একটু কষ্ট করি, একটু বেশি পরিশ্রম করি, সকলেই সৎপথে থেকে সাধ্যমতো নিজের দায়িত্ব পালন করি এবং সবচেয়ে বড় কথা সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, ইনশাল্লাহ, কয়েক বছরেই আমাদের স্বপ্নের বাংলা আবার সোনার বাংলায় পরিণত হবে।'

বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। পাকিস্তান শাসনামলের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাক্কালে ও স্বাধীনতা-উত্তর দেশ গঠনে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তিনি যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন, সেই বক্তব্যের নির্যাস থেকেই তা প্রতীয়মান হয়। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকেই বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ছিলেন। বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা স্থান পাবে না, এ বিষয়ে তাঁর প্রত্যয় ছিল অবিচল। বঙ্গবন্ধু বলতেন, এই রাষ্ট্রের মানুষ হবে বাঙালি। তাদের মূলমন্ত্র হবে–সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে সব ধর্মই সমান এবং সমঅধিকার দাবিদার। তাঁর চিন্তা-চেতনায় মানবাধিকারের অন্যতম দর্শন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সব সময়ই সমুজ্জ্বল ছিল।

বঙ্গবন্ধু দুর্নীতিকে ঘৃণা করতেন। তিনি জানতেন, দেশের উন্নয়নের অন্যতম বাধা হলো দুর্নীতি। দুর্নীতিবাজ, মুনাফাখোররা অন্য মানুষের অধিকার হরণ করে

নিজেরা মুনাফা লোটেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় দুর্নীতিবাজ-মুনাফাখোর-চোরাকারবারিদের দমনে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পিতার মতোই দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি গ্রহণ করছেন। কার্যত বাংলাদেশের মাটি থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদককে রুখে দেওয়ার এখনই সময় এবং সবার সমবেত প্রচেষ্টায় তা প্রশমিত হবে বলে বিশ্বাস করি।

বঙ্গবন্ধু একজন মানবপ্রেমী মানুষ ছিলেন। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অসামান্য দরদ। ছোট-বড়, ধনী-গরিব-নির্বিশেষে সবাইকে তিনি ভালোবেসেছেন। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মৃত্যুর আগমুহূর্তেও তিনি তাঁর মানবপ্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাক্ষী সেলিম (আব্দুল) ছোটবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাক্ষ্য দেওয়াকালে আব্দুল উল্লেখ করেন, দুজন কালো পোশাকধারী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তাঁর হাতে এবং পেটে গুলি খেয়ে তিনি দরজার সামনেই পড়ে যান। পরে সিঁড়ির পাশে হেলান দিয়ে বসে থাকা অবস্থায় দেখেন, ৪-৫ আর্মির লোক বঙ্গবন্ধুকে তাঁর রুম থেকে ধরে সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, 'ওই ছেলেটা ছোটবেলা থেকে আমাদের এখানে থাকে, একে কে গুলি করল?' এ রকম একটা অচিন্তনীয় ভীতিকর পরিস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধুর মন কেঁদে উঠেছিল কাজের ছেলে আব্দুলের জন্য। বঙ্গবন্ধু সারা জীবন অন্যের অধিকার সুরক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের, নিজের আরাম ও আয়েশের কথা ভাবেননি। অথচ বাঙালি জাতির কী দুর্ভাগ্য যে পাকিস্তানি হানাদাররা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সাহস না করলেও এ দেশেরই একদল বিপথগামী সেনা সদস্য কল্পনাকেও হার মানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম ঘটনা এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা কখনোই পূরণযোগ্য নয়।

মানবাধিকার সুরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর শাসনামলেই প্রণীত হয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আইনের বিধান অনুযায়ী এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালিত করছে। ২০২১ সালের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য হলো : ইংরেজিতে EQUALITY-Reducing inequalities, advancing human rights. বাংলায় প্রতিপাদ্য হলো : 'বৈষম্য ঘোচাও, সাম্য বাড়াও, মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও।' টেকসই উন্নয়নের মূলমন্ত্রও হলো কাউকে পেছনে ফেলে নয়। কিন্তু নারী-পুরুষ, ধনী-

গরিবের বৈষম্য সমাজে এখনো বিদ্যমান। নারীর ক্ষমতায়নে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ সবার সেরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েদের জীবনের অধিকার, সম্পত্তির মালিকানা, সম্ভ্রম-সুরক্ষা নিয়ে এখনো অনেক প্রশ্ন রয়েছে। কন্যাসন্তানকে এখনো অনেকেই পুত্রসন্তানের ন্যায় সমভাবে দেখেন না। যদিও আমাদের অনেক কন্যাই এখন শিক্ষাদীক্ষা, ক্রীড়া-সংস্কৃতি এবং কর্মস্থলে–সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে যে কম যোগ্য নন; তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এর পরও কোনো কোনো পরিবারে এখনো কন্যাশিশুর জন্ম দেওয়ার সুবাদে জন্মদাত্রী মাকে কতই না গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। কন্যাসন্তানের সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারের বিড়ম্বনা এবং কন্যাসন্তানের সম্ভ্রম সুরক্ষার অনিশ্চয়তা এর একটি বড় কারণ হিসেবে আমি মনে করি।

গণমাধ্যম সূত্রে আমরা প্রায়ই দেখে থাকি নারীদের ধর্ষণের মতো ঘৃণ্যতম ঘটনার শিকার হতে। রাস্তাঘাটে, কর্মস্থলে–এমনকি বাড়িতে পরিবারের নিকটতম স্বজনের দ্বারা। ৬ বছরের শিশু থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধাকেও ধর্ষণের শিকার হতে হয়। ধর্ষণের মতো ঘৃণ্যতম ঘটনার বিরুদ্ধে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, ধর্ষকের কোনো দল নেই। আইন অনুযায়ী তার দৃষ্টান্তমূলক বিচার হবে। আইন সংশোধন করে ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলো ঘটছেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অবাধ পর্নোগ্রাফি দেখার সুযোগ থাকায় ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলো ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিশোর গ্যাং তৈরি হচ্ছে। এই ঘৃণ্যতম অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে একত্র হয়ে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ তুলতে হবে; পরিবারে নারীকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পারিবারিক সহিংসতা বন্ধ করা এবং গৃহকর্মে নারীর অবদানের মূল্যায়ন এখন সময়ের দাবি।

এ ছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণেও বর্তমানে সমাজে এক ধরনের অস্থিরতা ও অনাচার তৈরি হয়েছে। অনেক সময় গুজবের মাধ্যমেও সমাজে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা হয়, যা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য একাধারে পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতার বিকাশ সাধন যেমন প্রয়োজন, তেমনি তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আজকের যারা কিশোর-কিশোরী তাদের মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে। তারাই আমাদের আগামী, তাদের মানবাধিকারের অ্যাম্বাসাডর হিসেবে তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।

আমি মনে করি, পারিবারিক, সামাজিক মূল্যবোধ তৈরির মাধ্যমে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। নারী-পুরুষ, হিজড়া-প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে নয়; আমরা সকলেই মানুষ। এই মানুষ পরিচয় নিয়ে যেদিন পরিচিত হতে পারব, সেদিনই সমাজে মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই লক্ষ্য নিয়েই বর্তমান কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। আমি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে গণঅংশীদারি ছাড়া বড় কোনো সাফল্য আসতে পারে না। অতএব আসুন, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত করার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাই। উন্নত বিশ্বে বাংলাদেশ মানবিক রাষ্ট্র মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে–এটাই প্রত্যাশা।

লেখক : চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন

অজয় দাশগুপ্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম ভাগের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।' ৪ ক অনুচ্ছেদে 'জাতির পিতার প্রতিকৃতি' যেসব স্থানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে, তার উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের সর্বশেষ ১৫৩ অনুচ্ছেদের ২ ধারায় বলা হয়েছে, 'বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে...বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।' [ত্রিশ লাখ নারী-পুরুষের আত্মদানে অর্জিত বাংলাদেশের জনগণের দুর্ভাগ্য, ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান সংবিধানের 'The Second Proclamation (Fifteenth Amendmaent) Order ১৯৭৮' জারি করেন। বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিসংগ্রামে আত্মদানকারীদের প্রতি চরম অসম্মান প্রদর্শন ঘটানো হয় এ সংশোধনীর একটি ধারায় এভাবে–'সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধ, বৈপরীত্য, অসংগতি অথবা অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে, যতদূর তাহা উক্ত ফরমানসমূহ দ্বারা সংবিধানের কোনো পাঠ কিংবা উহার উভয় পাঠের কোনো সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন অথবা বিলোপসাধন সম্পর্কিত হয়, ইংরেজি পাঠ প্রাধান্য পাইবে।']

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এটা সংবিধানের ৪ ক অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। কেন তিনি জাতির পিতা, সেটা ষষ্ঠ তফসিলের ১৫০(২) ধারায় উল্লেখ রয়েছে এভাবে–'১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে, অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।'

বঙ্গবন্ধু এ ভূখণ্ডের মানুষকে স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর আহ্বানে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর দখলদার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য লাখ লাখ তরুণ-যুবক অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। মুক্ত স্বদেশে আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের পাশাপাশি প্রণীত হয় সংবিধান, যেখানে বাংলা পায় রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি।

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৪ মার্চ পাকিস্তানের

এক গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়, 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কমিটির কয়েকজন সদস্য বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে একটি লিফলেট বিতরণ করেছে। লিফলেটে অন্যান্যের সঙ্গে ফরিদপুরের টুঙ্গিপাড়ার শেখ লুৎফর রহমানের পুত্র শেখ মুজিবুর রহমানের নাম রয়েছে।' [সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭]

বঙ্গবন্ধু ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কলিকাতায় মুসলিম ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় আসার পর সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রলীগকে নতুনভাবে সংগঠিত করেন। ৪ জানুয়ারি (১৯৪৮) গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে হয়, 'ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠান গঠন করার সাথে সাথে বিরাট সাড়া পাওয়া গেল ছাত্রদের মধ্যে। এক মাসের ভেতর আমি প্রায় সকল জেলায়ই কমিটি করতে সক্ষম হলাম। যদিও নঈমউদ্দিন কনভেনর ছিল, কিন্তু সকল কিছুই প্রায় আমাকেই করতে হতো।' [শেখ মুজিবুর রহমান–অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ৪৯]

নবগঠিত এ সংগঠনের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ আসে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টা রোধ এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা। তবে মাত্র ২৭ বছর বয়সেই শেখ মুজিবুর রহমানের মনোজগতে চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে–পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোতে বাঙালির মুক্তি নেই। ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি খ্যাতিমান লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়কে তিনি বলেন, 'হঠাৎ একদিন রব উঠল, আমরা চাই বাংলা ভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দিই দেশভিত্তিক আন্দোলনে।' [সূত্র : অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা 'ইন্দ্রপাত'–মূল গ্রন্থ শতাব্দীর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু, পৃষ্ঠা ৩৬]

প্রকৃতপক্ষে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তিনি বাঙালির নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। ১৯৪৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার তাজমহল সিনেমা হলে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন এবং এ উপলক্ষে আরমানিটোলা ময়দানের জনসভায় তিনি ছাত্রসংগঠনের করণীয় হিসেবে যেসব বিষয় তুলে ধরেন তার মধ্যে ছিল–বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, নিরক্ষরতা দূর করার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, বিতর্ক সভা গঠন, পাকিস্তান সরকারের জুলুম-নির্যাতন-শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করা প্রভৃতি। তিনি ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের দাবি তুলে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যাদের এ ভূখণ্ড রক্ষার জন্য আনা হয়েছে তারা এখানের ভৌগোলিক পরিবেশ বোঝে না। [গোয়েন্দা রিপোর্ট, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৯ ও ২৭৫]

বাঙালি ছাত্র-তরুণদের হাতে অস্ত্র কী অমিত শক্তি অর্জন করে, সেটা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা ১৯৭১ সালে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু এটা বুঝতে পেরেছিলেন ১৯৪৯ সালেই, বয়স যখন মাত্র ২৯ বছর।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ 'বাংলা ভাষা দাবি' দিবস ঘোষণা করা হয়। ডাকা হয় হরতাল। বঙ্গবন্ধু হরতাল সফল করার জন্য বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলা সফর করেন। ঢাকায় হরতালের পিকেটিং করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন তিনি। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন, ছাত্রছাত্রীরাই হরতাল সফল করায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আমাদের জেলের 'দেয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল ১০টায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর ৪টায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটুও ক্লান্ত হতো না। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই, পুলিশি জুলুম চলবে না–নানা ধরনের স্লোগান।' এই সময় শামসুল হক সাহেবকে বললাম, হক সাহেব ওই দেখুন আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না। [অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৫]

বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকাকালেই তাঁর কাছে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক কামরুদ্দিন আহমদ হাজির হন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের আপস প্রস্তাব নিয়ে–বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা করা হবে, পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অনুরোধ জানানো হবে গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে এবং হরতালের সময় আটক সকল বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে। বন্দি ছাত্রনেতা শেখ মুজিব এ আপস ফর্মুলা অনুমোদন করলে সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদের চুক্তি সই হয়।

এ ঘটনায় সংগ্রাম পরিষদে বঙ্গবন্ধুর কতটা প্রভাব ছিল, তা অনুমান করা যায়। গোয়েন্দা রিপোর্ট সূত্রে আমরা আরো একাধিক ঘটনা জানতে পারি, যা থেকে সেই তরুণ বয়সেই বঙ্গবন্ধুর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা মেলে। ১৯৪৯ সালের ১৯ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্র ধর্মঘট ও উপাচার্যকে অবরোধ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। এর আগে তাঁর ছাত্রত্বও কেড়ে নেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালের ৯ মে তাঁর কাছে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে আপস প্রস্তাব নিয়ে হাজির হন চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী। তাঁকে বলা হয়, ক্ষমা চাইলে মুক্তি মিলবে, ছাত্রত্বও ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু 'He was not ready to offer any apology' [গোয়েন্দা রিপোর্ট, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬]

এ দফায় জেলে থাকার সময়েই তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২৬ জুন (১৯৪৯) তিনি মুক্ত হন, জেলগেটে তাঁকে ব্যান্ড পার্টি নিয়ে সংবর্ধনা দিতে হাজির হন দলের প্রধান ভাসানী সাহেবসহ অনেক নেতা ও কর্মী।

'অসামাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক কৃষক সমাবেশে যোগ দিয়ে ঢাকা ফেরার সময় সঙ্গী ছিলেন খ্যাতিমান পল্লীগীতি শিল্পী আব্বাসউদ্দীন সাহেব। তিনি বলেন, 'মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে।... বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে। আমি কথা দিয়েছিলাম এবং কথা রাখতে চেষ্টা করেছিলাম।' [পৃষ্ঠা ১১১]

গোয়েন্দা রিপোর্ট জানায়, বঙ্গবন্ধু ১৯৪৯ সালের ১৪ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের কাছে এক কৃষক সমাবেশ এবং একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন আব্বাসউদ্দীন আহমদসহ কয়েকজন। [প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৬]

এক তরুণ ছাত্রনেতার ওপর খ্যাতিমান জনপ্রিয় শিল্পীর (তাঁর বয়স প্রায় ৫০ বছর এবং শেখ মুজিবের ২৯ বছর) কী আস্থা!

অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি, ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে মওলানা ভাসানী তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তান পাঠিয়েছিলেন উভয় পাকিস্তান মিলে আওয়ামী লীগকে প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং অন্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। অবিভক্ত বাংলার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং খ্যাতিমান আইনজীবী ও রাজনৈতিক নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বয়স তখন ৫৭ বছর। তাঁকেসহ পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক আওয়ামী লীগ গঠনের দায়িত্ব মওলানা ভাসানী অর্পণ করেন ২৯ বছর বয়সী 'মজিবরের' ওপর। এ সফরের জন্য অর্থের কী ব্যবস্থা হবে সে প্রশ্নে উত্তর এসেছিল–'তা আমি কী জানি! যেভাবে পারো লাহোর যাও।' [পৃষ্ঠা ১৩৫]

তিনি লাহোর এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য স্থানে গিয়ে দলনেতার অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষভাবে তুলে ধরেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা।

নভেম্বরের শেষ দিকে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ফিরে আসেন এবং ১৯৫০ সালের প্রথম দিনে তাঁর স্থান হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। এ জেলজীবন স্থায়ী হয় ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এর মধ্যে রচিত হয় অমর ২১ ফেব্রুয়ারির অমর গাথা। কারাগারে থাকার সময় তিনি কী করেছেন? গোয়েন্দা রিপোর্ট সূত্রে (৮ ডিসেম্বর, ১৯৫১) আমরা জানতে পারি, তিনি অসুস্থতার কারণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালে। শেখ মুজিব হাসপাতালে ছাত্রলীগ সভাপতি খালেক নেওয়াজের সঙ্গে বিনা অনুমতিতে প্রায় আধাঘণ্টা কথা বলেছেন। এ জন্য জেল কোড অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক। [গোয়েন্দা রিপোর্ট দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩০]

১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারি অপর এক গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়, নিরাপত্তা বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আনা হয়। কিন্তু তিনি 'taking undue advantage of his coming to Dacca in furtherance of his political activities' [গোয়েন্দা রিপোর্ট, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭]

হাসপাতালে কী ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তিনি পরিচালনা করেছেন? তিনি লিখেছেন, 'আমি হাসপাতালে আছি। সন্ধ্যায় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ দেখা করতে আসে।... বললাম খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহবুব আরো কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে খবর দিতে।... বারান্দায় বসে আলাপ হলো এবং আমি বললাম, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে।... খবর পেয়েছি, আমাকে শীঘ্রই আবার জেলে পাঠিয়ে দেবে। কারণ আমি নাকি হাসপাতালে বসে রাজনীতি করছি।... পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হলো আগামী ২১ শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে।... আমিও আমার মুক্তি দাবি করে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করব।' [অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠ ১৯৬-১৯৭]

২১ ফেব্রুয়ারি এবং পরের কয়েকটি দিনের ঘটনা আমাদের এ ভূখণ্ডে নতুন ইতিহাস রচনা করে। বাঙালি ঢাকা শহর রক্তে রাঙায়। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভের সংগ্রামে হয়ে ওঠে প্রেরণা। আন্দোলনের চাপে বঙ্গবন্ধুকে ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু ঢাকা থেকে সর্বত্র নির্দেশ যায়, 'Keep continuous watch on Sk Mujibur Rahman and if he indulges again in prejudicial activities he should be arrested.' [গোয়েন্দা রিপোর্ট, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৬]

কিন্তু তিনি যে অদম্য। সামরিক আইন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণার পর পাকিস্তানের কারাগারে প্রহসনের বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ও কার্যকর করার উদ্যোগের পরও তিনি প্রিয় বাঙালি, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশকে হৃদয়ে ধারণ করে থেকেছেন চিত্ত যেথা ভয় শূন্য। রুখবে তাকে কে? তাঁর স্বপন পূরণ হয়। বাঙালি শুরু করে নবযাত্রা।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলা স্বীকৃত হয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন। এই বিশ্ব সংস্থাই বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে সাড়া দিয়ে অমর ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। এখন বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে পালিত হয় এ মহান দিবস। শত শত কোটি মানুষের কণ্ঠে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি... তারা স্মরণ করে ভাষাশহীদদের, শ্রদ্ধা জানায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ এই আন্দোলনের বীর নায়কসহ সকল অংশগ্রহণকারীকে।

লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক।

সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো

মনজুরুল আহসান বুলবুল

বাঙালির শতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে এমন সাধক, এমন প্রেমিক আর একজনও পাওয়া যাবে না। তাঁর সাধনায় বাংলা নামের দেশ, আর তাঁর প্রেমময় অন্তরজুড়ে এই দেশের মানুষ।

এমন এক সাধক ও প্রেমিক চিত্রিত করেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন পূজা পর্বের গানটি। সুরও তাঁরই দেওয়া। গানটির রচনার পটভূমি সম্পর্কে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা দুই রকম মত দেন। কেউ বলেন, যিশুখ্রিস্টের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর এই রচনা; কেউ বলেন, নিজের বাবার স্মরণে লেখা এটি। প্রেক্ষাপট যা-ই হোক, এই গানের সাথে আমরা আমাদের সাধক প্রেমিককে যখন মেলাই তখন নিশ্চিতভাবেই মানি, কবিরা যে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, তা প্রমাণিত আবারও।

১৯১০ সালে শান্তিনিকেতনে বসে কবি বলছেন : ‘ কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস/ সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো/ পাগল ওগো, ধরায় আস।’ তাঁর মাত্র দশ বছরের মাথায় ১৯২০ সালে বঙ্গের পূর্ব অংশের এক অজপাড়াগাঁয়ে এক সাধক প্রেমিকের ধরায় আগমন যে অবধারিত হয়ে আছে সে বিষয়ে কবি যেন নিশ্চিত হয়েই সুর, তাল, লয় ও ছন্দে এই চিত্রকল্প তৈরি করেছিলেন। দেশমাতৃকার সাধনায় দেশের অবহেলিত, নিষ্পেষিত মানুষের প্রেমে পাগল এই সাধক। পরে এই ‘অকুল সংসারে’ এই সাধক-প্রেমিকের প্রাণের বীণা ঝংকৃত হয়েছে নানা পর্বে, নানা মাত্রায়। দুঃখ-আঘাতে বারবার পর্যুদস্ত কিন্তু ঘোর বিপদ-মাঝেও তিনি জননীর মুখের হাসি দেখে নিজে বারবার হেসেছেন। একটি জাতির স্থায়ী হাসির ঠিকানা হিসেবে গড়ে দিয়েছেন একটি স্বাধীন আবাসভূমি। এই সাধক-প্রেমিক ‘কাহার সন্ধানে সকল সুখে আগুন জ্বেলে’ বেড়িয়েছেন তাঁর জবাব দিয়েছেন নিজের জবানিতেই। বলছেন : কোলকাতা যাব, পরীক্ষাও নিকটবর্তী। লেখাপড়া তো মোটেই করি না। দিন-রাত রিলিফের কাজ করে কূল পাই না। আব্বা আমাকে এ সময় একটা কথা বলেছিলেন : বাবা রাজনীতি করো আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছো এ তো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রেখো, “‘sincerity of purpose and honesty of purpose’–এটা থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না।” এ কথা কোনো দিন আমি ভুলি নাই।

বাবার এক লাইনের দর্শনই তাঁর জীবনদর্শন। সাধক, প্রেমিকরা নিজের ভাবাদর্শে পাগল। আমাদের এই সাধক-প্রেমিকও তা থেকে ব্যতিক্রম নন। মাত্র ৫৪ বছর বয়সের জীবনে চার হাজার ৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন, এই সাধক, যা তাঁর মোট জীবনের সিকি ভাগ। এই জেল কোনো অপকর্মের জন্য নয়; তার ভাব দর্শনের জন্যই। কারণ শাসকচক্র দেশ আর মানুষের জন্য এই সাধকের প্রেমকেই গণ্য করেছিল অপরাধ হিসেবে। তিনি হাসিমুখে বরণ করেছেন সব কিছু।

তাঁর এই দর্শনের ব্যাখ্যা কী? যাদের জন্য তাঁর প্রেম তাদের জন্যই তাঁর সবটুকু চাওয়া। তিনি অবলীলায় বলেন : 'আমি কী চাই? আমি চাই, বাংলার মানুষ পেট ভরে খাক, আমার বাংলার বেকার কাজ পাক, আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক, আমার বাংলার মানুষ হেসেখেলে বেড়াক, আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণভরে হাসুক।' নিজের প্রশ্ন ও জবাবে তিনি নিজেই বলছেন, তিনি মানুষের জন্য কী চান, আবার বলছেন একটি স্থায়ী আবাস, সোনার বাংলার কথা। এই সোনার বাংলাই তাঁর আজন্মের সাধনা। এই বাংলা ও বাংলার মানুষের জন্য ভালোবাসাই জীবনভর তাঁকে 'ব্যাকুল করে এবং কাঁদায়'। তাই তো নিজের সম্পর্কে তিনি অবলীলায় বলেন : 'আমি মারা গেলে আমার কবরে একটা চোঙ্গা রেখে দিস। লোকে জানবে এই একটা লোক একটা টিনের চোঙ্গা হাতে নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিল এবং সারা জীবন সেই টিনের চোঙ্গায় বাঙ্গালি বাঙ্গালি বলে চিৎকার করতে করতেই মারা গেল।'

এই সাধক কবি নন। কিন্তু তিনি দেখতে পান দূর ভবিষ্যৎ। একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতোই তিনি বলেন, '...জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি–আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির 'পূর্ব পাকিস্তানে'র পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ' (৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯)। কেমন নিশ্চিত করে একজন এমনটি বলতে পারেন? পারেন, একজন সাধক তাঁর সাধনার শীর্ষচূড়ায় নিজেতে নিজে বিলীন হন যখন, তখন বুঝি স্বপ্নকে বাস্তবে দেখেন তাঁরা। এই 'বাংলাদেশ'কে তিনি দেখেন সেই ছাত্রজীবন থেকে। পরে তাঁর সাধনায় এই বাংলাদেশ ক্রমে পূর্ণ রূপ পায়। যে দেশটির জন্মই হয়নি সেই দেশটির জাতীয় সংগীত চূড়ান্ত করেন, দেশটি গড়তে মেধাবী তরুণদের উদ্দীপ্ত করেন, এমনকি চূড়ান্ত আঘাতের আগেও তিনি বলেন, 'কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না'। নিজের সাধনার ফল লাভে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ও নিশ্চিত তিনি। আমাদের সাধক নিশ্চিত, তাঁর সাধনা বিফলে যেতে পারে না।

তারপর অনেক কান্না, অনেক রক্ত, অনেক আর্তনাদ ছাপিয়ে মূর্ত হয় অনেক সাধনার ধন। স্বাধীনতা আসে বিজয়ের হাত ধরে, কিন্তু সাধক প্রেমিকের সাথে পূর্ণমিলন ছাড়া এই পাওয়া তো অর্থহীন। কিন্তু বুঝি তাঁর 'ভাবনা কিছু নাই'। কারণ কে যে তাঁর সাথের সাথি তাই নিয়ে ভাবার আগেই দেখি : এই সাধক খেলছেন বিশ্বলয়ে। তিনি হয়ে উঠেছেন এমন এক উচ্চতার নেতা, যাঁকে কুর্নিশ করে গোটা

বিশ্ব। পরাজিত গোষ্ঠীর কুৎসিত কারাগারের সাধ্য কী তাঁকে আটকে রাখে? হিমালয় না দেখার অতৃপ্তি মেটে যাঁকে দেখে, তাঁকে ধারণ করার শক্তি কার? আমাদের এই সাধক ফেরেন তাদের কাছেই, যাদের সাথে তাঁর প্রেমময় অটুট বন্ধন। তাঁর এই প্রেমের শক্তির বর্ণনা দেন অপূর্ব ভাষায় : 'আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমি দেশের মানুষকে ভালোবাসি, আর আমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি'। নিজের প্রেম বা ভালোবাসার এমন গভীরতর ব্যাখ্যা আর কোনো সাধক এমনভাবে দিতে পেরেছেন? জানা নেই। সাধনার স্বপ্নের দেশে তিনি ফিরলেন, তিনি যাদের প্রেমের আরাধ্য সেই মানুষের কাছে তিনি ফিরলেন, তাঁর সাধনার রূপ তিনি প্রকাশ করলেন : আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশে কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

এই সাধক এমন সাধক, যিনি নিজেই নিজের মতো করে পথ তৈরি করে নিয়েছেন । বলেছেন : ...অনেক সময় থিওরি ও প্র্যাকটিসে গণ্ডগোল হয়ে যায়। থিওরি খুব ভালো। কাগজে-কলমে লেখা থিওরি অনেক মূল্যবান। পড়ে শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কাজের সঙ্গে মিল না থাকলে থিওরি কাগজে-কলমে পড়ে থাকে, কাজে পরিণত হয় না।

প্রেমিক যিনি, তিনি শুধু ভালোবাসেন না; ভালোবাসা চান–পানও। সব প্রেমিকই ভালোবাসার কাঙাল। আমাদের এই প্রেমিক নিজেই বলেন : '...আমি মাঝে মাঝে বলি যে, গেছি চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম থেকে গেছি সেখানে–বেতবুনিয়া; সে গ্রামের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক দুই পাশে বসে আছেন, ওঁরা এসেছেন আমাকে দেখার জন্য মনে মনে আমি বলি যে, আমি কী করেছি ওদের জন্য? আমার দুঃখ হয়, স্টিল দে লাভ মি'। দুনিয়ার নিয়মই এই। ভালোবাসা পেতে হলে ভালোবাসতে হয় এবং সে ভালোবাসা সিনসিয়ারলি হওয়া দরকার। তার মধ্যে যেন কোনো খুঁত না থাকে। ইফ ইউ ক্যান লাভ সামবডি সিনসিয়ারলি, ইউ উইল গেট দ্য লাভ সামবডি। দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। আমার জীবনে আমি দেখেছি, লাখ লাখ লোক দু'পাশ দিয়ে কী অবস্থার মধ্যে–আমি তো কল্পনাও করতে পারি না। হোয়াই দে লাভ মি সো মাচ? জবাবটা দিয়েছেন নিজেই 'আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করি, মবিলাইজ দ্য পিপল অ্যান্ড ডু গুড টু দ্য হিউম্যান বিয়িংস অব বাংলাদেশ। দিজ আনফরচুনেট পিপল সাফার্ড লং–জেনারেশন আফটার জেনারেশন। এদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে, এদের খাবার দিতে হবে।

বাঙালির শতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির আকাশস্পর্শী এই সাধক ও প্রেমিক পুরুষের নাম শেখ মুজিব, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সাথে তুলনা করা যায়, এমন আর কাউকেই পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই ভাষণটি দেওয়ার পর দুই মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই উজাড় করে ভালোবাসা

দেওয়ার, ভালোবাসার কাঙাল এই সাধক-প্রেমিককে আমরা উপহার দিই ১৮টি বুলেট! হায়! হতভাগা বাংলাদেশ!

তবে নিশ্চিত জানি, কায়মনে বাঙালি, কিন্তু এই জন্মশতবর্ষে বিশ্বমানবের আসনে অধিষ্ঠিত আমাদের এই সাধক, এই প্রেমিক শেখ মুজিব, মরণ ভুলে অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাসছেন।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সভাপতি বিএফইউজে।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী তুলনামূলক পাঠ

ড. মোহাম্মদ হাননান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমসাময়িক অনেক রাজনীতিকই আত্মজীবনী লিখেছেন। তবে তাঁদের বেশির ভাগই লিখেছেন মুক্তজীবনে থেকে অথবা ক্ষমতায় আসীন অবস্থায়। তাঁদের মধ্যে আতাউর রহমান খানের 'ওজারতির দুই বছর', 'স্বৈরাচারের দশ বছর'; আবুল মনসুর আহমদের 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'; জেনারেল আইয়ুব খানের 'প্রভু নয় বন্ধু'; অলি আহাদের 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫'; খোকা রায়ের 'সংগ্রামের তিন দশক'; মহিউদ্দীন আহমেদের 'আমার জীবন আমার রাজনীতি' প্রমুখের গ্রন্থ বেশ আলোচিত ও পরিচিত।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীটি যতটুকু পাওয়া গেছে, তা লেখা হয়েছে বন্দিজীবন থেকে। সেদিক থেকে এটি ব্যতিক্রম। তিনি এটা লেখার জন্য তাঁর সমসাময়িকদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পাননি। ঘটনাসমূহ যাচাইয়ের জন্য কোনো বই, সংবাদপত্র বা অন্যান্য তথ্য আধারের সাহায্যও নিতে পারেননি। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পড়তে পড়তে মনে হয়, তিনি লিখে গেছেন বিরামহীনভাবে কোনো কিছুর বা কারো সহায়তা ছাড়াই।

লেখালেখির এ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁর আত্মজীবনী কতটুকু ইতিহাসের ধারাবাহী হয়েছে, ঘটনা বর্ণনা কতটুকু হয়েছে অনুপুঙ্খ, তা সমসাময়িকদের আত্মজীবনীর সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে বিস্মিত হতে হয়। বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ইতিহাসজ্ঞান ইতিহাসবিদদের মুগ্ধ করে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন তা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। কয়েকটি ঘটনার তুলনামূলক পাঠ বিশ্লেষণ করলে এর সত্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

কৈশোরে গোপালগঞ্জে একটি ঘটনাসূত্রে পুলিশ কিশোর মুজিবকে গ্রেপ্তার করতে খুঁজছিল। একজন আত্মীয় এসে গ্রেপ্তার এড়াতে পালানোর পরামর্শ দিলে মুজিব বলেন, 'আমি পারব না'। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১২)। বঙ্গবন্ধুবিরোধী একজন রাজনীতিক অলি আহাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনে শেখ সাহেব কখনো আত্মগোপন করেন নাই।' (অলি আহাদ : জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৪৮৩)।

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চেও বঙ্গবন্ধুকে পালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পালাতে

অস্বীকার করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এক বক্তব্যে এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'মার্চের সেই রাতে আমাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় আমার সহকর্মী তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ও অন্যান্যরা কাঁদছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, এখানেই আমি মরতে চাই। তবু মাথা নত করতে পারব না।' (১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে রেসকোর্সের জনসভায় বক্তৃতা, দৈনিক বাংলা, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)।

পাকিস্তান আমলের আরেকটি ঘটনা। মুজিবকে গ্রেপ্তার করতে হুলিয়া জারি হয়েছে। মওলানা ভাসানী খবর পাঠালেন, মুজিব যেন পালিয়ে থাকে। মুজিব এ ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন, 'তখন মাওলানা ভাসানী ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে থাকতেন।... তিনি কেন আমাকে গ্রেপ্তার হতে নিষেধ করেছেন? আমি পালিয়ে থাকার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। কারণ আমি গোপন রাজনীতি পছন্দ করি না।... মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'কী ব্যাপার, কেন পালিয়ে বেড়াব।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১৩৪)।

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭-পূর্ববর্তী) এবং পাকিস্তানেরও প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭-পরবর্তী) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে অনেক মূল্যায়ন ও মন্তব্য করেছেন, 'শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, নীচতা ছিল না, দল-মত দেখতেন না, কোটারি করতে জানতেন না, গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না।... বাঙালিরা শহীদ সাহেবকে প্রথম চিনতে পারে নাই। যখন চিনতে পারল, তখন আর সময় ছিল না।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৯)। বাংলাদেশের রাজনীতিকদের নিয়েই বঙ্গবন্ধুর এ মন্তব্য। তবে পরবর্তীকালে ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় সোহরাওয়ার্দীর যথাযথ মূল্যায়ন করে লিখেছেন, 'দেশ ভাগ হওয়ার পর কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়। সমস্ত মুসলিম ঢাকার পথে পাড়ি দেয়। সবারই আগে খাজা নাজিমউদ্দিন...। সোহরাওয়ার্দী সাহেবই একমাত্র লোক, দাঙ্গা বিধ্বস্ত মুসলিম আমজনতার পাশে রয়ে যান।' (মোজাফফর আহমদ, কিছু কথা, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩)।

কিন্তু সেদিনের বামপন্থি কমিউনিস্ট ও ছাত্রকর্মীরা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে চেনেননি, তাঁর সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন, আজও তাঁরা তা সংশোধন করেননি। ২০০৫ সালে কমরেড হায়দার আকবর খান রনো তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেন। এতে সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে অনেক কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য রয়েছে। ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলনের সময় সোহরাওয়ার্দী যখন ঢাকায় আসেন তখন ছাত্রনেতাদের সাথে তাঁর তর্ক-বিতর্ক হয়। রনো লেখেন, 'সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমাদের প্রজন্মের তরুণদের চিনতেন না...। যুক্তি-তর্কের একপর্যায়ে কাজী জাফর আহমদ বলেই বসলেন, 'আমরা আমতলা থেকেই আপনাকে মুক্ত করে

এনেছি, আবার আমতলাতেই আমরা কবর দিতে পারি।' (হায়দার আকবর খান রনো : শতাব্দী পেরিয়ে, পৃষ্ঠা ৫৯)। সম্প্রতি চীনপন্থি কমিউনিস্ট নেতা এবং সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেননেরও আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে। তিনিও এ ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন, 'ছাত্রনেতাদের এই আচরণে সোহরাওয়ার্দী খুব বিরক্ত হন, কিন্তু কাজী জাফর আগের মতোই উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমরা আমতলার থেকে আপনাকে নিয়ে এসেছি, ওই আমতলাতেই কবর দেব।' (রাশেদ খান মেনন : এক জীবন, পৃষ্ঠা ৯২)। বঙ্গবন্ধু 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে যে লিখেছেন, 'বাঙালিরা শহীদ সাহেবকে প্রথম চিনতে পারে নাই।' (পৃষ্ঠা ৪৭) বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দেখতেন, একদল বাঙালি এখনো সোহরাওয়ার্দীকে চিনতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আমতলা বা জামতলার লোক ছিলেন না । তিনি সে সময়ের সমগ্র পাকিস্তানের অভিজাত বংশ থেকে আসা একজন রাজনীতিক ছিলেন, একমাত্র যিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে রাজনীতি করেছেন, যাঁর তুলনায় সে সময়ের পাকিস্তানের একজনও ছিল না, এমনকি খাজা-নবাবজাদা নাজিমউদ্দিন-লিয়াকত আলী খানরাও ছিলেন না। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধুর আফসোসটি সে কারণে বড় হয়ে দেখা দেয় যে বাঙালিরা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে 'চিনতে পারে নাই'।

১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা নিয়ে এক শ্রেণির লেখক যে উপহাস করে মিথ্যে ইতিহাস লিখেছেন, তার তুলনামূলক পাঠটি দেখুন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, '১৬ তারিখ (১৬ই মার্চ ১৯৪৮- লেখক) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রসভায় আমরা সকলেই যোগদান করলাম। হঠাৎ কে যেন আমার নাম প্রস্তাব করে বসল সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য। সকলেই সমর্থন করল। বিখ্যাত আমতলায় এই আমার প্রথম সভাপতিত্ব করতে হলো।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ৯৬)।

ভাষা আন্দোলনের লেখক-গবেষক বদরুদ্দিন উমর এ ঘটনাকে উপহাস করে লিখেছেন, '১৬ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই বেলা দেড়টার সময় শেখ মুজিবুর রহমান কালো শেরওয়ানি এবং জিন্নাহ টুপি পরিহিত হয়ে একটি হাতলবিহীন চেয়ারে সভাপতির আসন অধিকার করে বসেন।' (বদরুদ্দিন উমর : পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩)।

১৯৪৮ সালের এই প্রথম পর্বের ভাষা আন্দোলনের প্রধান ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন অলি আহাদ। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এ ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, '... আমরা ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেলতলায় এক সাধারণ ছাত্রসভা আহ্বান করি। সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন।' (অলি আহাদ : জাতীয় রাজনীতি, পৃষ্ঠা ৫৯)। যদি ছাত্রসভায় মুজিবের সভাপতিত্ব করার

কথা না থাকত, তাহলে অলি আহাদ সেটা লিখতেন, কারণ অলি আহাদ আমৃত্যু বঙ্গবন্ধুকে 'শত্রু' মনে করে গেছেন। অথচ উমর সাহেবরা মিথ্যে ইতিহাস লিখে গেছেন, অসমাপ্ত আত্মজীবনী বের হওয়ার পরও এটা সংশোধন করেননি।

বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমলাদের কলকাঠি নাড়া ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। লিখেছেন, 'গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তাঁকে অর্থমন্ত্রী করার ফলে আমলাতন্ত্র মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর সাথে সাথে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল হয়ে একটা শক্তিশালী সরকারী কর্মচারী গ্রুপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলায় আজিজ আহমদ চিফ সেক্রেটারি ছিলেন। সত্যিকার ক্ষমতা তিনিই ব্যবহার করতেন। নুরুল আমিন তাঁর কথা ছাড়া এক পাও নড়তেন না।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১৭৪)।

ভাষা আন্দোলনের সময় বাঙালি হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই নুরুল আমিন। পরবর্তীকালে নুরুল আমিন পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা প্রসঙ্গে একটি চটি বই লিখেছিলেন। এতে তিনিও স্বীকার করেছেন, 'ব্রিটিশ আমলের সুসংগঠিত আমলাতন্ত্রের কিছু উচ্চাভিলাষী লোক, কায়েদে আজম ও লিয়াকত আলী খানের ইন্তেকালের পর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।' অন্যত্র 'পল্টনের জনসভায় (১৯৫২ সালের-লেখক) তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর খাজা নাজিমউদ্দিন উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে... এটাও ছিল আমলাদের একটা চাল।'। (নুরুল আমিন : যে কথা এত দিন বলিনি, পৃষ্ঠা ৩)।

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর সুবিশাল আত্মজীবনীতেও পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, যা বঙ্গবন্ধুর তথ্যের পরিপূরক। লিখেছেন তিনি, 'তিনি (পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী-লেখক) মি. কেরামতুল্লাহর বদলে মি. আজিজ আহমদকে বাণিজ্য দপ্তরের সেক্রেটারি নিযুক্ত করলেন।... মি. আজিজ আহমদ শুধু সর্বজ্যেষ্ঠ আইসিএসই নন। 'মোস্ট স্টিফনেকেড ব্যুরোক্র্যাট' বলিয়া তাঁর বদনাম বা সুনাম আছে। মন্ত্রীদের কোনো কথা তিনি শোনেন না। মন্ত্রীদেরই তিনি কানি আঙুলের চারপাশে ঘোরান।... পূর্ব বাংলার চিফ সেক্রেটারি থাকা অবস্থায় জনাব নুরুল আমিনের আমলে একবার তিনি হাইকোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীসহ সমস্ত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সিক্রেট ফাইল রাখি...। লোকে বলাবলি করিত আসলে চিফ সেক্রেটারিই পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী।' (আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর, পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৪৫)।

পাকিস্তানের রাজনীতির আমলাতন্ত্রের দীর্ঘ এক ফিরিস্তি রয়েছে এই অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে। বঙ্গবন্ধু এ বই লেখার সময় কোনো লাইব্রেরি ওয়ার্ক করার সুযোগ পাননি, লিখেছেন একেবারেই স্মৃতি থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে যাঁরা একই বিষয় নিয়ে লিখেছেন তাঁদের গ্রন্থের সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থে তথ্যের কোনো ঘাটতি নেই। বরং অসাধারণ এক সাযুজ্য ধরা পড়ে।

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এ রকম অসংখ্য ইতিহাস ও তথ্য রয়েছে, যা সমসাময়িক অন্যদের লেখা আত্মজীবনীর সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির শক্তিটি ধরা পড়ে। সর্বশেষ একটি বিষয় এখানে উদ্ধৃত করছি, সেটা হলো, বঙ্গবন্ধুর একটা দীর্ঘশ্বাস, 'বাঙালিদের দুঃখের দিন শুরু হলো'। সেটা কোনো দিন "পূর্ব বাংলার গভর্নর শাসন জারি করার দিন (১৯৫৪ সালের ৩০ মে-লেখক) প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী যে বক্তৃতা রেডিও মারফত করেন, তাতে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেবকে রাষ্ট্রদ্রোহী' ও আমাকে 'দাঙ্গাকারী বলে আক্রমণ করেন। আমাদের নেতারা যাঁরা বাইরে রইলেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ করাও দরকার মনে করলেন না। ঠিক মনে নাই, তবে এর তিন দিন পরে আমাকে আবার নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হলো।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ২৭৩)।

আবুল মনসুর আহমদ এ প্রসঙ্গটা আরো খোলাসা করেছেন, তিনি লিখেছেন, 'পরদিন (৩১ মে ১৯৫৪-লেখক) বেলা ২টায় সিমসন রোডস্থ যুক্তফ্রন্ট অফিসে যুক্তফ্রন্ট পার্টির এক সভা ডাকা হইল।... পার্টি লিডারকে নজরবন্দি ও অন্যতম মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।... আমরা বেশ কয়েকজন তখন হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া সমস্ত অবস্থা ও আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাইলাম...। হক সাহেব আমাদের... গোলাবি চিত্রে টলিলেন না।... বুঝিয়া আসিলাম শেরে বাংলা হক সাহেব বেশ একটু ভয় পাইয়াছেন।' (আমরা দেখা রাজনীতির ৫০ বছর, পৃষ্ঠা ২৮০-২৮১)।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান লিখেছেন এর পরের পাঠটি : 'শেখ মুজিবুর রহমান ও আবুল মনসুরের নামে একাধিক মামলা দায়ের হলো...। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের অভিযান খুব ব্যাপক। দেশের সর্বত্র কর্মীদের নিয়ে টানটানি হয়েছে।... শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দুর্নীতি বিভাগের বেতনভুক্ত পোষ্য কয়েকটি দালাল ছাড়া আর কোনো সাক্ষী কাঠগড়ায় আনতে পারেনি।... শেষ পর্যন্ত একটা মোকদ্দমা গেল জজকোর্টে। (উকিল হিসেবে-লেখক) সোহরাওয়ার্দী তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন। জজ বাহাদুরকে অনুরোধ করা হলো, আসামিকে তাঁর উকিলের পাশে বসার অনুমতি দেওয়া হোক। মাঝে মাঝে পরামর্শ নিতে হবে, কাগজপত্র দেখাতে হবে। ধর্মাধিচরণ প্রায় গর্জে উঠলেন, নো।... ১০টা থেকে ৫টা

পর্যন্ত কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রইল শেখ মুজিবুর রহমান। বিচারান্তে রায় দিলেন, জেল। হাইকোর্টে আপিল হলো। মহামান্য বিচারপতি তাঁকে (মুজিবকে- লেখক) নির্দোষ খালাস দিলেন।' (আতাউর রহমান খান : স্বৈরাচারের ১০ বছর, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩)।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর তুলনামূলক পাঠ তাই ইতিহাসের জন্য জরুরি। আজকের প্রজন্মের জন্য আরো জরুরি। যেমন করে পাকিস্তান আমলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান থেকে বঙ্গবন্ধু হয়েছিলেন তার কাহিনি তো ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক অন্য রাজনীতিক ও ইতিহাসবিদদের স্মৃতিকথা ও গবেষণা গ্রন্থেও। এগুলো মিলিয়ে পড়লে অসমাপ্ত আত্মজীবনীর পাঠটির লেখনীর দৃঢ়তা, শুদ্ধতা এবং সঠিকতা অধিক পরিস্ফুটিত হয়।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

বঙ্গবন্ধু : শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধু

অনুপম হায়াৎ

জাতির পিতা মহান নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) বাংলা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিরও বন্ধু। তাঁর জীবন ও কর্মে, চিন্তা-ভাবনায়, লেখায়-রচনায়, মননে-পৃষ্ঠপোষকতায়, স্মৃতিতে-প্রীতিতে, ভাষণে-বিবৃতিতে, বাণীতে ঋদ্ধ হয়েছে এ দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তিজীবন, কর্ম-আদর্শ, স্বপ্ন নিয়েও দেশ-বিদেশে রচিত হয়েছে শত শত বই, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, নাটক-গান, ভাস্কর্য ও চলচ্চিত্র।

বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার সংস্কৃতি'। তিনি আরো বলেছেন, 'ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ছাড়া কোনো জাতিই উন্নতি করতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যে জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস।'

শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা-সৃজন ও মনন সম্পর্কে জানা যায় তাঁর নিজের লেখা গ্রন্থ, ভাষণ, অন্যের লেখা রচনা, স্মৃতিকথা ও সমকালীন সংবাদপত্র থেকে। ১৯৭১ সালের মার্কিন সাপ্তাহিক নিউজ উইক বঙ্গবন্ধুকে আখ্যায়িত করেছিল 'রাজনীতির কবি' হিসেবে। আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন, 'রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী' হিসেবে। পাকিস্তান আমলে দেশের শিল্পীসমাজ বঙ্গবন্ধুকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'বঙ্গ সংস্কৃতির অগ্রদূত' হিসেবে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন এবং জানতেন যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই তিনি রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে পরিপূরক হিসেবে দেখেছেন। হাজার বছরের বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মন্থন করেই বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন রাজনীতির কবি এবং বিশ্ববন্ধুও। তাঁর বিচ্ছুরিত প্রভায় আলোকিত, সঞ্জীবিত ও স্পন্দিত গৌরবদীপ্ত হয়েছে এ দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো।

পণ্ডিতদের মতে, শিল্প হচ্ছে আত্মার সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতি হচ্ছে জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবনের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, আচরণ-রীতি, পেশা-ধর্ম, দর্শন-ভাবনা, বস্তুগত অর্জন, বুদ্ধিজীবীগত বিকাশ, বিনোদন প্রভৃতি। বঙ্গবন্ধুর মধ্যে হাজার বছরের বাঙালির এসব বৈশিষ্ট্য নান্দনিকভাবে প্রকাশ ঘটেছিল।

শৈশব-কৈশোরে জন্মস্থানের ভূ-প্রকৃতি, জনজীবন, পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষা ও ক্রীড়া সাহচর্য তাঁকে দিয়েছিল সাংস্কৃতিক মানস কাঠামোর উপাদান।

তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে রয়েছে তাঁর উল্লেখ। তিনি লিখেছেন যে শৈশব-কৈশোরে তিনি গান গাইতেন, খেলাধুলা করতেন, ব্রতচারী করতেন। বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক মানস কাঠামো গঠনে বই এবং পত্রপত্রিকা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। সেই ১৯৩০ দশকে তাঁর পরিবারে কলকাতা থেকে প্রকাশিত আজাদ, সওগাত, মোহাম্মদী, আনন্দবাজার, বসুমতী পত্রিকা রাখা হতো। তিনি এগুলো পড়তেন। 'কারাগারের রোজনামচা'য় তিনি লিখেছেন, 'বই আর কাগজই আমার বন্ধু'।

আমরা জানি, বঙ্গবন্ধু সেই ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ দশক পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদপত্রেরও সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এসবের মধ্যে ছিল 'মিল্লাত', 'ইত্তেফাক', 'নতুন দিগন্ত', 'বাংলার বাণী'। তিনি এসব পত্রিকায় স্বনামে ও ছদ্মনামে লিখতেনও। আর বই এবং সংবাদপত্র হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন রাজনৈতিক, সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম লেখক। তাঁর রচিত তিনটি গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১৩), আমার দেখা নয়াচীন' (২০১৭) ও 'কারাগারের রোজনামচা' (২০২০) ইতিহাসের স্বর্ণখণ্ড হিসেবে বিবেচিত। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আরেকটি বড় আধার হচ্ছে লাইব্রেরি। তিনি বাড়িতে বিরাট লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। আওয়ামী লীগ দলীয় কার্যালয়েও তিনি গড়ে তুলেছিলেন লাইব্রেরি। পাঠ বা অধ্যয়নকে তিনি রাজনীতির বোধ ও চর্চার অংশ ভাবতেন। আর বই হচ্ছে সংস্কৃতি ও বুদ্ধিভিত্তিক সমাজ গঠনের হাতিয়ার।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব দান ও অংশগ্রহণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সোনালি অধ্যায়। এর ফলে জাতীয় সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন এবং পরবর্তীকালে বিশ্ব সংস্কৃতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভাষাশহিদ দিবসে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি অর্পণ, ভাষণ, বাণী, মিছিলে অংশগ্রহণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মারক হয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর সাহিত্যপ্রীতি, কবিতাপ্রীতি, সংগীতপ্রীতি কিংবদন্তি হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকদের কবিতা ও গান ছিল বঙ্গবন্ধুর আশ্রয়। জেল জীবনে, মুক্ত জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে তিনি তাঁদের রচিত গান ও কবিতা আবৃত্তি করতেন ও গাইতেন। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা'কে তিনি জাতীয় সংগীত এবং নজরুলের 'চল চল চল'কে রণসংগীত হিসেবে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়েছেন। ১৯৪১ সালে বঙ্গবন্ধু কবি নজরুল ও অন্যান্যকে ফরিদপুরে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে নজরুলকে তিনি বাংলাদেশে এনে নাগরিকত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু নজরুলের কবিতা ও প্রবন্ধ থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগানটি গ্রহণ করেছেন। তাঁকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য, বাণী ও শ্রদ্ধা সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মূল্যবান উপাদান হয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর সংগীতপ্রিয়তা সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তিনি বাংলাদেশের লোকগান, জারি-সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা পছন্দ করতেন। শিল্পী আব্বাসউদ্দীন, রমেশ শীল, সানজিদা খাতুন, শেখ রোকন উদ্দিন, শাহ

আবদুল করিমের গান তিনি পছন্দ করতেন। সত্যজিৎ রায়ের 'গোপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির 'মোরা বাংলাদেশে থেকে এলাম', শৈলজানন্দের ছায়াছবি 'মানে না মানা'র হবে হবে জয়, পান্নালাল ভট্টাচার্যের গাওয়া 'আমার সাধ না মিটল' প্রভৃতি গান বঙ্গবন্ধু পছন্দ করতেন।

কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংবাদিকদের সান্নিধ্য বঙ্গবন্ধু খুব পছন্দ করতেন। জসীমউদ্‌দীন, জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, শাহাবুদ্দিন, নীলিমা ইব্রাহীম, মাজহারুল ইসলাম, মানিক মিয়া, এ বি এম মূসা, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী প্রমুখ তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন। চলচ্চিত্রের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আগ্রহ ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রী থাকা অবস্থায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (১৯৫৭)। তাঁর আমলে (১৯৭১-১৯৭৫) বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও সাহিত্যভিত্তিক অনেক কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। তিনি চাষী নজরুল ইসলামের 'সংগ্রাম' এবং জাপানি পরিচালক নাগিসা ওশিমার 'রহমান : ফাদার অব বেঙ্গল' প্রামাণ্যচিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি 'রূপবান' এবং 'নবাব সিরাজদ্দৌলা' চলচ্চিত্রও দেখেছিলেন।

নাটক ও যাত্রাশিল্পের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় অবদান রয়েছে। তিনি ১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করেন। এর ফলে বাংলাদেশে নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের ক্ষেত্র সুগম হয়। তাঁর অনুপ্রেরণায় স্বাধীনতা-উত্তর পরিবেশে বাংলাদেশ নাট্য আন্দোলন বিকশিত হয়। নাটকে বাংলাদেশের ইতিহাস, জীবন, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধ নতুন মাত্রায় পরিবেশিত হয় মঞ্চ, বেতার ও টিভিতে।

বঙ্গবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতায় সক্রিয় উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় শিল্প ও সাহিত্য, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এর মধ্যে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া তিনি চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, সিনেমা হল নির্মাণ, স্টুডিওর সম্প্রসারণের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। তিনি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলা একাডেমিকে পুনর্গঠন করেছিলেন। এর ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। তিনি নিজেও এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (১৯৭৪) উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরো কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি' (১৯৭৪), সোনারগাঁওস্থ 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন', (১৯৭৫), নেত্রকোনাস্থ 'উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি', রাঙামাটিস্থ 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট', বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' প্রভৃতি। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন দেশের সাথে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর আমলে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিনিধি প্রেরণ, শিক্ষার্থী প্রেরণের সুযোগ হয়। ভারত, রাশিয়া, জার্মানি,

ফ্রান্স, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভিয়া প্রভৃতি দেশে বহু বাংলাদেশি শিক্ষার্থী উচ্চতর বিষয়ে লেখাপড়ার জন্য যায় এবং তারা ফিরে এসে বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নয়নে অবদান রাখে।

বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুপদি অবদান হচ্ছে তাঁর জীবন-কর্ম-আদর্শ ও স্বপ্ন নিয়ে রচিত অজস্র কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ভাস্কর্য ও চলচ্চিত্র। ইতিমধ্যেই তাঁকে নিয়ে দেশ-বিদেশে রচিত হয়েছে শত শত গ্রন্থ ও ফটো অ্যালবাম। এভাবেই বঙ্গবুন্ধ হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অম্লান নক্ষত্র; যাঁর বিচ্ছুরিত আলো জাতিকে দেখাবে এগিয়ে চলার পথ।

লেখক : চলচ্চিত্র গবেষক।

ফাঁসির রায়েও সংকল্পে অটল ছিলেন বঙ্গবন্ধু

মুহাম্মদ শামসুল হক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৫৫ বছর জীবনকালে প্রায় ১৩ বছরই কারাগারে কাটিয়েছেন। এর মধ্যে বাঙালি জাতির জন্য সবচেয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও শ্বাসরুদ্ধকর সময় কেটেছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর পাকিস্তানের কারাগারে। সেখানে তিনি বন্দি ছিলেন ২৮৯ দিন। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সামরিক আইনে এক প্রহসনের বিচারে তাঁকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ বাঙালিদের প্রাণের দাবি ছয় দফা তথা স্বাধিকার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া খান-ভুট্টোর মধ্যে আলোচনা ভেঙে যায়। ইতিমধ্যে সামরিক সরকার পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী, ঢাকা-চট্টগ্রামসহ প্রধান শহরগুলোতে গোপনে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে। সন্ধ্যা থেকে খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের আত্মগোপনে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজে ধরা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তিনি আত্মগোপনে গেলে তাঁকে না পেয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ব্যাপক নিরীহ মানুষকে হত্যা করবে। এদিকে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুলিশ, বিডিআরসহ নিরস্ত্র জনতার ওপর গণহত্যা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতন শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসসহ একাধিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর রাত প্রায় দেড়টার দিকে সেনাবাহিনী তাঁর বাসভবন আক্রমণ করে তাঁকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। শুরু হয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধ। পরে জানা যায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের পর তাঁকে প্রথমে ঢাকা সেনানিবাসে এবং পরদিন পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিরোধ তথা বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার খবরটি মানুষ প্রথম দিকে জানতে পারেনি। ইয়াহিয়া-ভুটো ২৫ মার্চ রাতেই পাকিস্তান চলে যান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান করাচি গিয়ে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে শাস্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। নানা রকম গুজব ও অনিশ্চয়তার মধ্যে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা অবস্থার একটি ছবি করাচির পত্রিকায় ছাপা হলে বিশ্বব্যাপী জানাজানি হয় বাঙালির নেতাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর পর থেকে চারদিকে হৈচৈ পড়ে যায়, চলতে থাকে প্রতিবাদ, উঠতে থাকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি।

প্রথম দিকে সাংবিধানিক আদালতে তাঁর বিচার হবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলেও পরে তা ভঙ্গ করে বিচার শুরু করেন সামরিক আদালতে। ১১ জুলাই

ইয়াহিয়া সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচারের জন্য তাঁর ওপর পাকিস্তানি জেনারেলদের চাপ রয়েছে উল্লেখ করেন এবং প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বলেন, 'বাঙালি নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে সুস্থ এবং জীবিত আছেন। তবে আজকের পর শেখ মুজিবের কপালে কী ঘটবে, তা আমি হলফ করে বলতে পারব না। বিচার চলাকালে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তিনজন সহকারীসহ নিয়োগ করা হয় পাকিস্তানি আইনজীবী এ কে ব্রোহিকে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এই প্রহসনের বিচার প্রত্যাখ্যান করেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থন কিংবা আইনজীবীর সহযোগিতা নিতে অস্বীকার করেন।

১৩ অক্টোবর ১৯৭১, নিউ ইয়র্কের হেরাল্ড ট্রিবিউন জানায়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে ট্রাইব্যুনালের সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। গোপন এ বিচারের রায় পাকিস্তানের সব কূটনৈতিক মিশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক ট্রাইব্যুনালের ওই রায় কার্যকর না করার জন্য ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এদিকে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির রায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত প্রবল হয়ে ওঠে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানসহ বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে রায় কার্যকর না করে তাঁর মুক্তির ব্যাপারে চাপ সৃষ্টির জন্য অনুরোধ জানান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তিকামী মানুষ এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জোর দাবি ওঠে। তাঁর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাকিস্তান সরকারকে চাপ দেন অনেক রাষ্ট্রনেতা।

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরে হামলা চালালে ভারতও এ যুদ্ধে সরাসরি যুক্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানে শামিল হয়। ওই দিনই বঙ্গবন্ধুকে ফয়সালাবাদ কারাগার থেকে মিয়ানওয়ালি কারাগারে সরিয়ে নেওয়া হয়। ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর যৌথ বাহিনীর অভিযান তীব্র হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর ৯৩ হাজারের বেশি পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ বাংলাদেশের নেতারা বঙ্গবন্ধুকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান।

তার পরও ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর পেয়ে মিয়ানওয়ালি কারাগারে গুজব ছড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। ২০ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু গোপন স্থানেই ছিলেন। পরে ভুট্টোর আগ্রহে তাঁকে সিহালি অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। ভুট্টোকে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তিনি ভুল করেছেন। তিনি ভুট্টোকে রায় কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

টাইমস সাময়িকীর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সত্যিকার অর্থে মুজিবকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া ভুট্টোর উপায় ছিল না। মুজিবকে বন্দি রেখে পাকিস্তানের কোনো

লাভ হবে না বলেই মনে করেছিলেন ভুট্টো। এ পর্যায়ে করাচির এক সমাবেশে এক লাখেরও বেশি মানুষের সমাবেশে প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে তাদের মতামত চাইলে জনতা সম্মতি জানায়। এরপর তিনি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেন। এভাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের পাঁচ দিন পর ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি ভুট্টো ইসলামাবাদ গিয়ে একটি ভাড়া করা পাকিস্তানি বিমানে করে বঙ্গবন্ধুকে লন্ডন পাঠিয়ে দেন। সর্বোচ্চ গোপনীয়তার মধ্যে রাত ৩টায় বিমানটি ইসলামাবাদ ছেড়ে যাওয়ার ১০ ঘণ্টা পর সাংবাদিকরা এ খবর জেনেছিলেন। ততক্ষণে বাঙালির নেতা লন্ডন পৌঁছে গেছেন।

এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনার পর লন্ডনের ক্ল্যারিজ হোটেলের বলরুমে সংবাদ সম্মেলন ডাকেন বঙ্গবন্ধু। হোটেলের বাইরে তখন সমবেত হয়েছে শত শত উৎফুল্ল বাঙালি। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধুর কারাগারে থাকা অবস্থায় দেশের মানুষের জন্য তাঁর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, জেলে কী অবস্থায় ছিলেন, তাঁর প্রতি কারা কর্মকর্তাদের ব্যবহার ইত্যাদির চিত্র ফুটে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষ্যে জানা যায়, দেশের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ আসনে বিজয়ী দলের একজন জাতীয় নেতা হিসেবে পাকিস্তান সরকার কারাগারে তাঁর ওপর চরম অন্যায় আচরণ করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানিদের হাতে বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার হওয়া নিয়ে কোনো কোনো মহলের একটি নেতিবাচক সমালোচনার জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। তাঁরা বলে থাকেন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং আপসের চেষ্টা করেছিলেন। এ ধরনের কথা একেবারে যুক্তি ও ভিত্তিহীন, সত্যের অপলাপ মাত্র। বঙ্গবন্ধুর কিশোরকাল থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যেকোনো চাপ বা হুমকির মুখে কারো সঙ্গে কোনো আপস বা আত্মসমর্পণের কোনো নজির নেই। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনার নামে ঢাকা আসার আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে গ্রেপ্তার অথবা হত্যা করা হবে। তিনি তাঁর আশঙ্কার কথা বলেছিলেন 'পাকিস্তান তেহরিকে ইশতেকলাল' পার্টির নেতা এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আসগর খানকে। আসগর খান তাঁর 'উই হ্যাভ লার্ন নাথিং ফ্রম হিস্ট্রি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আমি মুজিবকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন? চলমান অচলাবস্থা কীভাবে অবসান করা যায়? মুজিব জবাবে বললেন, 'পরিস্থিতি খুবই স্পষ্ট, প্রথমে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসবেন, তারপর আসবেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তারপর ইয়াহিয়া সামরিক অভিযানের আদেশ দেবেন এবং সেটাই হবে পাকিস্তানের শেষ।' তাঁর নিজের সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেছিলেন, তাঁর ধারণা, তাঁকে গ্রেপ্তার করা অথবা মেরে ফেলা হবে। আসগর খান লিখছেন, 'একাত্তরের মার্চের ঘটনার ক্রম মুজিবের পূর্বাভাসের সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায়, যেটা বিস্ময়কর।'

দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধু আত্মসমর্পণ বা স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস করলে মুক্তির আগে ভুট্টোর প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট অথবা প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। প্রহসনের বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হওয়ার পরও তিনি এমন কোনো বার্তা দেননি যে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে রাজি। তিনি ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে যেভাবে শত্রুর মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং গ্রেপ্তার হওয়ার আগে যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তা থেকেও সরে আসেননি বা বাতিল করেননি। যদি সে রকম কিছু হতো তাহলেই প্রবাসী সরকার, মুক্তিযোদ্ধা ও দেশ-বিদেশের সরকার ও রাজনৈতিক মহলে এর মারাত্মক প্রভাব পড়ত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সুদূরপরাহত হতো। বরং তিনি তাঁর ফাঁসির রায় এবং তাঁর জন্য কবর খোঁড়ার দৃশ্য দেখেও তা উপেক্ষা করে বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে হত্যা করো আমার তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমার লাশটা আমার বাংলার মাটিতে পৌঁছে দিও।' কাজেই তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন এ কথা কেবল তাঁকে এবং তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনকে যাঁরা মেনে নিতে পারেননি তাঁদের মুখেই শোভা পায়। বরং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, 'আত্মগোপন না করে গ্রেপ্তার হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের একটি। তিনি সংবিধান ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথে ছিলেন বলেই আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন পান। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বিশ্বজনমত তাঁর পাশে থাকে।' অবশেষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের দুই দিনব্যাপী শ্বাসরুদ্ধকর প্রতীক্ষার প্রহর পেরিয়ে ১০ জানুয়ারি লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে তাঁর ভালোবাসার মানুষদের কাছে ফিরে আসেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

লেখক : জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণাকর্মী ও সম্পাদক, ইতিহাসের খসড়া।

কেন তিনি রাজনীতির কবি

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৭ সালের ভাদ্রে এবং আষাঢ়ে পর পর দুটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর প্রবন্ধ দুটির নাম যথাক্রমে 'বাঙালি কবি নয়' এবং 'বাঙালি কেন কবি নয়'। অর্থাৎ বাঙালি কবি নয়–সে দাবি তিনি করেছেন এবং সেই দাবির পক্ষে প্রমাণ হাজির করার চেষ্টা করেছেন অন্য প্রবন্ধে। তবে বাঙালির মধ্যে রবীন্দ্রনাথসহ অনেকেই অসংখ্য কালোত্তীর্ণ কবিতা লিখে গেছেন, যা বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে বিশেষ মর্যাদার আসনে ঠাঁই পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, 'সকলেই কবি নন। কেউ কেউ কবি; কবি কেননা তাঁদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভেতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে এবং অনেক শতাব্দীর পাশাপাশি আধুনিক জগতের নব নব কাব্য বিকিরণ তাঁদের সাহায্য করছে।'

সাহিত্যের কবিতা ও কবি প্রসঙ্গে আলোচনা এই নিবন্ধের মুখ্য বিষয় নয়। এখানে আলোচনা করব রাজনীতির কবি ও কবিতা নিয়ে। কে সেই রাজনীতির কবি? কোনটিই বা রাজনীতির কবিতা?

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় লিখেছেন 'আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি। /সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা/ সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা/ জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা/ রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।/ আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো/ আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।'

এ যেন ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণকে যে বাঙালি হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনি ভাবতেই পারেন কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বোধ হয় সেই ঐতিহাসিক ভাষণকে মনে রেখে কবিতাটি লিখেছেন। বাঙালিরা না হয় সমস্ত আবেগ নিয়ে এভাবে ভাবতে পারেন। কিন্তু যখন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজউইক ম্যাগাজিন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করতে গিয়ে রাজনীতির কবি ও কবিতা প্রসঙ্গ টানেন তখন আবেগের ঊর্ধ্বে এক নির্মোহ উপলব্ধির বিশ্বায়ন দেখি আমরা।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজউইক ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও প্রতিবেদক জীবনানন্দ দাশের কথাগুলো জানতেন কি না, জানা যায়নি। তবে আমরা দেখেছি ১৯৭১ সালের ৫

এপ্রিল নিউজউইক ম্যাগাজিন তাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। এই প্রতিবেদনে তাঁকে অভিহিত করা হয় 'রাজনীতির কবি' হিসেবে।

সেই প্রতিবেদনের একপর্যায়ে বলা হয়েছে, 'তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) রাজনীতির একজন কবি, প্রকৌশলী নন, আর বাঙালিদের মধ্যে কারিগরি দিকের চেয়ে শিল্পকলার প্রতি অধিকতর ঝোঁক রয়েছে। সে কারণে মুজিবের নিজস্ব স্টাইল ঠিক তাই, যা ওই এলাকার সব শ্রেণি ও আদর্শের লোককে সংগঠিত করার জন্য দরকার।'

কখন এই অভিধায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিহিত করা হয়েছিল? ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের উত্তাল জনসমুদ্রের সভামঞ্চে যখন তিনি কবির হৃদয়ের কল্পনার ভেতরের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত ১১০৭টি শব্দ বললেন, যা ছিল অনবদ্য রাজনৈতিক ক্যারিসমেটিক বিভায় সজ্জিত। সুনিপুণ শব্দচয়ন ও স্বতঃস্ফূর্ত বাক্য বিন্যাসে গাঁথা একটি মহাকাব্য।

২.

জাতির পিতার ৭ই মার্চের ভাষণে যে বহুমাত্রিকতা ছিল, তা সর্বজনবিদিত। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আবদুল খালেকের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর লেখা 'বঙ্গবন্ধুর উদারতা এবং উত্তরাধিকার' গ্রন্থের একপর্যায়ে লিখেছেন, 'দার্শনিক যাঁরা, তাঁরা এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুকে আবিষ্কার করেছেন একজন প্রখ্যাত দার্শনিক হিসেবে, সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁকে বলতে চেয়েছেন একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে, কবি-সাহিত্যিকরা বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন ভাষণটি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা।' সকলেই যেমন কবি হতে পারেন না, তেমনি পৃথিবীর সব রাজনীতিবিদও কবির মর্যাদা পান না। 'গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল উইল নেভার পেরিশ ফ্রম দ্য আর্থ'-এর মতো উক্তিসমৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ১৮৬৩ সালের বিখ্যাত গেটিসবার্গ বক্তৃতা, ১৯৬৩ সালের মার্টিন লুথার কিংয়ের 'আই হ্যাভ অ্যা ড্রিম' ভাষণ অথবা ১৯৪০ সালের উইনস্টন চার্চিলের 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস' ভাষণ কিংবা ১৯৪৭ সালের জওয়াহেরলাল নেহেরুর 'অ্যা ট্রাইস্ট উইথ ডেস্টিনি'কে তো কাব্যের সাথে তুলনা কেউ করেননি। অথচ এগুলো বিশ্বের সেরা ভাষণের তালিকায় ওপরের দিকেই আছে। অন্তত তিনটি কারণে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি অনন্য স্বকীয়তা রাখে। এক. ভাষণটি অলিখিত; দুই. তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবে একটি শক্তিশালী উপস্থাপনা; তিন. ভাষণের মাঝে মাঝে আঞ্চলিক ও লোকায়ত ভাষার প্রয়োগ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল একটি অগ্নিমশাল, যা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধের দাবানল। যে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের, যার নাম বাংলাদেশ। এই ঐতিহাসিক ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়কেই নাড়া দেয়নি, সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। এই ভাষণের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতিকে মুক্তির মোহনায় দাঁড় করিয়েছিলেন জাতির পিতা। সেদিন কেবল

বাংলাদেশ নয়, পুরো বিশ্ব বুঝে গিয়েছিল এই ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য সামগ্রিক দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

সেদিন বঙ্গবন্ধু ভাষাশিল্পের সুনিপুণ কারিগরের মতোই শুরু করলেন এভাবে, 'ভায়েরা আমার। আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম?'

অসাধারণ কাব্যিক দ্যোতনা নিয়ে এক মহাকাব্যের সূচনা যেন। এরপর বঙ্গবন্ধু টানা প্রায় ১৯ মিনিট বলে গেলেন অমর মহাকাব্য। ভয়ানক চাপ আর টানটান উত্তেজনার মধ্যেও অলিখিত ভাষণের কোথাও থমকে যাননি বঙ্গবন্ধু।

পুরো ভাষণে ছিল আসন্ন যুদ্ধের রণকৌশল ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। তবে তা ছিল বেশ কৌশলে, কবিতার মতো আড়ে আড়ে। তিনি এ দেশের মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। তিনি জানতেন, কোন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই এই ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতির সামনে কেবল একটি স্বাধীন রাষ্ট্রই উপস্থাপন করেননি, এর ভবিষ্যৎ কী হবে, তা-ও তুলে ধরেন।

৯০টি বাক্যে সংলাপের পর সংলাপে ছিল দ্বন্দ্ব ও রসের নানা প্রকরণ। দুঃখ-ক্ষোভ, উত্তেজনা, শান্তি-শৌর্যের বার্তা পৌঁছে দিতে ভারত নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন রসের সমাহার দেখা গেছে ৭ই মার্চের ভাষণে। শব্দ গুনে গুনে চরণ গুনে গুনে ঠিক যতদূর গেলে মাত্রাতিরিক্ত না হয়, ঠিক সেই মাপেই ভাষণটির বিস্তার, চড়াই-উতরাই দেখা গেছে। কোথাও ছিল না অতিকথন, না ছিল পুনরুক্তি। কোনো প্রকার জড়তা ছাড়াই ঝড়ের বেগে কথা বলে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

তাঁর অবয়বে ছিল পিছু না হটার দৃঢ়তা, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির জন্য উপচে পড়া আবেগ, যা তাঁর অভিব্যক্তি বা বডি ল্যাংগুয়েজে উদ্ভাসিত হয়েছিল। রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত আবেগমথিত ১০ লক্ষ জনমানুষের জন্য ছিল বার্তা, বার্তা ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং বিশ্ববাসীর প্রতিও।

বঙ্গবন্ধু যা বিশ্বাস করেছেন, ভেবেছেন এবং বাস্তবসম্মত মনে করেছেন–সুচিন্তিতভাবে তাই ভাষণে বলেছেন। ৭ই মার্চের বক্তব্যের আগের দিন কী ভেবেছিলেন, তা নিয়ে তাঁরই কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ : কিছু স্মৃতি' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছেন, সেদিন সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়ে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুকে বলেছেন, 'সামনে তোমার লাঠি, পেছনে বন্দুক। তোমার মনে যে কথা আছে তুমি তা-ই বলবে। অনেকে অনেক কথা বলেছে। তোমার কথার ওপর সামনের অগণিত মানুষের ভাগ্য জড়িত,

তাই তুমি নিজে যেভাবে যা বলতে চাও, নিজের থেকে বলবে। তুমি যা বলবে, সেটাই ঠিক হবে।'

একজন সার্থক কবির মতোই হৃদয়ের গভীরে নিজের আত্মপরিচয়, আপন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে ধারণ করে সেই উপলব্ধি থেকে সেদিন ভাষণ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সিপাহি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, গারো-হাজং বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহসহ অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সব আন্দোলন-সংগ্রামকে অন্তরে ধারণ করেছিলেন। তারই রেশ ধরে ভাষণে স্পষ্ট ভাষায় সতর্কবার্তা দিতে পারলেন, 'আর যদি একটা গুলি চলে...।'

অতীত বিশ্লেষণ, বর্তমানের মূল্যায়ন এবং আগামীর ভাবনা দিয়ে সাজিয়ে ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধু ভাষণটিকে নিয়ে গেছেন পরিণতির দিকে–'রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে।' সর্বশেষে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' আর তো কিছু বলার বাকি নেই। সেই কবিতার মতোই রূপকাশ্রয়ে বুঝিয়ে দিলেন বাঙালিকে কী করতে হবে।

প্রমিত বাংলা ব্যবহারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মতোই তিনি ব্যবহার করেছেন আঞ্চলিক ও লৌকিক বুলি। বাঙালিদের উদ্দেশে করণীয় সম্পর্কে বলার সময় তিনি সচেতনভাবেই ব্যাবহারিক জীবনের বুলি ও বাক্‌ভঙ্গিমা ব্যবহার করেছেন, যার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা প্রকাশের পাশাপাশি মাটি ও মানুষের জন্য তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাও প্রকাশ পেয়েছে।

তাই তিনি শিকড়ের ভাষায় বলেছেন, 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'। অন্তর থেকে উৎসারিত আঞ্চলিকতায় ব্যবহার করেছেন জীবনের তরে, হুকুম দেবার নাও পারি, বলে দেবার চাই, মনে রাখবা। নিঃসন্দেহে এই বৈচিত্র্যময় শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভাষণটি অনন্য বৈভবমণ্ডিত হতে পেরেছিল। শব্দের সুনিপুণ কারিগর ছাড়া এ লালিত্য ছড়ানো দুঃসাধ্য কাজ।

৩.

নিউজউইকের সেই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, শেখ মুজিব তাঁর জনসাধারণের কাছে ছিলেন একজন নায়ক। সভা-সমাবেশে লাখ লাখ লোককে আকর্ষণ করতে পারেন। আর সভা-সমাবেশে আবেগপূর্ণ ভাষায় দেওয়া তাঁর ভাষণ সমস্ত জনসাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে। জনৈক কূটনীতিকের ভাষ্য, তাঁর সঙ্গে একাকী আলোচনা করতে গেলেও তিনি এমনভাবে কথাবার্তা বলেন, যেন তিনি প্রায় ৬০ হাজার লোকের উদ্দেশে বক্তৃতা করছেন। তবে তিনি কখনোই একজন মৌলিক তত্ত্বাকারের ভান করেন না। ভাষণে স্বাধীনতার চেয়ে মুক্তি শব্দটা বঙ্গবন্ধু বেশি ব্যবহার করেছেন। এটি ছিল কবির মতো কৌশলে বিকল্প শব্দচয়ন। শুরুতে বলেছেন, 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়'। আবার শেষে দুবার 'মুক্তি' শব্দ ব্যবহার করেছেন, প্রথমে, 'এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ' এবং পরে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। আশ্চর্যের

সাথে লক্ষ করতে হয়, ভাষাতাত্ত্বিক বা পুরোদস্তর কবি না হয়েও 'স্বাধীনতা' ও 'মুক্তি' শব্দ দুটির পৃথক দ্যোতনা বুঝে তিনি এভাবেই বলে গেলেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে নোবেল বিজয়ী শন ভ্যাকব্রাইড বলেছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন, কেবল ভৌগোলিক স্বাধীনতাই যথেষ্ঠ নয়, প্রয়োজন মানুষের মুক্তি, বেঁচে থাকার স্বাধীনতা। আর এ সত্যের প্রকাশ ঘটে ৭ই মার্চের ভাষণে।' অমর্ত্য সেন বলছেন, 'তিনি ছিলেন মানবজাতির পদপ্রদর্শক। তাঁর সাবলীল চিন্তাধারার সঠিক মূল্য শুধু বাংলাদেশ নয়, সমস্ত পৃথিবীও স্বীকার করবে।' ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছেন, 'এটি শুধু ভাষণ নয়, এটি একটি রণকৌশলের অনন্য দলিল।' গ্রেট ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ বলেছেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে যত দিন পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম থাকবে, তত দিন শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণটি মুক্তিকামী মানুষের মনে চির জাগরূক থাকবে। এ ভাষণ সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণা।' পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন, '৭ই মার্চের ভাষণ একটি অনন্য দলিল। এতে একদিকে আছে মুক্তির প্রেরণা, অন্যদিকে আছে স্বাধীনতার পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা।'

'বিশ্বের ইতিহাসে এ রকম আরেকটি পরিকল্পিত এবং বিন্যস্ত ভাষণ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে একই সঙ্গে বিপ্লবের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে দেশ পরিচালনার দিকনির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে' বলে মন্তব্য করেছে থমসন রয়টার্স, বিবিসি, এএফপি, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, আনন্দবাজার পত্রিকাসহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো। প্রতি বছর ৭ই মার্চ আমাদের জীবনে এক অন্য রকম উপলক্ষ হয়ে আসে। ১৯৭১ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ভাষণ সব ধরনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বজ্রতুল্য ঘোষণা হিসেবে যেন বিরাজ করে। যে ভাষণ আবেগে টগবগ করে ফোটে, আবার বুদ্ধি ও কৌশলের নির্মিতিও ঘটে সে ভাষণ বক্তা ও শ্রোতা–উভয়েরই মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে যুগপৎ সক্রিয় রাখতে বাধ্য। বঙ্গবন্ধুর বাগ্মিতার জাদুতে ভাষণটি ছিল এক তারে বাঁধা। এই গুণপনাগুলোর জন্যই কালোত্তীর্ণ শিল্পের মর্যাদা পেয়ে ভাষণটি ৫১ বছর পরও হয়ে উঠেছে আমাদের জন্য এক অনিঃশেষ প্রেরণার উৎস।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর।

পাঁচ দশকে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ

মো. মিজানুর রহমান

পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচার, নির্যাতন আর বঞ্চনার হাত থেকে বাঙালি জাতিকে রক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধজয়ের রক্তাক্ত অধ্যায়ে সৃষ্টি করেছিল গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। দীর্ঘ ৯ মাসের নজিরবিহীন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে (কোনো কোনো বর্ণনায় ৪টা ২১ মিনিটে) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের জন্ম হয়। দেড় হাজার বছর আগে কর্ণাটক থেকে আগত সেন রাজাদের হাতে পাল রাজাদের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। এর পর মোগল, পাঠান, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানের শত শত বছরের শোষণ আর বঞ্চনার অবসান ঘটে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে। এ জন্য বাঙালি জাতিকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। ৩০ লাখ শহিদের রক্ত আর দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের এ স্বাধীনতা।

সব শঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু লন্ডনে পৌঁছান। তারপর দিল্লি হয়ে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে আসেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু অস্থায়ী সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে দেশ গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি। তাই তিনি কাল বিলম্ব না করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করলেন। বঙ্গবন্ধু দেখলেন, ৯ মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানিরা এ দেশে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে ছিল, সর্বত্র ছিল পাকিস্তানির বাহিনীর ধ্বংসলীলার ক্ষতচিহ্ন। তারা এ দেশের যোগাযোগব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস করেছে। হাজার হাজার গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে এক কোটি মানুষকে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এসব শরণার্থী তাদের বাড়িতে এসে দেখে কিছুই নেই, সব পুড়িয়ে দিয়েছে পাকসেনারা। একদিকে দীর্ঘদিন কলকারখানা বন্ধ, অন্যদিকে কৃষকও দীর্ঘদিন তাঁর জমিতে ফসল ফলাতে পারেননি। এমনই এক অভূতপূর্ব পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির

পুনর্গঠন ছিল বঙ্গবন্ধুর সামনে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। তিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চালু করতে গেলেন চট্টগ্রাম বন্দর, সেখানে পাকসেনারা মাইন বসিয়ে রেখেছে। বন্দরকে চালু করতে হলে মাইন পরিষ্কার করতে হবে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করে আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরটি ব্যবহার উপযোগী করে দেয়। বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে দেখলেন বাংলাদেশ ব্যাংকে মাত্র ১৮ ডলার আছে। ভারত তখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে পাঁচশত মিলিয়ন ডলার দেয়। এ ছাড়া সুইডেন ও কানাডা বাংলাদেশকে ডলার ও গোল্ড দিল। এই ডলার দিয়ে বাংলাদেশ আইএমএফ ব্যাংকে চাঁদা দিয়ে সদস্য হলো। আর ব্যাংকে গোল্ড থাকায় নিজস্ব মুদ্রা, অর্থাৎ টাকা ছাপানোর সুযোগ পেল।

মার্কিন কূটনৈতিক জনসন বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। পরে এটাকেই হেনরি কিসিঞ্জার উল্লেখ করায় তৎকালীন বিশ্বে বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে ব্যাপক প্রচার পায়। সে সময়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেই শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অস্টিন রবিনসন তাঁর 'ইকোনমিক প্রসপেক্টাস অব বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্রন্থে বাংলাদেশের টিকে থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি বেশি থাকায় দেশের ভবিষ্যৎকে ম্যালথাসিয়ান স্ট্যাগনেশনের সাথে তুলনা করেন, যার পরিণতি দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু। হিউজ ফারেন বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি ঠিক হতে ২০০ বছর লাগবে। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিয়ে প্রথম যে রিপোর্ট করল সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল এ দেশের জিডিপি শতকরা ১২ ভাগ পেছনের দিকে, অর্থাৎ ১২ পারসেন্ট ঋণাত্মক। মাথাপিছু আয় ৮৫-৮৬ ডলারের বেশি হবে না। সব জায়গা থেকে শুধু নেতিবাচক কথা। সত্তরের দশকে বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল দারিদ্র্য, দুর্যোগ আর রাজনৈতিক অস্থিরতার দেশ হিসেবে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে খাদ্য ঘাটতি, দুর্ভিক্ষ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত জনপদ হিসেবে চিনেছে বিশ্ববাসী। বিশ্বের নামকরা গণমাধ্যমে প্রথম থেকেই বাংলাদেশকে দেখানো হতো অত্যন্ত দরিদ্র একটি দেশ হিসেবে, যেখানে দেশের লোক খাবার পাচ্ছে না। আর দেখানো হতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর বন্যার ছবি। পশ্চিমা বিশ্ব সর্বদাই বাংলাদেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। বঙ্গবন্ধু এসব অপপ্রচারকে গুরুত্ব না দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে সকলকে জানিয়ে দিলেন–'বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে।'

বঙ্গবন্ধু দেশ গড়ায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। শুরু হলো আরেক যুদ্ধ। দেশ গড়ার কাজ। বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ, স্বাধীন বাংলার প্রশাসনিক পদক্ষেপ, ভারতীয় বাহিনীকে দ্রুত তাদের দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা, সংবিধান প্রণয়ন করা, ১৯৭৩ সালের প্রথম সাধারণ

নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, পরিকল্পিতভাবে দেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ। এ ছাড়া জাতিসংঘের সদস্যপদসহ অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতো সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ, সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, ৫০০ চিকিৎসককে গ্রামে পদায়ন করা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশ যখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে তখনই ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে সপরিবারে শহিদ হন ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। থমকে দাঁড়ায় বাংলাদেশ।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে তলাবিহীন ঝুড়ি হতে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের যে পরিচিতি আর ভাবমূর্তি ছিল সেটি গত পাঁচ দশকে পাল্টেছে বহুভাবে এবং অহংকার ও অগ্রগতির অনেক জায়গা আছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে দেখা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট মিরাকল হিসেবে। কেউ কেউ বলছেন, ডেভেলপমেন্ট প্যারাডক্স বা উন্নয়নের একটা ধাঁধা। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অনেক দেশের কাছেই উন্নয়নের দৃষ্টান্ত। গত অর্ধশতাব্দীতে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনামল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৭ বছরের দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ২৭১ গুণ বেড়েছে আর মাথাপিছু আয় বেড়েছে তিনশত গুণেরও বেশি। মাথাপিছু আয় এখন দুই হাজার ৫৫৪ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল ২০২১, সিইবিআরের মতে, ২০৩৫ সালে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৫তম অর্থনৈতিক শক্তি। বিদেশি সাহায্যনির্ভর দেশ থেকে বাংলাদেশ এখন তার পার্শ্ববর্তী দেশকে (শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ) ঋণ সহায়তা দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে। দেশ স্বাধীনের সময় বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৭ বছর, আর এখন এটা বেড়ে হয়েছে ৭৩ বছর। ১৯৭২ সালে শতকরা ৮০ শতাংশ লোক ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে, করোনা মহামারির আগে সেটা নেমে এসেছিল শতকরা ২০ শতাংশে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৬.৯ থেকে কমে এখন ১.২-এ নেমে এসেছে। মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে, শিক্ষার প্রসার বেড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় এখন ছেলেমেয়ের বৈষম্য নেই। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছে, বাল্যবিবাহ কমেছে, সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত পাঁচ দশকে প্রতিটি প্রজন্ম তার পূর্বের প্রজন্ম থেকে ভালো আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিয়ে এগিয়ে চলছে। দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮.৪ বিলিয়ন (২৪ আগস্ট ২০২১ অনুযায়ী)। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পেছনেই বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের পেছনে নিকটতম অবস্থানে আছে পাকিস্তান, তবে তা ২৮ ধাপ পেছনে। দেশীয় অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সারা দেশেই এখন উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। মেগাপ্রকল্পগুলো এখন দৃশ্যমান। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে এলডিসি থেকে উত্তরণের অনুমোদন পেয়ে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে, যা ২৪ নভেম্বর ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া, সাফল্যের সাথে দুর্যোগ মোকাবেলা করা, শান্তিরক্ষা মিশনে ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং এ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্ত দেশের প্রতিনিধি হিসেবে নেতৃত্ব দেওয়া এবং তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে উঠে আসা বিশ্বে বাংলাদেশের ইতিবাচক ইমেজ তৈরি হয়েছে। বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার আমাদের সাকিব, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্ব ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন এখন বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা আমাদের অবস্থান জানিয়েছি বিশ্ববাসীকে। দেশ এখন ফাইভজি নেটওয়ার্কের যুগে প্রবেশ করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত আমাদের তরুণসমাজ। এ সবই বাংলাদেশের সাফল্য।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে সেবা খাতের পরিধি বেড়েছে, কিন্তু মানসম্পন্ন সেবা দরিদ্ররা পাচ্ছে না, আবার সকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও বৈষম্য রয়েছে। করোনাকালে ডিজিটাল বৈষম্য প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা, পুষ্টি নিশ্চিত করা যায়নি। শহর ও গ্রামের মধ্যে অবকাঠামোগত বৈষম্য রয়েছে। এগুলো দূর করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ তার নতুন দর্শন 'আমার গ্রাম আমার শহর' ঘোষণা করেছেন। এতে শহরের সকল সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের থেকেও বাংলাদেশ করোনা অতিমারি দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। এতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছে, যা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

পাঁচ দশকে বাংলাদেশ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বদলে গেছে, বদলায়নি শুধু জাতির পিতার আদর্শ এবং স্বপ্ন থেকে। এই স্বপ্ন ও আদর্শকে ধারণ করে বিশ্বসভায় বাংলাদেশ স্থান পেয়েছে এক অনন্য উচ্চতায়। এরই ধারাবাহিকতায় অর্জিত হবে ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ। সেই স্বপ্নের উন্নত বাংলাদেশের চাবি এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে।

লেখক : সহকারী কর কমিশনার

ভাষাসৈনিক বঙ্গবন্ধু

নাসরীন জাহান লিপি

দাম দিয়ে কিনেছি প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, আর তাই ইতিহাস ভুলিনি। ভুলিনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক অদ্ভুত দেশটির জন্ম হয়েছিল দুটি অংশে ভাগ হয়ে। পাকিস্তানের পূর্ব অংশ আর পশ্চিম অংশের মাঝখানে আরেক দেশ ভারত। ৫৬ ভাগ জনসংখ্যার বাস পূর্ব অংশে। অথচ পাকিস্তানের রাজধানী হলো পশ্চিম অংশে। সুজলা-সুফলা পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ লুট করে ফুলেফেঁপে উঠছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সৌভাগ্য। বাঙালিদের ওপর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকরিতেও শুরু হয়েছিল বৈষম্য-অবিচার।

কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে স্নাতক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে মাস্টার্সে পড়তে শুরু করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান নামের এক তরুণ ছাত্র। অন্য অনেকের মতো চুপ থাকতে পারেননি তিনি। শুরু করেন প্রতিবাদ। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা তাঁর ওপর কড়া নজর রাখতে শুরু করে তখন থেকেই। প্রায়ই কারাবন্দি হতে হয়েছে। তবু দমে যাননি তিনি।

১৯৪৮ সালের শুরুর দিকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মুখের ভাষা, বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বানানোর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আজন্ম মাতৃভাষাপ্রেমী শেখ মুজিবুর রহমান নানা কৌশলে বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে থাকেন। ১৯৪৮ সালের ৪ মার্চের গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান, সান অব লুৎফর রহমান অব টুঙ্গিপাড়া, ফরিদপুর অ্যান্ড স্টুডেন্ট ফার্স্ট ইয়ার বি এল ২১ দফা দাবিসহ একটি লিফলেট বিতরণ করছিলেন, যেখানে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, "যারা উর্দু ভাষা সমর্থন করে তাদের একমাত্র যুক্তি হলো উর্দু 'ইসলামিক ভাষা'। উর্দু কী করে যে ইসলামিক ভাষা হলো আমরা বুঝতে পারলাম না।"

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। আসলে ইসলামের কথা বলে ধর্মভীরু মুসলমানদের ধোঁকা দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। বিষয়টি বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের। বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিদের সময় লাগেনি বুঝতে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস গড়ে তুলেছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ'। পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হলো ১১ মার্চ 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' হিসেবে পালন করা হবে।

১১ মার্চ ১৯৪৮ সাল। ভোরবেলা থেকে শত শত ছাত্রকর্মী নেমে এলেন পথে। সবার সামনে ছাত্রনেতা মুজিব। জিপিওর সামনে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে আহত হলেন অনেকে। বঙ্গবন্ধু স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন, 'আমি জেনারেল পোস্ট অফিসের দিক থেকে নতুন কর্মী নিয়ে ইডেন বিল্ডিংয়ের দিকে ছুটছি, এর মধ্যে শামসুল হক সাহেবকে ইডেন বিল্ডিয়ের সামনে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। গেট খালি হয়ে গেছে। তখন আমার কাছে সাইকেল। আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য সিটি এসপি জিপ নিয়ে বারবার তাড়া করছে, ধরতে পারছে না।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-৯৩)

এভাবে আর কতক্ষণ? তরুণ শেখ মুজিবসহ বহু ছাত্র গ্রেপ্তার ও জখম হলেন। এর দুই দিন পর জেলখানায় দানা বেঁধেছিল এক গভীর ষড়যন্ত্র। নিষ্ঠুরতার জন্য জেল সুপারিনটেন্ড মি. বিলের কুখ্যাতি ছিল। ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলে খাপড়া ওয়ার্ডে রাজবন্দিদের ওপর গুলি করে কয়েকজন দেশপ্রেমিককে হত্যার নেতৃত্ব দিয়েছিল এই লোক। বাংলা ভাষার দাবিকে দমন করতে প্রতিবাদী বন্দি ছাত্রদের ভয় দেখানোর পরিকল্পনা করলেন মি. বিল। ঠিক হলো, ওয়ার্ডের দরজা খুলে সিপাহিদের নিয়ে ভেতরে ঢুকে বন্দি ছাত্রদের মারধর করবে জেলখানার জমাদার। বুঝতে পেরেছিলেন মুজিব। সাবধান করে দিলেন সবাইকে। ডিউটিতে থাকা বাঙালি সিপাহিও সাহায্য করলেন। চাবি নিয়ে কেটে পড়লেন। ষড়যন্ত্র সফল হলো না। প্রাণে বেঁচে গেলেন ছাত্ররা।

১৫ মার্চ মুক্তি পেলেন মুজিব। এরপর রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন তিনি ছড়িয়ে দিলেন ঢাকাসহ সারা দেশে। ফলে কেবল ছাত্ররাই নয়, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি পরিণত হলো গণদাবিতে। ষড়যন্ত্রের শেষ চেষ্টা হিসেবে পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আজম জিন্নাহ এলেন ঢাকায়। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান, বর্তমানের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঘোষণা দিলেন, 'উর্দু অ্যান্ড উর্দু অ্যালোন উড বি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্য স্টেট অব পাকিস্তান'। অর্থাৎ উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উপস্থিত জনতা সমস্বরে জানিয়ে দিলেন, 'মানি না!' এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা করতে উঠে তিনি আবারও বললেন কথাটি। ছাত্ররা সমস্বরে বলে উঠলেন, 'নো নো নো'।

'জিন্নাহ প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করেছিলেন, তারপর বক্তৃতা করেছিলেন। আমার মনে হয়, এই প্রথম তাঁর মুখের ওপরে তাঁর কথার প্রতিবাদ করল বাংলার ছাত্ররা। তারপর জিন্নাহ যত দিন বেঁচে ছিলেন আর কোনো দিন বলেন নাই উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।' ('অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে) মুসলিম লীগ সরকার ক্ষেপে গেল। যেকোনো অজুহাতে শুরু করেছিল নিরাপত্তা আইনের ব্যবহার, জেল-জুলুম-জরিমানা। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার আন্দোলনকে সমর্থন করাতে বন্দি হলেন মুজিব। বিশ্ববিদ্যালয় বহিষ্কার করে তাঁকে। অনেকেই মুচলেকা ও জরিমানা দিয়ে ছাত্রত্ব ফিরে পান। শেখ মুজিব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'আমি কোনো অন্যায় দাবি করি নাই, অত্যন্ত

ন্যায়সঙ্গত দাবি করেছি। মুচলেকা ও জরিমানা দেওয়ার অর্থ হলো দোষ স্বীকার করে নেওয়া আমি তা করব না।'

১৯৫২ সাল। তখনো শেখ মুজিবুর রহমান জেলে বন্দি। নানা কৌশলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে গতিশীল করতে নানা কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশনা দিতেন কারাগার থেকে। জেলখানা থেকে চিরকুট পাঠাতেন, আন্দোলনকে চাঙ্গা রাখতেন। সরকার টের পেয়ে তাঁকে ফরিদপুর কারাগারে সরিয়ে নেয়। স্থানান্তর হওয়ার পথেও তিনি নারায়ণগঞ্জে নেতাকর্মীদের ভাষা আন্দোলনে কী করতে হবে, তার নির্দেশনা দিয়ে যান। বন্দি মুজিব প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিনের কাছে দাবি জানান, যদি ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে মুক্তি দেওয়া না হয়, তাহলে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট পালন করতে শুরু করবেন। 'Either I will go out of the jail or my deadbody will go out.' ('অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে) মুক্তি পেলেন না।

গোয়েন্দারা সরকারকে জানালেন, ঢাকা শহরের দেয়ালে দেয়ালে লিফলেট। ছাত্রলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহিউদ্দিন অনশন ধর্মঘট করছেন। তাঁদের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে এসেছে সাধারণ মানুষ। তবু মুক্তি পেলেন না। অনশনের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় গোপনে ছাত্রলীগের সভাপতি নইমুদ্দিন খান ও সাধারণ সম্পাদক খালেক নেওয়াজ দেখা করলে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন বিষয়ে আলোচনা করলেন। পালিত হলো ২১ ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের সেই ২১ ফেব্রুয়ারি, ভাইয়ের বুকের তাজা রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি, যেদিন ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি করে বর্বরতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটায় পাকিস্তানের পুলিশ। রক্তাক্ত শরীরে রাজপথে লুটিয়ে পড়েন সালাম-বরকত-রফিক-শফিক-জব্বার ও আরো অনেকে। ভাষার জন্য আত্মত্যাগ করেন বাংলার সন্তান।

সেদিন বঙ্গবন্ধুর মনের অবস্থা কেমন ছিল? 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, '২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে।'

'খুব খারাপ লাগছিল, মনে হচ্ছিল চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। গুলি করার তো কোনো দরকার ছিল না। হরতাল করবে, সভা ও শোভাযাত্রা করবে, কেউ তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় না। কোনো গোলমাল সৃষ্টি করার কথা তো কেউ চিন্তা করে নাই। ১৪৪ ধারা দিলেই গোলমাল হয়, না দিলে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।'

বিক্ষুব্ধ জনতার দাবির মুখে ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে মুক্তি দেওয়া হলো বাঙালির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি আবারও শুরু করলেন সারা দেশ ঘুরে ভাই হত্যার প্রতিবাদ, কণ্ঠে তাঁর বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জোর দাবি। পশ্চিম

পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের সাথেও দেখা করেছেন। ১৯৫২ সালের ৩০ মে করাচিতে এক সভায় তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জানানোর পাশাপাশি সরকারের দুর্নীতি এবং পাট চাষিদের ন্যায্য দাবির পক্ষে সমর্থন জানিয়ে ভাষণ দেন বলে গোয়েন্দা রিপোর্ট করা হয়।

দিনের পর দিন ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অধিকারের দাবিতে একাত্ম হয়েছিল বাঙালি। নেতৃত্বের গুণেই সেদিনের সেই তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ক্রমে হয়ে উঠলেন বাঙালির বন্ধু বঙ্গবন্ধু। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের যে বীজ বপন করা হয়েছিল তা-ই পরবর্তী সময়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নে। ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ নামের দেশটির জন্ম দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অপরিসীম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাঙালি সার্থক করে তোলে বাংলাদেশের জন্ম।

স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিলেন, অফিসের কাজে বাংলাভাষা প্রচলনের প্রথম সরকারি নির্দেশ জারি করলেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন মাতৃভাষা বাংলাতেই। বায়ান্নর ভাষাশহিদ সালাম-রফিক-বরকতের রক্তের ঋণ শোধ হলো, সারা বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে বিজয়ের বেশে দাঁড়াল আমার ভাষা বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার মহান সৈনিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান বাংলা ভাষাভাষী মানুষ কখনোই ভুলবে না। ভুলতে পারে না।

লেখক : প্রধান মিডিয়া কর্মকর্তা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি।

শতবর্ষে শত আশা

মেহবুব সাত্তার

সদ্য স্নাতক স্বপ্নবাজ তিন তরুণ আমেরিকার অর্থ আদান-প্রদানের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পেপ্যালে চাকরি করেন। মালিকপক্ষ হঠাৎ একদিন প্রতিষ্ঠানটি বিক্রি করে দেয়। অনেকের সাথে তাঁদেরও চাকরি চলে যায়। হায়ার অ্যান্ড ফায়ারের দেশে এগুলো খুব স্বাভাবিক ঘটনা। বেকার জীবনে তিন বন্ধু হতাশ না হয়ে নতুন কিছু একটা করার চিন্তা করতে থাকেন। ২০০৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে বিশ্ববাসীর সামনে তাঁদের আইডিয়া তুলে ধরলেন অনলাইনে ভিডিও শেয়ারিংয়ের ওয়েবসাইট ইউটিউব। এই তিন স্বপ্নবাজ তরুণ হলেন চাদ হার্লে, স্টিভেন চ্যান ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জাবেদ করিম। ইউটিউবের প্রথম ভিডিও জাবেদ করিমের 'চিড়িয়াখানায় আমি' ২৩ এপ্রিল ২০০৫ সালে আপলোড করা হয়। দুই মাস পর আনুষ্ঠানিকভাবে সবার জন্য ওয়েবসাইটটি উন্মুক্ত করা হয়। ২০০৬ সালে গুগল ১.৬৫ বিলিয়ন ডলারে ইউটিউব কিনে নেয়। এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে লাভজনক স্টার্টআপ বা নতুন উদ্যোগের একটি হলো ইউটিউব। আর এর সাথে জড়িয়ে গেল একজন বাংলাদেশির নাম, যার বাবা নাইমুল করিম আর মা জার্মান। বড় কিছু করতে গেলে বড় স্বপ্ন দেখতে হয়। পঞ্চাশের দশকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি সবার মাঝে তাঁর সেই স্বপ্ন ছড়িয়ে দিলেন, সবাইকে উদ্বুদ্ধ করলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সমাজের সকল স্তরের জনগণ এগিয়ে এলো, দেশ স্বাধীন হলো। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলো।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি আজকের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে উপলব্ধি করেছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশের গুরুত্ব। তাই তিনি তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ, রূপকল্প-২০২১-এর স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলেন দেশবাসীকে। ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করে দেশ থেকে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করা এবং মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশবাসী বিশেষ করে যুবসমাজ এগিয়ে এলো, রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়িত হলো। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। করোনা অতিমারি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল। ১৩ বছর ধরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ফলে দেশের সকল ক্ষেত্রেই আইসিটির প্রভাব পড়েছে। দেশের মানুষ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলো ফাইবার অপটিক্যাল সংযোগের আওতায় এসেছে। স্কুলগুলোতে

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হাজার হাজার ই-বুক ও ইন্টার অ্যাকটিভ কনটেন্ট ডিজাইন ও ডেভেলপ করা হয়েছে। এর সুবিধা সংশ্লিষ্ট সকলেই পাচ্ছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবার তাঁর দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করেছেন। এর ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি অভীষ্ঠ, একটি হলো ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে মাথাপিছু আয় হবে ১২ হাজার ৫০০ ডলারেরও বেশি। আর দ্বিতীয়টি হলো বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা। ২০৩১ বাংলাদেশ হবে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ। মাথাপিছু আয় হবে তিন হাজার ২৭১ ডলার। বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দুই হাজার ৫০০ ডলারেরও বেশি। ২০৪১ সালে দেশের সম্ভাব্য জনসংখ্যা হবে ২১ কোটি তিন লাখ। বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনামতোই এগোচ্ছে। আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ৯৩তম অবস্থানে আছে। জনসংখ্যা বিবেচনায় আমাদের দেশের অবস্থান অষ্টম। এমন একটি জনবহুল দেশের জন্য যেকোনো পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন খুব সহজ নয়। তদুপরি আমাদের উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো প্রাকৃতিক সম্পদও নেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ঊষালগ্নে দাঁড়িয়ে আছে। করোনা অতিমারি মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেভাবে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে, ফিজিক্যাল ডিসটেন্স মেইনটেন করে ভার্চুয়ালি কানেক্টেড থেকে তাদের সেবা প্রদান নিশ্চিত করেছে, তেমনি করোনা-পরবর্তী সময়েও এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার আরো বিস্তৃত করা সম্ভব হবে।

২০০৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করেছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থ ও পেশিশক্তির বদলে মেধা ও জ্ঞানের শক্তির প্রাধান্য লাভ করবে। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা থেকে পর্যায়ক্রমে দেশকে সৃজনশীল ও মেধাভিত্তিক শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে। তাই তরুণ সমাজকে টার্গেট করে তথ্য-প্রযুক্তি খাতকে গুরুত্ব দিয়ে এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, তথ্য-প্রযুক্তিবিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তরুণ সমাজকে চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ দিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা ও আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ জনাব সজীব ওয়াজেদের যথাযথ দিকনির্দেশনায় তথ্য-প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হচ্ছে।

সরকার অনুমোদিত স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি দেশে দ্রুত উদ্ভাবন, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি, প্রযুক্তিগত দক্ষতার বিকাশ এবং সম্ভাবনাময়ী ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগে বিনিয়োগ মাধ্যমে টেকসই ইকোসিস্টেম তৈরিতে সহায়তা করেছে। স্টার্টআপদের মাধ্যমে করোনা মহামারিকালের নানা রকম চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে ১৫ লক্ষেরও বেশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের

সৃষ্টি হয়েছে। ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে স্টার্টআপ বাংলাদেশ উদ্বোধন করে 'শতবর্ষের শত আশা' ক্যাম্পেইন, যার মাধ্যমে ৫০টি স্টার্টআপ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা হবে সর্বমোট ১০০ কোটি টাকা। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম সাতটি বিনিয়োগ গ্রহণকারী স্টার্টআপ হলো পাঠাও লিমিটেড, সেবা প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড, চালডাল ডটকম, ইন্টেলিজেন্স মেশিন, ঢাকা কাস্ট, এড্রু হাইভ এবং মনের বন্ধু। এ সাতটি স্টার্টআপ কোম্পানিতে প্রাথমিকভাবে ১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কোম্পানিগুলো তাদের পণ্য বা সেবার মানোন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার করেছে এবং করছে। এ সকল কোম্পানি নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, পণ্য সরবারহ, টেকনোলজি এবং শারীরিক ও মানসিক সেবার উন্নয়নে অবদান রাখছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে সারা দেশে ৩৯টি হাইটেক পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে পাঁচটি পার্কের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। আরো তিনটি পার্কের নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ হবে। এ পর্যন্ত হাইটেক পার্কসমূহে ১১৬টি স্থানীয় স্টার্টআপ কোম্পানিকে বিনা মূল্যে স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ সকল কোম্পানি ইতিমধ্যে ৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি এ খাতে বিনিয়োগ করেছে। এ খাতে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করতে হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে ৫৫ হাজার এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এক লাখ তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। ইতিমধ্যে এ খাতের জন্য কমবেশি ২৯ হাজার প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করা হয়েছে। ৪০ হাজারেরও বেশি তরুণ-তরুণীকে প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের সমন্বিত উপার্জন ৩.১ মিলিয়ন ডলারের ওবেশি।

২০৪১ দেশ হবে উন্নত বাংলাদেশ। এ জন্য অনুকরণ নয়, উদ্ভাবনের মাধ্যমে দারিদ্র্যশূন্য, মেধাভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ বলেছেন, 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ, এটা কোনো স্বপ্ন নয়, বাংলাদেশের সেই সক্ষমতা আছে।' আর আমাদের সবাইকে সেই সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে হবে।

লেখক : উদ্যোক্তা ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ।

বঙ্গবন্ধু এক সম্মোহনী নেতা

পাশা মোস্তফা কামাল

নিজের ব্যক্তিত্ব, আবেগ ও যুক্তি দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারার ক্ষমতা সবার থাকে না। যাঁদের থাকে তাঁরা অনন্য, তাঁরাই সমাজের কাছে হয়ে ওঠেন অনুসরণীয়। সেই ব্যক্তিত্ব এবং আবেগের উপজীব্য যদি হয় সাধারণ মানুষের কল্যাণ, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করা, আর একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও কর্মকৌশল–তাহলে সেই মানুষ হয়ে ওঠেন অবিসংবাদিত ও অপ্রতিরোধ্য নেতা। নেতৃত্বের যে কয়েকটি গুণ একজন নেতাকে সম্মোহনী শক্তি প্রদান করে তার সবই ছিল বঙ্গবন্ধুর মানস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জাতীয় অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পর্কে অসাধারণ কিছু কথা বলেছেন। নেতৃত্বের উৎকৃষ্ট তার বৈশিষ্ট্যগুলো কী, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শরণাপন্ন হচ্ছি। কবিগুরু ১৯২১ সালে স্কটল্যান্ডের স্থপতি স্যার প্যাট্রিক গিডার্সকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি কোনো এক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'I do not have faith in any institution, but in the people who think properly, feel lovely and act rightly.' 'কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপর আমার আস্থাতেই, তবে আস্থা আছে সেই মানুষগুলোর ওপরে যাদের চিন্তা যথার্থ, অনুভব মহান এবং কর্ম সঠিক'। এই বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু শুধু একজন আদর্শ নেতাই ছিলেন না, তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। কারণ তাঁর চিন্তা ছিল যথার্থ, অনুভব ছিল মহান, আর কাজ ছিল সঠিক।

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হতে থাকে। এ কথা আজ সবাই জানে, তিনি তাঁর স্কুলজীবনেই স্কুলের সমস্যা নিয়ে অবিভক্ত বাংলার শ্রমমন্ত্রী (পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর উপস্থাপন ভঙ্গি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতো নেতাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। তা না হলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব শেখ মুজিবকে কলকাতায় গেলে দেখা করার কথা বলতেন না। কতটুকুই বা তাঁর বয়স তখন। কথায় বলে সকালের উদীয়মান সূর্যই বলে দেয় দিনটি কেমন হবে। বালক বঙ্গবন্ধুর ভেতর সেই তেজোদীপ্ত তা ছিল আলোর বিচ্ছুরণের মতো।

কলেজজীবনেও আমরা দেখতে পাই তাঁর ভেতরের নেতৃত্বগুণ ও সম্মোহনী শক্তি ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠেছে। ১৯৪১ সালে বঙ্গবন্ধু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। ম্যাট্রিক পাস করে তিনি কলকাতায় গিয়ে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। কলেজে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেই সময় ইসলামিয়া কলেজ ছিল বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। তিনি সেখানে এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে তাঁর মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কলেজে কেউ ইলেকশন করত না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ইলেকশন হতো। তিনি ছাত্রনেতাদের নিয়ে আলোচনা করে যাদের ঠিক করে দিতেন তারাই নমিনেশন দাখিল করত। কারণ সবাই জানত তাঁর মতের বিরুদ্ধে কারো জেতার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ সাধারণ ছাত্ররা ছিল শেখ মুজিবের অন্ধভক্ত। 'মুজিব ভাই' যা বলবেন তাতেই তাদের সমর্থন থাকবে, এ রকম একটা ব্যাপার ছিল।

১৯২০ সালে টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ১৯৭১ সালে এসে পাকিস্তানিদের জন্য তৈরি করে ছিলেন দাবানল। যে দাবানলে পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের ক্ষমতার তক্তপোশ। মাঝখানের সময়গুলো খুব সহজ-সরল কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না । অনেক চড়াই-উতরাই পার হতে হয়েছে তাঁকে এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে। কতখানি ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা আর নেতৃত্বের সঠিকতা থাকলে সেটা সম্ভব, ইতিহাস তার সাক্ষী হয়ে আছে।

সহকর্মী ও সহপাঠীদের জন্য ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। ১৯৩৮ সালে ছাত্রাবস্থায় প্রথম কারাবরণ করেন। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর সহাপাঠী আবদুল মালেককে হিন্দু মহাসভার লোকজন ধরে নিয়ে গেলে বঙ্গবন্ধু তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে যান। তৈরি হয় হাঙ্গামা। মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে জেলহাজতে যান। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল। কোথাও কোনো অন্যায় দেখলে সবার আগে তিনি প্রতিবাদ করতেন। সারা জীবন তা-ই করেছেন। মানুষকে অসম্ভব ভালোবাসতেন বঙ্গবন্ধু। সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে তিনি বলেছিলেন তাঁর যোগ্যতা হচ্ছে তিনি 'মানুষকে ভালোবাসেন', তাঁর অযোগ্যতা হচ্ছে তিনি 'মানুষকে বেশি ভালোবাসেন'। কতখানি আবেগপ্রবণ মানুষ হলে মানুষের প্রতি এমন ভালোবাসা থাকতে পারে তা শুধু অনুধাবন করার বিষয়।

বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন আপাদমস্তক বাঙালি। অসীম সাহসী আর দূরদর্শী। বলেছিলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও আমি বলব আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান–একবার মরে দুইবার মরে না।' পাকিস্তানে বন্দি থাকা অবস্থায় কারাগারে তাঁর কক্ষের কাছে কবর খোঁড়া দেখেও বিচলিত হননি এই বীর বাঙালি মহাপুরুষ। শুধু বলেছিলেন আমি মারা গেলে আমার লাশটা আমার দেশের

মাটিতে পাঠিয়ে দিও। তাঁর সাহস আর মনোবল দেখে উল্টো ভড়কে গিয়েছিল পাকিস্তানি জান্তারা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের প্রতিটি বাঁকে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পরপরই তিনি মনস্থির করতে সক্ষম হয়েছিলেন পাকিস্তানের সাথে আমাদের বনিবনা হবে না। তাঁর চিন্তার প্রখরতা এত বেশি ছিল যে তিনি তখন থেকেই স্বাধীনতার কথা ভেবে বসে আছেন। তিনি তখনো ঢাকায় আসেননি, কলকাতার বেকার হোস্টেলে অবস্থান করছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে বেকার হোস্টেলে একটি সভা করছিলেন। সেই সভায় তিনি বলেছিলেন, এই পাকিস্তান বাঙালির অধিকার রক্ষা করবে না। তাঁর মুখে উচ্চারিত চিরাচরিত কথ্য বাংলায় বললেন, 'মাউরাদের সাথে আমাদের হবে না।' কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার আগেই কলকাতার সাপ্তাহিক মিল্লাত পত্রিকার অফিসে এক আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে হবে বাংলা। কারণ বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা।

বঙ্গবন্ধু একটি অভীষ্ট লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এগোচ্ছিলেন ১৯৪৭ সাল থেকেই। সেই লক্ষ্য ছিল বাঙালির স্বাধীনতা, একটি স্বাধীন আবাসভূমি। তিনি তাঁর লক্ষ্য বাস্তবায়নে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন। ১৯৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলনে একটি পরিষ্কার গাইডলাইন ছিল স্বাধীনতার। পাকিস্তানি শাসকরা বুঝতে পেরেছিল তাঁর লক্ষ্য। তারা ষড়যন্ত্র তৈরি করল। সেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দিলেন বঙ্গবন্ধু। উত্তাল গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে বের হয়ে এলেন কারাগার থেকে। ১৯৬৯-এর ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনি বলেছিলেন আজ থেকে এই দেশের নাম হবে 'বাংলাদেশ'। '৪৭ থেকে '৬৯। এই সময়কালে তাঁর সম্মোহনী নেতৃত্বগুণে বাংলার মানুষের মনে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

মাত্র আঠারো মিনিটের ভাষণ। উত্তাল মার্চ একাত্তর। কী মন্ত্র ছিল সেই ভাষণে! মন্ত্রমুগ্ধের মতো সম্মোহিত হয়ে গেল পুরো জাতি। এক আঙুলের ইশারায় উঠে এলো সহস্র বছরের ইতিহাস। শৃঙ্খল ভাঙার দৃঢ় প্রত্যয়। ভাষণ দেওয়ার এই ভঙ্গি, কথা বলার এই কাব্যিক উপস্থাপনা বিশ্বের আর কোনো নেতার মধ্যে আমি দেখিনি। প্রবল ব্যক্তিত্ব চেহারার সাথে বক্তব্যের প্রতিটি স্বরপ্রক্ষে পণ যেন বাঘের মতো গর্জন করছিল। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ ছিল একেকটি কবিতার চরণ। তাই তো তিনি 'রাজনীতির' কবি। ছিল বৈষম্যের ইতিহাস, ছিল দিকনির্দেশনা। পুরো বাঙালি জাতি এক আঙুলের ইশারায় একতাবদ্ধ হয়ে গেল। বিশ্বের ইতিহাসে এমন নজির নেই। বঙ্গবন্ধু ভালোবাসতেন দেশকে, দেশের মানুষকে। কত প্রবল আত্মবিশ্বাস থাকলে বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন 'কী চাস তোরা'। তাঁর বিশ্বাসের মাত্রা এত

প্রবল ছিল যে তিনি কখনো ভাবতেই পারেননি যে কোনো বাঙালি তাঁকে হত্যা করার কথা চিন্তা করতে পারে। কিন্তু সেই কুলাঙ্গারগুলো যে পাকিস্তানের প্রেতাত্মা সেটা বুঝতে বুঝতে তিনি চলে গেলেন এই জগৎসংসার ছেড়ে। বাঙালির এই ক্ষতি আরো হাজার বছরেও পূরণ হবে না, হওয়ার নয়। বঙ্গবন্ধুর মতো সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন নেতা হাজার বছরেও একজন জন্মায় কি না, সন্দেহ আছে।

লেখক : ছড়াকার।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন

ইমদাদ ইসলাম

৭ মার্চ ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস। ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের সমবায়ীরা বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়বর্ধক ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সমবায় সমিতির সদস্যরা নিজেদের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী এবং বেকার জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অন্যতম সোপান হচ্ছে সমবায়। সমবায়ের এই মতাদর্শকে সামনে রেখে পৃথিবীর বহু দেশ নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রেখেছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্যমোচন, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পণ্যের ন্যায্যমূল্যপ্রাপ্তিসহ নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে।

দারিদ্র্যমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী একটি পরীক্ষিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতিগুলো দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, দারিদ্র্যমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও অর্থনৈতিক সংস্থা সমবায়কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তবে একই বা অভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমবেতভাবে কাজ করার নামই হলো সমবায়। সমবায়ের ইতিহাস অনেক পুরনো অনেকে মনে করেন সমবায়ের সূত্রপাত হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে। ভারতবর্ষে মৌর্য আমলে সমবায় সংগঠনগুলোর উদ্ভব হয়েছিল। তখন সেগুলো নগরজীবনে পণ্য উৎপাদনে জনমত তৈরির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। তবে কৃষিঋণ সরবরাহের লক্ষ্যে ১৯০৪ সালে ইংরেজ আমলে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি অ্যাক্টের মাধ্যমে আমাদের এ উপমহাদেশে সমবায় শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস অনেক পুরনো। স্যার পিসি রায় খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়লী গ্রামের দরিদ্র মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করার উদ্দেশ্যে সমবায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্রে সমবায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে দেশে প্রায় এক লাখ ৮০ হাজার নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে, যার সদস্যসংখ্যা এক কোটি সাড়ে ১২ লাখেরও বেশি। এ সকল নিবন্ধিত সমবায়

সমিতির ভৌত সম্পদ, বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ, মজুদ তহবিল ইত্যাদির পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার ৩০০ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ লাখ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি সামাজিক আন্দোলন, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। এর মাধ্যমে দারিদ্র্যমোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিবেশ রক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। সমবায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। আমাদের দেশের সমবায় সমিতিগুলো সাধারণত সাতটি নীতিমালা মেনে চলে। এগুলো হলো স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবাধ সদস্যপদ, সদস্যদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং তথ্য আন্ত সমবায় সহযোগিতা এবং সামাজিক অঙ্গীকার। সমবায় প্রতিষ্ঠা করা সহজ, কিন্তু তার সফলতা নির্ভর করে সাতটি শর্তের ওপর। এগুলো হলো ঐক্যবদ্ধতা, বিশ্বস্ততা, স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা, গণতন্ত্র, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের ৩০০ কোটিরও বেশি মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করে।

ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ। তিনি ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে–এ হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায় পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে।' সমবায়ব্যবস্থার প্রতি বঙ্গবন্ধুর দুর্বলতা ছিল। তাই সমাজে সুবিধাবঞ্চিত গরিব কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ধনী জোতদার মহাজনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য সংবিধান ১৩ ও ১৪ ধারায় সুরক্ষা দিয়েছিলেন। ১৩ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে রাষ্ট্রীয়, সমবায় ও ব্যক্তি খাতের মালিকানায় থাকবে উৎপাদনের উপায়সমূহ। আর ১৪ ধারায় বলা হয়েছে কৃষক, শ্রমিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। তবে একই সঙ্গে ব্যক্তি খাত ও সমবায়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দেশের সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে অসামান্য অবদানের জন্য ২০১৯ সালের জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য ১০টি ক্যাটাগরিতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৯টি সমবায় সমিতি ও একজন সমবায়ীকে নির্বাচন করা হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়নে আমিভিটা সমবায় মৎস্য ও কৃষি খামার সমিতি লি. খুলনা, সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিটে তুমিলিয়া খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি. ঢাকা, দুগ্ধ সমবায়ে দিবস চন্দ্র ঘোষ খুলনা, মহিলা সমবায়ে সততা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. ঢাকা, বহুমুখী সমবায়ে নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. রাজশাহী, মৎস্য সমবায়ে চাঁদপুর মৎস্য বণিক

সমবায় সমিতি লি. চাঁদপুর, মুক্তিযোদ্ধা সমবায়ে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. ঢাকা, বিত্তহীন, ভূমিহীন সমবায়ে পূর্ববস্তি ভূমিহীন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. ঢাকা, যুব, বিশেষ শ্রেণি, তাঁতিসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়ে, দ্য মেট্রোপলিটন খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি. ঢাকা, কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিবহন শ্রমিক-কর্মচারী সমবায়ে বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. ঢাকা।

সরকারের অর্থায়নে ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ–আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (তৃতীয় সংশোধিত), সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-তৃতীয় পর্যায়, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্যমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জের সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (সংশোধিত) প্রকল্প, অংশীদারিমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-তৃতীয় পর্যায় (পিআরডিপি-৩) (সংশোধিত) (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২২), উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্যের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (দ্বিতীয় পর্যায়) (প্রথম সংশোধিত), গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প, পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যে শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির (জানুয়ারি, ২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২৩), বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ)। রংপুর স্থাপন প্রকল্প, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবনবিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত), পানিসাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প, জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প, বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকার বসবাসরত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, সৌরশক্তি নির্ভর সেচপদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প, কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প, উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরি সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ, প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্যমোচন, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত চার এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প, আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প, সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ী ঘাটে গুঁড়া দুগ্ধ কারখানা প্রকল্প, চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প, বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চলে গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন, চারণভূমি সৃজনও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার

নিশ্চিতকরণে দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ব্যয় হবে এক লাখ সাত হাজার কোটি টাকাও বেশি।

দেশ স্বাধীনের পূর্ববর্তী বছর ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ১৩৮ ইউএস ডলার। ১৯৯০ সালে ২৯৭ ডলার, ২০১৭ সালে ১,৬১০ ডলার, ২০২০ সালে ২,০৬৪ ডলার। মূলত সমবায়ের মাধ্যমে আয়-বৈষম্য দূর করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। দেশের কৃষি, মৎস্য চাষ, পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, পরিবহন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, আবাসন, পুঁজি গঠন, নারীর ক্ষমতায়ন ও পল্লী উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। অন্য যেকোনো দেশের মতো উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো জনগোষ্ঠীর সকল শ্রেণির নাগরিকের অন্তর্ভুক্তি, অর্থাৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল থেকে কেউ যেন বাদ না পড়ে। বাংলাদেশ ২০১৮ সালের ১৬ মার্চ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বহুমাত্রিক উন্নয়নের ধারা সূচিত হয়েছে বাংলাদেশে। ইতিমধ্যে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা আদায় করছে।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও আমাদের প্রস্তুতি

জাহেরুল ইসলাম

ময়মনসিংহের ভালুকায় এনভয় গ্রুপের টেক্সটাইল কারখানায় ৪২০টি রোবট কাজ করছে। রোবট ব্যবহারের ফলে কারখানাটির উৎপাদন আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কারখানাটিতে টেক্সটাইলে উৎপাদন শুরু হয় ২০০৮ সাল থেকে। এখানে সাধারণ শ্রমিকরাই কাজ করতো। বস্ত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মাঝেমধ্যেই লাইনের সুতা ছিড়ে যায়। শ্রমিকদের নিজ হাতে সুতায় জোড়া লাগাতে অনেক সময় লেগে যায়। এতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কর্তৃপক্ষ ২০১৯ সালে এ সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ শ্রমিকের জায়গায় রোবট ব্যবহার শুরু করেন। রোবট চোখের পলকেই ছিড়ে যাওয়া সুতা জোড়া লাগিয়ে দেয়। দিনশেষে কর্তৃপক্ষ তাদের কাঙ্ক্ষিতউৎপাদন পাচ্ছে। এ কারখানাটি বিশ্বের ইউএসজিবি লিড সনদপ্রাপ্ত প্রথম বস্ত্র কারখানা। রোবট নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৪টি কর্নার রয়েছে। কারখানাটিতে প্রতিদিন ৫ শত টন ডেনিম সুতা উৎপাদন হয়। রোবটগুলো জার্মানি ও সুইজারল্যান্ড থেকে আমদানি করা হয়েছে। এগুলোর প্রতিটির দাম গড়ে ৬ লাখ ইউরো। সাধারণ মেশিনারিজের তুলনায় রোবট ব্যবহারে আনুমানিক চারগুণ বেশি বিনিয়োগ করতে হয়। তবে একবার বিনিয়োগের পর নতুন করে আর বিনিয়োগের তেমন প্রয়োজন হয় না। ১০ জন শ্রমিকের কাজ একটা রোবট করতে পারে। ফলে রোবট ব্যবহার তুলনামূলক অনেক সাশ্রয়ী। সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের এ কারখানাটিতে শ্রমিক সংখ্যা মাত্র এক হাজার। আমাদের দেশে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। প্রযুক্তি পরিচালনায় দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমিকের কাজ রোবট দিয়ে করালে উৎপাদনে সময় ও অর্থের সাশ্রয়ের পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ভালো হয়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আমাদের দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। ইতিমধ্যেই আমরা সেই পথেই হাটতে শুরু করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ বলেছেন 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ এটা কোনো স্বপ্ন নয়, বাংলাদেশের সেই সক্ষমতা আছে।" এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানই এলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।

মানুষের কাজ করছে রোবটে। বিকাশ, নগদে মাধ্যমে বদলে গেছে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্হা। পাঠাও বা উবারের নিজস্ব কোনো গাড়ি নেই, অথচ যাত্রী পরিবহণের

প্রচলিত সকল ধারণা তারা পাল্টে দিয়েছে। আলিবাবার নিজস্ব কোনো পণ্য নেই, অথচ এমন কোনো পণ্য নেই যা তারা বিক্রি করে না। ফেসবুকের নিজস্ব কোনো কন্টেন্ট নেই, তবুও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে তাদের তুলনা নেই, পুঁজি বাজারে তাদের অবস্থান অনেক উপরে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে 'কৃষকের জানালা' অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকদের সেবা দিচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয় নামজারির প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে 'ই-নামজারি' পদ্ধতি চালু করে জনগণকে সেবা দিচ্ছে। জনগণ ঘরে বসেই ঝামেলামুক্তভাবে দ্রুত জমির নামজারির সুযোগ পাচ্ছে। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করেছে। এসিআই 'রূপালি' প্রযুক্তির মাধ্যমে 'প্যাটার্ন অ্যানালাইসিস' ও 'আইওটি' ব্যবহার করে মৎস্যচাষিদের দিচ্ছে অটোমাইজড পরামর্শ সেবা।' ফসলি' নামে ডিজিটাল কৃষি সেবাও দিচ্ছে এসিআই।

প্রথম শিল্পবিপ্লব হয় ১৭৮৪ সালে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিল গতিকে। যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু আধুনিক শিল্পায়নের দিকে, বাড়ে কয়লা ও ইস্পাতের ব্যবহার। মূলত পানি আর বাষ্পের ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় এ বিপ্লবের মাধ্যমে। এর একশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ১৮৭০ সালে হয় দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব। বৈদ্যুতিক বাতি মানুষকে দেয় এক আলোকিত বিশ্ব।বিদুৎ ব্যবহার করে গণ-উৎপাদনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে বিশ্ববাসীর দেখলো তৃতীয় শিল্পবিপ্লব। ইন্টারনেট বিশ্বকে এনে দিল হাতের মুঠোয়। কম্পিউটারের ব্যবহার হলো শুরু। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের ওপর ভর করে এখন বিশ্ববাসীর সামনে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পদধ্বনি।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ধারণাটি ২০১৩ সালের ১ এপ্রিল জার্মানিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। এরও আগে ২০১১ সালে এটি প্রথম আলোচনায় আসে। এরপর থেকে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে মানুষের জীবনে কি প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে মানুষের জীবনমান আগের তুলনায় অনেক বাড়বে,পণ্য সরবরাহ প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে আনবে ব্যাপক পরিবর্তন। অন্যদল মনে করেন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে মানুষের কাজ রোবট দিয়ে করানো হবে,এতে বেকারত্ব সমস্যা দেখা দেবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ৬০ শতাংশ, আসবাবপত্র শিল্পের ৫৫ শতাংশ, প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য শিল্পের ৪০ শতাংশ, চামড়া ও জুতা শিল্পের ৩৫ শতাংশ এবং সেবা শিল্পের ২০ শতাংশ লোক কর্মহীন হয়ে পড়বে মর্মে এক জরিপে বলা হয়েছে। বিশ্বে ২০৩০ সালের মধ্যে ৮০ কোটি লোক বেকার হয়ে যাবে। অন্যদিকে ১ শত কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ভবিষ্যতে প্রচলিত অনেক চাকরি থাকবেনা, সেখানে সৃষ্টি হবে নতুন চাকরি। আর এজন্যই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় আইসিটিভিত্তিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সরকারের আইসিটি বিভাগ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে ১ হাজার ৬ শত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রান্তিক গ্রাহকের নিকট তিন হাজারেরও বেশি ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সারা দেশের এক হাজারেরও বেশি মেধাবী তরুণ ও তরুণীদের উদীয়মান প্রযুক্তি(Emerging Technology) অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি (AI), ইন্টারনেট অব থিংক (IoT), ব্লকচেইন, রোবটিক্স, বিগ ডাটা, মেডিক্যাল স্ক্রাইব,সাইবার সিকিউরিটি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে (Global Platform) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলা আইপিএ কনভার্টার ধ্বনি তৈরি করে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে ওয়েবএড্রেস Ipa.bangla.gov.bd I www.bangla.gov.bd) ভাষা প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রযুক্তির প্ল্যাটফর্ম। বাংলা ভাষায় তৈরি করা নতুন নতুন সেবা এখানে সংযুক্ত করা হচ্ছে, যা সহজেই পাওয়া যাবে। সবধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৫০ টি অডিয়ো ও ভিডিয়ো টিউটোরিয়াল তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য আন্তর্জাতিক ওয়েব কন্টেন্ট এক্সেসিবিলিটি গাইড লাইন অনুযায়ী বিশেষ অভিগম্য(Accessible) সফটওয়্যার ইমপোরিয়া উন্নয়ন করা হয়েছে। আইসিটি পেশাজীবীদের ব্র্যান্ড ইমেজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বাংলাদেশের উন্নয়নের অভিযাত্রায় ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা এখন শহর থেকে প্রান্তিক গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। বিশ্ব প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব দিতে তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশ। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এ সন্ধিক্ষণে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য একটি সময়োপযোগী কার্যকর পরিকল্পনা নিয়ে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যায়ে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ।

লেখক : ফ্রিল্যান্স রাইটার।

উন্নয়নের সূর্যোদয়

মাসুদুর রহমান

স্বাধীন বাংলাদেশে বীরের বেশে ফিরলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। দেশের মানুষের স্বপ্নপুরুষ, শত দুঃখ-কষ্টের মাঝেও তাঁর ফিরে আসা সবার মাঝে স্বস্তি ফিরে এলো। বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে দেখলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় সহযোগীরা মিলে দেশটিকে শ্মশানে পরিণত করেছে। ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে, অর্থাৎ দেশ স্বাধীনের মাত্র দুই দিন আগে নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বেছে বেছে হত্যা করেছে। দেশকে মেধাশূন্য করতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। দেশের অবকাঠামো নির্বিচারে ধ্বংস করা হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের বর্ণনা কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চারপাশে শুধু দুঃখ-বেদনা আর হতাশার সংবাদ।

বঙ্গবন্ধু কালবিলম্ব না করে লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজে নেমে পড়লেন। প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে ৬০টি দেশের স্বীকৃতি আদায় করে নিলেন। জাতিসংঘের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশের মধ্যে চারটির সমর্থন পেয়েছিলেন। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭২ সালের ২৬ জানুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। '৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য খুশির সংবাদ। এদিন যুক্তরাজ্য, তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও ইসরায়েল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তবে কৌশলগত কারণে ইসরায়েলের স্বীকৃতির বিষয়টি বাংলাদেশ চেপে যায়। ৮ ফেব্রুয়ারি জাপান এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স ও কানাডা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। আমেরিকা ৪ এপ্রিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তখন পর্যন্ত শুধু চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে সকল শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। শরণার্থীদের ওপর কোনো চাপ ছিল না, তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই নিজ দেশে ফিরেছিলেন। সে সময়ে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ভারতীয় সৈন্য শেষ পর্যন্ত এ দেশ থেকে ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে কি না। তাদের সেসব আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণ করে মার্চ মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের হাতে দুই লাখ নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার

হয়েছিল, এটা মোটামুটি একটা স্বীকৃত তথ্য। ড. ডেভিস পুরো বাংলাদেশ ঘুরে এ বিষয়ে ১৯৭৩ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসে (তৎকালীন সাপ্তাহিক সাময়িকী) একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, সেখানে তিনি তথ্য-উপাত্ত দিয়ে উল্লেখ করেন প্রায় চার লাখ মহিলা ও কন্যাশিশু ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সম্ভ্রমহারা এ সকল নারীকে বীরাঙ্গনা খেতাবে ভূষিত করেন। বঙ্গবন্ধু বীরাঙ্গনাদের নিজের মেয়ে হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তাদের পুনর্বাসনের জন্য নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে দূরদর্শী নেতাদের একজন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিদেশি সাহায্য নিয়ে দেশ গড়া যাবে না। তাই তিনি বলেছেন, 'ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না, বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে দেশ গড়া যাবে না। দেশের মধ্যেই পয়সা করতে হবে।' দেশ গড়ার যে পরিকল্পনা তাঁর ছিল, তা তিনি শুরু করেছিলেন, কিন্তু ঘাতকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ায় শেষ করতে পারলেন না। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সব কিছুই থমকে গেল। দেশ চলতে শুরু করল পেছনের দিকে।

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল শোষিত-বঞ্চিত বাঙালি জাতির জন্য একটি স্বাধীন দেশ, তাই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম, আজ স্বাধীনতা পেয়েছি। সোনার বাংলা দেখে আমি মরতে চাই।' বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ আর স্বপ্ন নয়। এ স্বপ্ন পূরণের জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীকে 'রূপকল্প-২০৪১' উপহার দিয়েছেন। এই রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ।

রূপকল্প-২০৪১-এর আলোকে প্রণীত দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০২১-২০৪১) প্রথম ধাপ বাস্তবায়িত হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এ সময়ে দেশের যোগাযোগ অবকাঠামোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বর্তমানে ২৬টি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ১২৮.৭৪১ কিলোমিটার মেট্রো রেল, যার ৬৭.৫৬৯ কিলোমিটার উড়াল এবং ৬১.১৭২ কিলোমিটার পাতালে হবে। এটির একটি অংশ এখন দৃশ্যমান। ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে মেট্রো রেলের কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। পর্যায়ক্রমে ২০৩০-এর মধ্যে সকল সুবিধা পাওয়া যাবে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আগামী জুনে জনগণের জন্য এটি উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ৩০ বছর মেয়াদি রেলের মহাপরিকল্পনা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় ৬ ধাপে ৫ লাখ ৫৩ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌপথের উন্নয়নে বন্দরগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির করা হচ্ছে। নতুন

বে-টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে। কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। নিয়মিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বন্দর চ্যানেলের গভীরতা উন্নীত করা হচ্ছে। বিশ্বমানের বিমান পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিমানবহরে পুরনো বিমান সরিয়ে নতুন উড়োজাহাজ যুক্ত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রুটসমূহ সম্প্রসারণ ও পুনঃপ্রবর্তনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল ভূমিহীন ও আশ্রয়হীন প্রান্তিক মানুষের আবাসন সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মুজিব শতবর্ষে প্রতিটি ভূমিহীন পরিবারকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২ শতাংশ খাসজমিসহ ৩৯৪ বর্গফুট আয়তনের মধ্যে দুই কক্ষবিশিষ্ট আবাসন। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পসহ এ পর্যন্ত দুই লাখেরও বেশি গৃহহীনদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে, তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।' বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে নিজের অবস্থান করে নিয়েছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। উন্নয়ের সূর্য উদিত হয়েছে পূর্ব দিগন্তে, যার আলোয় আলোকিত হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, বিশ্ববাসী দেখবে অপার বিস্ময়ের সাথে।

লেখক : ফ্রিল্যান্স রাইটার।

কবিতা

বিজয়ের গান

নির্মলেন্দু গুণ

আমার ছিল না মুক্ত মাতৃভূমি
শৃঙ্খলহীন স্বাধীন দেশ;
শতবর্ষের শত সাধনায়
পেয়েছি তোমায় বাংলাদেশ।

হে মা জননী, হৃদয়ের রানি,
চিরজীবী তুমি অনশ্বর;
তোমায় প্রণাম, তোমায় সালাম,
তোমায় জানাই জায়স্বর।
হে অনন্যা, তুলনাবিহীনা
তুমি চিরচেনা চিরনবীনা দেশ।

সার্থক জনম আমার,
ধন্য লক্ষ জীবন দান,
তোমার মুক্ত মুখের হাসিতে
তৃপ্ত হয়েছে আমার প্রাণ।

রূপ গৌরবে ফুল সৌরভে
তুমিই স্বর্গ, তুমি বেহেশত;
হে উর্বশী, রূপসী বাংলা
তোমার তুলনা তুমি অশেষ।

শিয়রে বাংলাদেশ

নির্মলেন্দু গুণ

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিলো,
তুই তখনও ছিলি আমার স্বপনে।
আমি পাঁজর খুলে বলেছিলাম তোকে,
আমার বুকে যা আছে তুই সব নে ॥

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিলো,
তুই তখনও ছিলি মায়ের ভ্রূণে।
আমি অস্ত্রজ্ঞানে আড়াল করে তোকে
তীর বানিয়ে রেখেছিলাম তূণে ॥

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিলো,
তুই তখনও ছিলি জন্ম-আশায়।
তোকেই তখন বড় করে দেখেছিলাম বলে
সঁপিনি মন নারীর ভালোবাসায় ॥

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিলো,
অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম হাতে।
যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম দূরপাহাড়ি বনে
যদিও সায় ছিলো না হত্যাতে ॥

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিলো,
টগবগে লাল রক্ত ছিলো বক্ষে।
তখন তোকে নরক থেকে মুক্ত করা ছাড়া
আর কী শ্রেয় ছিলো আমার পক্ষে?

আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিলো,
বিজয়-গর্ব ছিলো না তোর স্বরে।
আমি তোকে বিজয় দিয়ে বিজয়বতী করে
দিয়েছিলাম ষোলোই ডিসেম্বরে ॥

এখন যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো তোর,
আমি তখন তোকে রেখে পঞ্চাশে দেই দৌড়।
রজতে নয়, সুবর্ণতে এ-দৌড় হবে শেষ,
তখনও তুই থাকবি আমার শিয়রে বাংলাদেশ।

একুশের জন্য এই অশ্রু, একুশের জন্য এই কবিতা

মহাদেব সাহা

একুশের জন্য এই অশ্রু, একুশের জন্য এই কবিতা
সদ্য ফোটা সহস্র গোলাপ, বুকভরা
ভালোবাসা
একুশের জন্য এই ব্যথিত আকাশ, এই উত্তাল তেরোশত নদী
ভোরের শুভ্র শিশিরবিন্দু, বিষণ্ন
রমনার মাঠ
একুশের জন্য এই অক্ষরের উৎসব, এই শত শত নতুন পঙ্‌ক্তি
ফুলে ফুলে ভরা শহিদ মিনার;

একুশের জন্য সারা রাত এই শোক মিছিল, কণ্ঠে কণ্ঠে
শোকের গান
এত ফুল, এত অশ্রু, রাতজাগা পাখিদের নীরব ক্রোন্দন
হৃদয়ে হৃদয়ে এত ব্যাকুলতা;

একুশের জন্য এই মাতৃভাষা দিবস, পৃথিবীজোড়া
বাংলা;
এই গৌরব কাহিনি,
হাতে হাতে এই জয়পতাকা;

একুশের জন্য লক্ষ বুকে এই সাহসের কলধ্বনি,
পথে পথে মুক্তির মিছিল,
একুশের জন্য এই প্রাণভরা ভাষা, একুশের জন্য এই
বুকভরা আশা।

মুজিব আমার ভোরের পাখি, প্রথম ফোটা ফুল

মহাদেব সাহা

মুজিব আমার ভোরের পাখি, প্রথম ফোটা ফুল
উপচে পড়া ভর বর্ষার স্নিগ্ধ নদীকূল;
সাঁঝ আকাশে প্রথম ফুটে ওঠা তারা
বাংলাদেশের তেরোশত নদীর জলধারা;
মুজিব আমার বাংলা ভাষার সবচেয়ে প্রিয় গান
সব শিশুর প্রথম পাঠ, বাংলা অভিধান;

মুজিব এই গন্ধে ভরা মুগ্ধ চাঁপা বন
মুজিব আমার অগ্নিবীণা, শান্তিনিকেতন;
ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরি, দীপ্ত মার্চ মাস
মুজিব আমার স্বাধীনতার দীর্ঘ ইতিহাস;
মুজিব সব শহিদের মায়ের চোখের জল
বাংলা বারো মাসের যত প্রিয় ফুল ও ফল;

রাখালের উদাস বাঁশি, ভাটিয়ালি গানের শিহরণ
সবার বড় কাছের মানুষ, বড় আপনজন;
কালের খাতায় অমর নাম, মহকালের কবিতা
মুজিব আমার মহাকাব্য, মুজিব জাতির পিতা।

সোনায় মোড়া রুপায় মোড়া

মুহম্মদ নূরুল হুদা

সোনায় মোড়া রুপায় মোড়া
লাল-সবুজের সোনার দেশ,
সুবর্ণ জয়ন্তী তিথি, সুবর্ণ বীজ বোনার দেশ;
ভাষার দেশ আশার দেশ,
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ॥

তিরিশ লক্ষ বীর শহিদের রক্তদানে কিনেছি
অগণিত মা ও বোনের আত্মদানে জিনেছি
মুক্তিযুদ্ধে মুক্তদেশে প্রবৃদ্ধি বীজ বুনেছি;
বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষে সমৃদ্ধির সোনার দেশ;
সুবর্ণ জয়ন্তী তিথি, সুবর্ণ বীজ বোনার দেশ;
ভাষার দেশ আশার দেশ,
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ॥

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা মায়ের বাড়ি যাই
বেতবুনিয়ায় ডানায় ডানায় বিশ্বে উড়ে যাই।

উন্নয়নের রূপকল্পে উড়ালসেতু পেয়েছি
সাগরনদীর নৌকাদেশে প্রগতি পাল মেলেছি
সংস্কৃতি আর কৃষির দেশে প্রযুক্তি বীজ বুনেছি;
দেশরত্নের প্রণোদনার অপার সম্ভাবনার দেশ;
সুবর্ণ জয়ন্তী তিথি, সুবর্ণ বীজ বোনার দেশ;
ভাষার দেশ আশার দেশ,
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ॥

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে

মুহম্মদ নূরুল হুদা

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমিই ৭ই মার্চ, উনিশশ একাত্তর।
এই মরলোক যদিও আমার দৃশ্যমান আঁতুড়ঘর,
অনন্তকালের অনন্তলোকে আমি অনন্ত অমর।
আমার মানবসূত্র চিরজীবিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে বঙ্গবন্ধু বাঙালির জাতির জনক;
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে জাতিমুক্তির পাঠ নিয়ে
বিশ্বকে তিনি দিয়েছেন মানবমুক্তির সুষম সবক।
'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?'
মুক্ত পৃথিবীর মুক্ত মানুষ আজ অবাক তাকায়
জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকায়।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
৭ই মার্চের স্বাধীনতামঞ্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা,
বিশ্বব্যাপী জাতিরাষ্ট্রের শৃঙ্খলমুক্তির প্রমিত প্রণোদনা।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
৭ই মার্চের সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী সব মানুষের মুক্তির সংগ্রাম;
৭ই মার্চের সংগ্রাম সকল জাতিরাষ্ট্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
আমি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের বিবর্তনপ্রবণ নবায়ন;
কাল থেকে কালান্তরে আমি ত্রিকালজ্ঞের ত্রিবেণি-সঙ্গম;
আমি বিশ্বের তাবৎ প্রাণী ও প্রাণসত্তার প্রমূর্ততার প্রতীক:
আমি মহাকালের মহাঘড়ি; আমি বেজে চলেছি টিকটিক।

আমি বাংলার জয়, বাঙালির জয়; আমি চিরকাল শুভসময়।
মহাবিশ্বের মহামানবের মহাকালের জয়, আমি মানবসময়।

বিজয়ের জারি

মুহম্মদ নূরুল হুদা

বাংলা আমার মায়ের ভাষা, বাংলা মায়ের দেশ
বাংলা আমার বাউলা পিতার ব্যাকুল নিরুদ্দেশ।
এই দেশেরই পলিজলে হাজার নদীর ধারায়
মুক্ত দেশের মুক্ত মানুষ পালের নৌকায় যায়।
সেই নৌকার মোহন মাঝি জাতির জনক শেখ,
জাতিপুত্র জাতিকন্যা, দেখ্ রে সবাই দেখ্।

চূড়ান্ত ডাক সাতই মার্চে দিলেন মুজিবর,
বিজয় এলো একাত্তরের ষোলো ডিসেম্বর।
সেদিন থেকে বীর বাঙালির মুক্ত সকল ঘর
স্বাধীন দেশে সবাই স্বাধীন, কেউ কারো নয় পর।
অনাদিকাল সেই বিজয়ের চলেছে প্রস্তুতি,
অনন্তকাল সেই বিজয়ের বাড়বে শুধু দ্যুতি।

জন্মশতবর্ষে এসে চিরজন্মে লীন
স্বাধীন জাতির স্বাধীন পিতা, জাতি শঙ্কাহীন।
তর্জনী তাঁর ন্যায়ের দণ্ড, বীরের স্বাধীনতা;
মানুষ মাত্রে জন্ম-স্বাধীন, প্রাণের মর্মকথা।
ব্যক্তি, জাতি, জাতীয়তা, গণতন্ত্র, সাম্য,
সম্প্রীতি আর ন্যায়ের নীতি সংবিধানে কাম্য।
বঙ্গমাতা দিলেন তুলে স্নেহ-সুধা দুগ্ধ,
মানুষপাখির মনোডানায় উড়ছে মানুষ মুগ্ধ।
বছর যাবে যুগও যাবে যাবে কত শতক
থাকবে সুখে বঙ্গবাসী, জননী ও জনক।
মুক্ত বিশ্বে মুক্ত বাংলা, জয় বাংলার জয়
বাঙালি আজ বিশ্বমানুষ নিশঙ্ক-নির্ভয়

নিশঙ্ক-নির্ভয় নিশঙ্ক-নির্ভয় নিশঙ্ক-নির্ভয়।

স্বাধীনতার সূর্য ওঠে

মুহাম্মদ সামাদ

একাত্তরে রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে
গর্জে ওঠে বাংলাদেশ–
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
বীর বাঙালি শপথ করে
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে।

বটতলায়, বত্রিশে, পল্টনে, বাড়ির ছাদে,
কারখানাতে, ক্ষেতের আলে
লাঠির আগায় হাতে হাতে–
স্বাধীনতার নিশান ওড়ে।

পঁচিশে মার্চে কালরাতে
ঝাঁকে ঝাঁকে নামে কনভয়
ঘুমন্ত মানুষ কেঁপে ওঠে!
এ যেন খুনের নেশায়
যমদূতের হিংস্র কড়া নাড়া।
নবজাতকের আর্তনাদে
হায়, স্তব্ধ হয়ে যায় পাড়া!
লেলিহান শিখায় শহর বস্তি
ছাত্রাবাস যায় পুড়ে।

আহা, আমার সবুজ দেশে
হলোকাস্ট বা ভিয়েতনাম আজ
গণহত্যার উপমা হয়! তবু নেই ভয়–
কৃষক-শ্রমিক-জনতার সংগ্রামে
প্রতিরোধ জাগে–প্রতিরোধ দেশময়।

পাখির পাখায় হাওয়ায় হাওয়ায়
গাঁয়ে-গঞ্জে মাটিতে-পাহাড়ে
পদ্মা-মেঘনা-যমুনার তীরে
উথাল ঢেউয়ে ছাব্বিশে মার্চ

প্রথম প্রহরে সারা দেশে
শেখ মুজিবের ডাক আসে :
মুক্তিপাগল ভাইরে আমার
মুক্তিপাগল বোনরে আমার
এক হও জোট বাঁধো
কণ্ঠে তোলো জয় বাংলা
হাতে নাও যার যা আছে–
বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো
জয় বাংলা স্বাধীন করো।

সেই বসন্তে ঝরাপাতায়
রোদে-জলে দিনে-রাতে
অস্ত্র কাঁধে অস্ত্র হাতে
মুক্তিযুদ্ধ ছুটে আসে।

পথে-ঘাটে বন-বাদাড়ে
নদীর বুকে ঝড়-বাদলে
বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
বাংলা মায়ের রুদ্র মেয়ে
জীবন দিয়ে সম্ভ্রম দিয়ে
গুলি-বন্দুক-গ্রেনেড ছুড়ে
যুদ্ধ করে... যুদ্ধ করে...
বীর বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ।

যুদ্ধ শেষে মুক্ত দেশে
রক্তমাখা পুব আকাশে
আলোয় আলোয় স্বপ্ন ফোটে
ঘাসে গাছে ফুলে ফুলে
স্বাধীনতার সূর্য ওঠে
স্বাধীনতার সূর্য ওঠে॥

মার্চ

কামাল চৌধুরী

আকাশে-বাতাসে মার্চের বরাভয়
মার্চ এসে গেছে জনতার চিৎকারে
প্রতিবাদী দেশ, প্রতিবাদী জনগণ
মার্চ এসে গেছে বাংলার ঘরে ঘরে।

মার্চ এসে গেছে হাজারো নদীর স্রোতে
নৌকোজীবন, লৌকিক সাম্পানে
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদীর তীরে
মার্চ এসে গেছে মহামুক্তির গানে।

আমার ঠিকানা নদ-নদীদের দেশে
পিতৃপুরুষ বাঙালি মাছে ও ভাতে
তবুও আমার শ্যামল শরীর রাগী
মার্চ এসে গেছে শব্দিত পদাঘাতে।

মার্চ এসে গেছে প্রতিরোধী লাঠি হাতে
সবুজে ও লালে মানচিত্রের রোদে
দুহাতে নতুন প্রাণের পতাকা নিয়ে
মার্চ এসে গেছে কোটি মানুষের ক্রোধে।

মার্চ এসে গেছে রেসকোর্স মাঠে আজ
লক্ষ জনতা; ভয় কী বন্ধু জাগো
মুজিব নামের রাখাল বাজার ডাকে
স্বাধীন পতাকা উড়ছে আকাশে মাগো।

মার্চ এসে গেছে শেখ মুজিবের নামে
মার্চের ভাষা সাহসের তর্জনী
জনসমুদ্রে স্বাধীনতা স্বাধীনতা
আকাশে-বাতাসে জয় বাংলার ধ্বনি।

ওরা ভেবেছিল হত্যাই শেষ কথা
পাকি হানাদার গণহত্যায় মাতে
রুমি-নজরুল লাখো শহিদের খুনে
মার্চ এসে গেছে যুদ্ধ অস্ত্র হাতে।

এই মার্চ মানে মুক্তি ও স্বাধীনতা
এই মার্চ মানে বাঙালির জয়গান
স্বদেশ আমার, সাহসে ও সংগ্রামে
আমরা সবাই মার্চের সন্তান।

তোমার ছবিটা

কামাল চৌধুরী

তোমার ছবিটা সবার হৃদয়ে আছে
গভীরে তোমার ডাক শুনি দুর্বার
মহাসাগরের অবারিত ঢেউ এসে
আছড়ে পড়ছে স্মৃতিতে বারংবার।

তোমার ছবিটা বুকের ভেতরে রাখি
তোমার ছায়ায় পেয়েছি আমার দেশ
জীবিতকালের হিজলের উৎসবে
তোমার ছবিতে হাসছে বাংলাদেশ।

সেখানে যে তুমি জাদুকরী বাঁশিঅলা
তোমার কণ্ঠে অগ্নিবীণার সুর
তুমি ছিলে তাই বাংলার পথে পথে
পতাকার পাশে ফুটে আছে রোদ্দুর।

আমি শতফুলে জীবনের গান করি
ঘাসে ঘাসে রাখি মৃদু শিশিরের জল
হাজার বছর পার হয়ে এসে দেখি
দেশ পরে আছে সবুজের বল্কল।

বাংলা আমার শালিকের ঠোঁটে ভোর
ফি-বছর তুমি উড়ে আসা সুবাতাস
প্রকৃতির পাশে মুজিবের মুখখানি
চির অম্লান বাঙালির ইতিহাস।

আবার দেখা হবে

কামাল চৌধুরী

আবার দেখা হবে টুঙ্গিপাড়ায়
গিমাডাঙ্গা স্কুলে, ফুটবল মাঠে
মধুমতী, বাইগারের জলে, দুরন্ত বালকের স্মৃতির সকালে
প্রতিদিন সূর্যোদয়ে, প্রতিদিন আগত সন্ধ্যায়–

বাংলাদেশ, আমি নত হয়ে বসে থাকি পদতলে
স্বাধীনতা, আমি পতাকার নিচে অসমাপ্ত জীবনী পাঠক
তোমার সমাধিসৌধে অনন্ত প্রার্থনা হাতে রেখেছি গোলাপগুচ্ছ
এত লাল! রক্তাক্ত হাতে হাতে ভেসে যাচ্ছে পদ্মা মেঘনা যমুনায়–
অবগাহনের শেষে দেখা হবে শরীর শুকানো রোদে
যেখানে আমার দেশ সমাহিত মহিমায় খুঁজছে তোমাকে।

আবার দেখা হবে টুঙ্গিপাড়ায়
আশ্চর্য শব্দের গায়ে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা বিনম্র আকাশ
সেখানে প্রতিদিন তোমাকে লিখছে বাংলা কবিতা
মহাদেশ পাড়ি দিচ্ছে তোমার মুক্তির মন্ত্র, জাতিরাষ্ট্র, জাগরণ,
বাঙালির ভোর।

০২.
আবার দেখা হবে রেসকোর্স মাঠে
স্কুলপড়ুয়া বালকের রাগী বিকেলের রোদে
জনস্রোতে, লক্ষ লক্ষ মানুষের চিৎকারে, স্লোগানে
ইতিহাস বদলে দেওয়া তর্জনীর পাশে
অপরাহ্নের রক্তপলাশে
প্রতিটি প্রদীপ্ত উচ্চারণে
প্রতিটি মুক্তির শব্দে, স্বাধীনতায়।

আবার দেখা হবে রেসকোর্স মাঠে
যখন উত্থিত হাত আমাদের সাহসী যৌবন

যার যা আছে তাই নিয়ে যখন নিরস্ত্র মানুষ
দাঁড়িয়ে পড়েছে হত্যাকারীর মুখোমুখি
যখন মাঠের শপথ ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে
যখন ইতিহাসের পাতায় পাতায়
গর্জে উঠছে শিমুলের লাল
যখন বজ্রকণ্ঠে কথা বলছে চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইল
সাত কোটি জীবিত সন্তান;
কথা বলছে বাংলাদেশ
কথা বলছে শেখ মুজিব
কথা বলছে সার্বভৌম জাতির পতাকা।

আবার দেখা হবে টুঙ্গিপাড়ায়, দেখা হবে রেসকোর্স মাঠে।

পিতা ও পতাকা

আসাদ মান্নান

বিজয় পতাকা মানে
চিরন্তন মুজিব পতাকা
মুজিব পতাকা মানে বাঙালির মুক্তির নিশান,
যে নিশান জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে স্বপ্ন ছড়িয়েছে,
ছড়াল গৌরব বীজ খরাদগ্ধ মাটির ঔরসে।
নুহের কিস্তির মতো বাঁধভাঙা রক্তের বন্যায়
হাজার নদীর জল তার নামে নৌকা ভাসিয়েছে;
রক্তে ফোটে কৃষ্ণচূড়া জ্বলজ্বলে নক্ষত্র কুসুম,
বিজয়ী বীরের জাতি বুকে রাখে মুজিব পতাকা।

রবীন্দ্রনাথের গান মর্মে টানা সুরের ধারায়
যখন হৃদয়ে বাজে তখন আমার ইচ্ছে হয়
সূর্যটাকে বাতি করে জ্বেলে রাখি পিতার কবরে;
কে যেন অদৃশ্যে থেকে অবিরাম মন্ত্র দেয় কানে :
ওটা তো কবর নয়–বঙ্গনীড়–তোমার ঠিকানা;
ঘুমিয়ে পড়ার আগে সঙ্গে রেখো পিতা ও পতাকা।

২.
ঝড়ে ও ঝঞ্ঝায় দেখতে দেখতে এক দুই পঞ্চাশ বছর–
নাগিনীর বিষদন্ত বেজন্মার ঘাতক বুলেট
সব কিছু তুচ্ছ করে গৌরবের সৌরভ ছড়িয়ে
মৃতরাও জেগে ওঠে কলকলিয়ে জলের ভাষায়।
বিচিত্র পাখির ঝাঁক ডানা খুলে পরম উৎসবে
মেতে আছে সবুজে-শ্যামলে; হাওয়াকে জড়িয়ে গায়ে
নাবিক দাঁড়িয়ে আছে কী নির্ভীক সমুদ্রের কূলে!
অন্তরে অন্তরে ওড়ে রক্তমাখা মুজিব পতাকা।

বিজয়ের গানে আজ মুখরিত প্রাণের উদ্যান;
এ উদ্যানে চিরঞ্জীব জনকের বজ্র বাণী বাজে;
মৃত্যুকে উপেক্ষা করে তাঁর অলৌকিক দীপ্ত পায়ে
অগ্নিদগ্ধ জনপদে পিতা এসে যখন দাঁড়ান
হরিণীর আর্তনাদে থেমে যায় সিংহের গর্জন–
কে পারে থামাতে তাকে যার মুখে বিজয়ের গান!

তুমি জেগে আছো তাই

মিনার মনসুর

শিয়রে আমার তুমি জেগে আছো তাই
আমি হেঁটে যাই
আমি হেঁটে যাই
শিয়রে আমার তুমি জেগে আছো তাই।

পার হয়ে যাই দুর্গম গিরি কান্তার মরু
পার হয়ে যাই মেঘগর্জন গুরুগুরু।
পরোয়া করি না পরাশক্তির কোনো
দিকে দিকে সেই বজ্রকণ্ঠ মহাগর্জন শোনো।
পায়ে দলে যাই
পায়ে দলে যাই
শতবর্ষের অমারাত্রির নেকড়ের যত ফাঁদ
সখিনা বিবির জীর্ণ কুটিরে আজ নতজানু চাঁদ।

শিয়রে আমার তুমি জেগে আছো তাই
আমি হেঁটে যাই
পিছে পড়ে থাকে হাজার বছর–ধূলি, শুধু ধূলি
পিছে পড়ে থাকে কৃষ্ণবিবর–খুলি, শুধু খুলি!
পিছে পড়ে থাকে মৃত অজগর–গাঙ্গুরের খলজল
পিছে পড়ে থাকে মনসার ক্রোধ–ভাঙা শৃঙ্খল!

শিয়রে আমার তুমি জেগে আছো তাই
আমি হেঁটে যাই
পৃথিবীর পথে
চড়ি স্বপ্নের রথে
উড়াই পতাকা জয় বাংলার
করি বন্দনা মানবিকতার
অতলান্তিক কুর্নিশ করে–হিমালয় তার নত করে শির
তুমিই সূর্য, তুমিই শক্তি চির জাগ্রত বীর বাঙালির।

তুমিই তো বয়ে যাও, পিতা

মিনার মনসুর

‘বাংলার মাটি বাংলার নাড়ি আমি জানি।’–বঙ্গবন্ধু

কবন্ধ ঘাতক তার দুই লানতের হাতে ধরে আছে বেয়াড়া বন্দুক;
বেয়াড়া বন্দুক ধরে কালান্তরে ভেসে আছে কবন্ধ ঘাতক–

কচুরিপানার কণ্ঠলগ্ন ধূর্ত সুতানালি সাপের মতন।
সে কেবল খুঁজে ফেরে চাঁদ বণিকের চির অনত মস্তক।
ফুঁসে ওঠে গাঙুরের জল; ফুঁসে ওঠে গাঙুরের পোড়া জল।
ইতিহাস সাক্ষী তার–সাক্ষী তার বিনিদ্র বেহুলা।

‘আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ
আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।’–বঙ্গবন্ধু

এত জল কোথা থেকে আসে?
কোথা থেকে আসে এত জল?
গর্জে ওঠে বন্দুকের নল
গর্জে ওঠে বন্দুকের নল
বল্ ক্ষুদিরাম বল্ কোথা থেকে আসে এত জল?
গর্জে ওঠে বন্দুকের নল
লক্ষ্য তার শাশ্বত বাংলার অশেষ ঝরনাতলা।

গর্জমান বন্দুকের মুখে বুক পেতে দেয় বঙ্গোপসাগর
বুক পেতে দেয় তেরশত নদ-নদী
বুক পেতে দেয় বীর ব্যাঘ্রমাতা সুন্দরীর বন
বুক পেতে দেয় জালালাবাদের অজেয় পাহাড়
বুক পেতে দেয় পাহাড়পুরের ওই বৌদ্ধবিহার

বুক পেতে দেয় ষাটগম্বুজের মসজিদ
বুক পেতে দেয় আদিনাথের মন্দির।

'আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে; তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।' –বঙ্গবন্ধু

কবন্ধ ঘাতক কেবল বন্দুক চেনে–কেবলই বন্দুক! তার
লানতের দুই হাত আমৃত্যু ফাঁসির রজ্জু হয়ে ঝোলে মাথার ওপরে
আর বন্দুকের গায়ে সেঁটে থাকা তার বিকট অস্তিত্বখানি
গলিত তিমির মতো বিটকেলে গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে
বিটকেলে গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে
ভেসে থাকে লুপ্ত ইতিহাসের নালা ও নর্দমায়।

সতত হে কবি তুমি বয়ে যাও, তুমিই তো বয়ে যাও, পিতা
দুঃখিনী বাংলার দগ্ধ শিরায় শিরায়।

৭ই মার্চ

তারিক সুজাত

১.

একটি কণ্ঠে
হাজার বছর জাগে
সাত কোটি প্রাণে
অজেয় আলোর রেখা
খুলে দিল পথ
মুক্তি ও সংগ্রামের
একটি কণ্ঠে
শিকল ভাঙার গান
বোবা ইতিহাসে
অযুত আঘাতে
শোণিত ওঙ্কার–
'রক্ত যখন দিয়েছি
রক্ত আরো দেবো'
একটি কণ্ঠে
লাঙলের ফলা
পলিমাটির ঘ্রাণ
কাননে কুসুম
দুঃখিনী বর্ণমালা
মসলিন ধোয়া
নরম আঙুলে
রক্তজবার ডাক
সেই থেকে আমি
শিখেছি মন্ত্র–
'দাবায়ে রাখতে
পারবা না'

২.

কণ্ঠে তোমার
কবেকার কলরব
শান্ত দুপুরে
মুক্তির হালখাতা!
এসেছিলে যেই পথে
সে পথে ফিরব আমি
রোদের রুমাল নেড়ে
সেই মার্চে ফিরি
যেখানে আমার দেশ
শোণিত শপথে আঁকে
গাঢ় সবুজের বুকে
রক্তবর্ণ তিল!

লক্ষ কণ্ঠ
তোমার কণ্ঠে জাগে
হাজার বছর ফেরে
চর্যাপদের পথে
কবির কণ্ঠে
জয় বাংলার ধ্বনি
জন্ম নিচ্ছি
উড্ডীন পতাকায়
৭ই মার্চ তুমি
পিতার আঙুল-ছোঁয়া
অমেয় আকাশ
৭ই মার্চ তুমি
আমার জন্মতিথি
আমি বাঙালি,
আমি বাংলাদেশ!

ছোট্ট রাসেল সোনা–তার কথা ভুলব না

আসলাম সানী

ভোরের আকাশ তাকে মনে রেখো
সূর্য তুমি রোদের পদ্য লেখো,
মেঘের লয়ে ছড়ায় ছন্দ তোলো
গাছে গাছে পাতার কাছে তারই কথা বোলো,
বাংলাদেশের হৃদয়শিশু ছোট্ট রাসেল সোনা
তার কষ্টের করুণ কথা কক্ষনো ভুলব না।

পাখির গানে-হাওয়ার তানে তারই কথা শুনি
গল্পে-কাব্যে-চিত্রকলায় ব্যথারই সুর বুনি,
বনে-বনে, ফুলে-ফলে ঘাসফড়িংয়ের খেলা
প্রজাপতি তারে খোঁজে সকাল-সন্ধ্যেবেলা
শেখ হাসিনার প্রিয় ভাইটি কোথায় রাসেল সোনা?
বাংলাদেশের শিশু আমরা তার কথা ভুলব না।

নদীর ঢেউও আছড়ে পড়ে ভীষণ আর্তনাদে
তারই শোকে আকাশ-বাতাস-সাগর-পাহাড় কাঁদে
ইতিহাসের ললাটজুড়ে রক্তে ছবি আঁকে
অমরত্বে বাংলাদেশে রাসেলও যে থাকে,
জাতির পিতার বুকেরই ধন ছোট্ট রাসেল সোনা
মহাকালের শিশু আমরা তার কথা ভুলব না।

শুভ জন্মদিন আজ সতেরোই মার্চ

আসলাম সানী

এখানে এই ব-দ্বীপে
এসেছিলেন কত প্রাণ
তেরোশত নদী
বহে নিরবধি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে গাহে গান,
মহুয়া-মলুয়া-বেহুলার কথা
ময়মনসিংহ গীতিকায়
সুয়োরানী-দুয়োরানী
আলালের ঘরের দুলাল
জন্মায় এ বাংলায়,
দোয়েল-কোয়েল-মাছরাঙা-ঘুঘু
সুরে সুরে গেয়ে যায়–

পুতুলনাচের ইতিকথা আর
ঠাকুর মা'র ঝুলি
পদ্মা নদীর মাঝির ডাকেই
হাতে বৈঠা তুলি–

খনা আর চন্দ্রাবতী
চাঁদ-সূর্যের মহৎ জ্যোতি
মহান বাঙালিকাল
বাংলাকে করে উত্তাল–
সতেরোই মার্চ উনিশ'শ বিশ সাল
টুঙ্গিপাড়ার জ্যোর্তিময় এক
গড়ে ইতিহাস কাল
স্বাধিকার আর স্বাধীনতার
স্বপ্নময় সকাল,

একাত্তরের সাতই মার্চে
দিলেন মুক্তির ডাক
শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ
পৃথিবী অবাক,

হিমালয় থেকে সুন্দরবন
তিনিই তোলেন ঝড়
সৃষ্টিতে অমর
গোপালগঞ্জের ভূমিপুত্র
মহান মুজিবর
লাল-সবুজের পতাকাতে
সুন্দর-ভাস্বর
ভাষার আশার বাহান্ন আর
শান্তির ঈশ্বর ।।
সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা
এই বাংলাদেশ-চরাচর,

সত্যের উত্থান
মানব জয়গান
দেবশিশু এক–পুন্য খোকা
কাব্য অফুরান,

তাঁর সাথে মাঝি ছোটে
শুভ নৌকায়
মাঠের চাষিরাও ধান কাটে গায়
শিশু ছোটে-বুড়ো ছোটে
নর-নারী জেগে ওঠে
শ্রীচৈতন্যের আলোক মালায়
বারো আউলিয়ারই মুখ প্রার্থনায়
মসজিদ-মন্দির জানায় যে চার্চ
শুভ জন্মদিন আজ সতেরোই মার্চ।

আলোকচিত্রে স্বপ্নের সোনার বাংলা

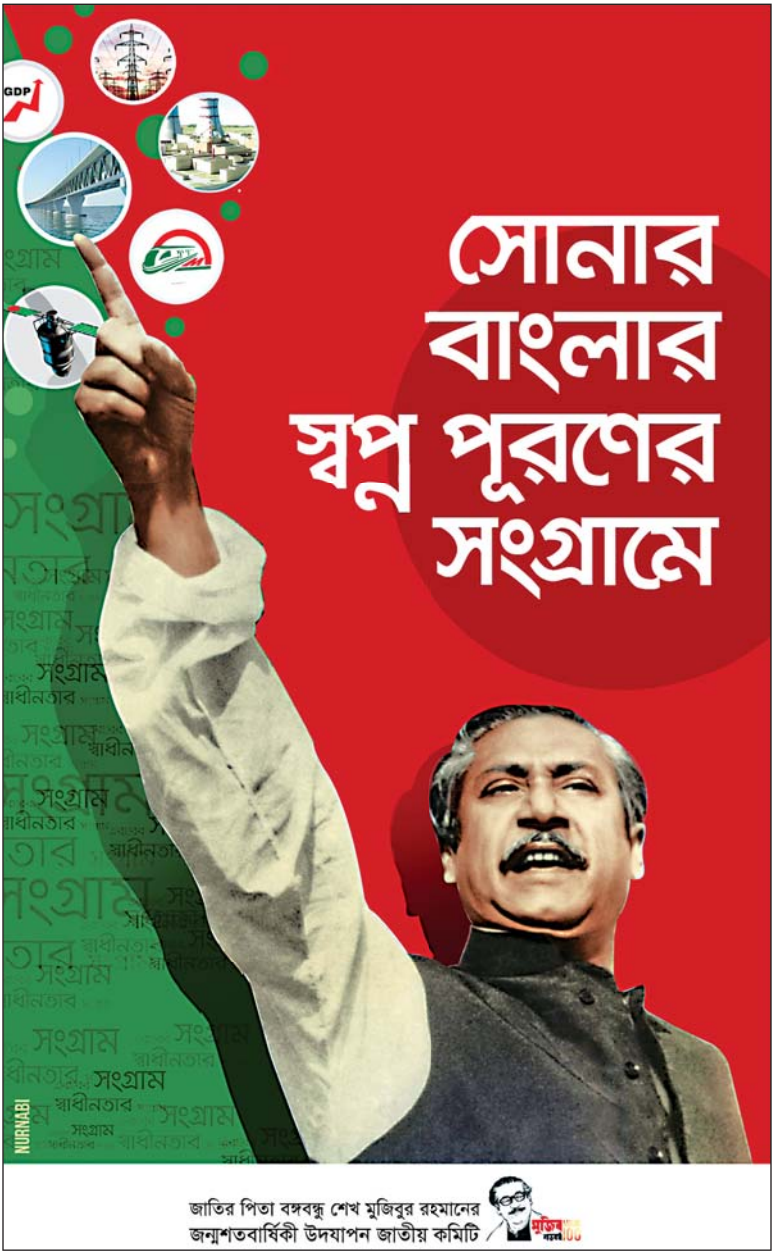

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি প্রকাশিত একটি পোস্টার

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় 'মহাবিজয়ের মহানায়ক' অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা অনুষ্ঠানে মুজিববর্ষের লোগো উন্মোচন

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা জানান জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস

সম্মানিত অতিথি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে 'মুজিব চিরন্তন' শ্রদ্ধাস্মারক তুলে দেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ রেহানা

ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে গান্ধী শান্তি পুরস্কার ২০২০ (মরণোত্তর) গ্রহণ

ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে ইউনেস্কো-বঙ্গবন্ধু পুস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। প্রথমবারের মতো পুরস্কারটি পেয়েছে উগান্ডার একটি প্রতিষ্ঠান 'মোটিভ ক্রিয়েশনস'

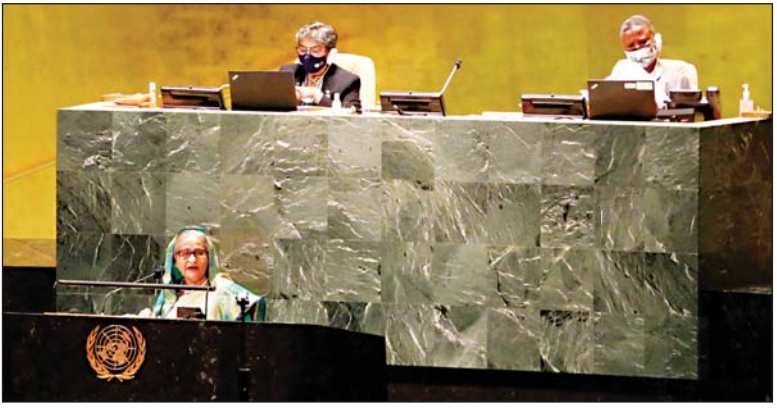

জাতিসংঘে ভাষণদানরত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিজয় দিবসে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

জাতিসংঘের এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

‘মুজিব চিরন্তন’ অনুষ্ঠানমালায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে অনুষ্ঠানের কলাকুশলী ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রকাশিত ‘সংবাদ শিরোনামে বঙ্গবন্ধু’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

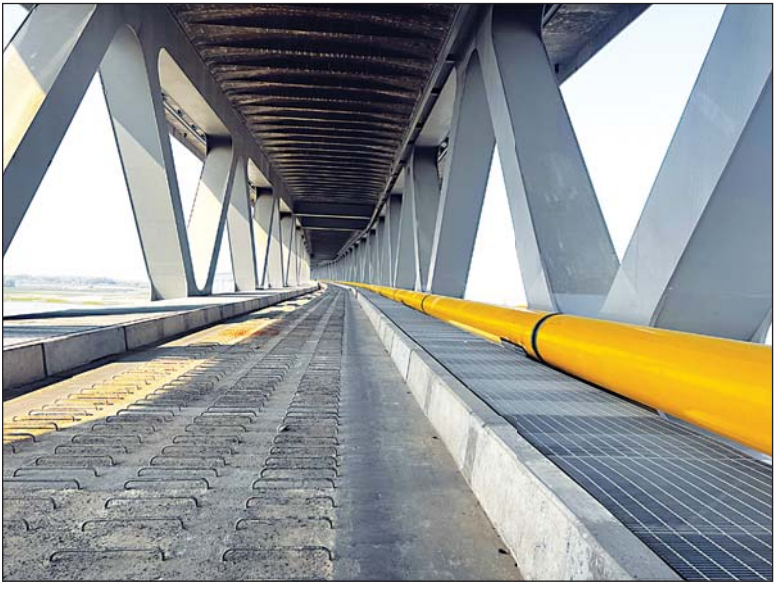

পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ

পদ্মা সেতু পরিদর্শনে জাতির পিতার দুই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা

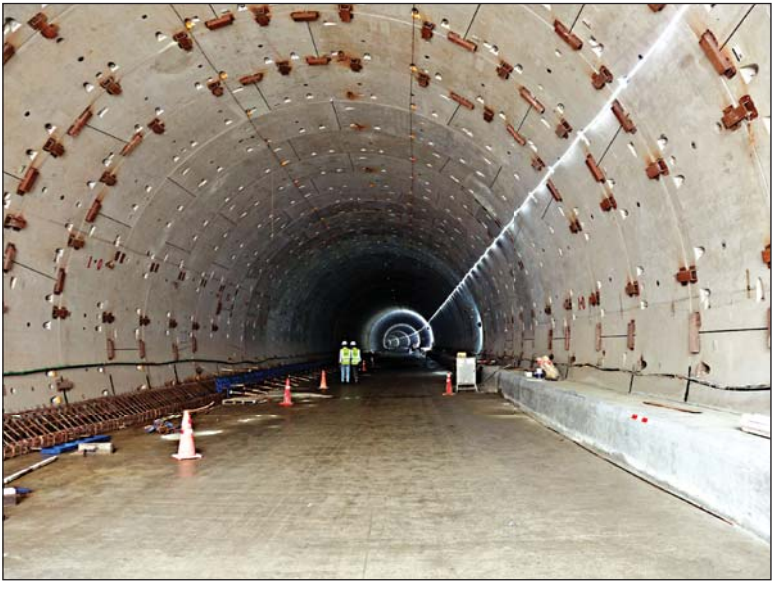

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন

নির্মাণাধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

বাংলাদেশ বিমানের বহরে সংযোজিত অত্যাধুনিক এয়ারক্রাফট 'ড্রিমলাইনার'

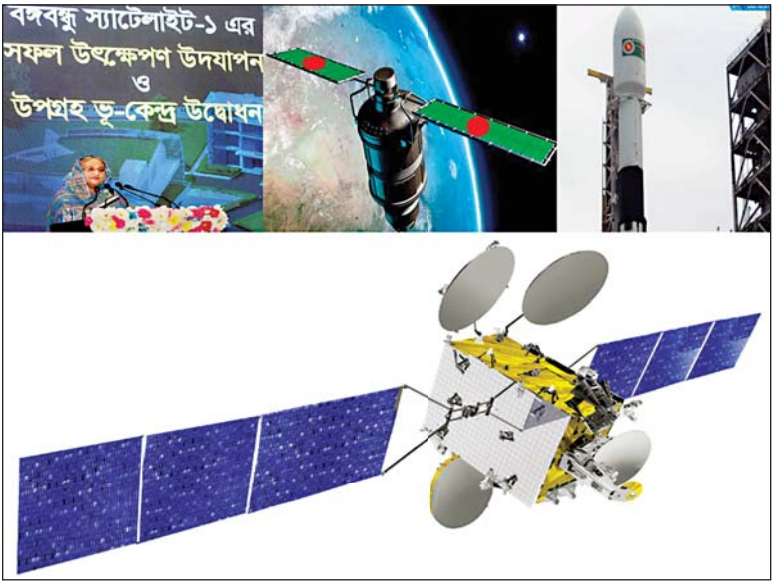

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১

হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল

রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

নির্মাণাধীন দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন

মেট্রোরেলের পরীক্ষামূলক চলাচল

পোর্ট ফ্যাসিলিটিজসহ মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র

এলএনজি টার্মিনাল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে তথ্য অধিদফতরে ফটো অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি ও সম্মানিত সচিব জনাব মো. মকবুল হোসেন পিএএ

তথ্য অধিদফতর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়